NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)

SELF LEARNING MATERIAL

[Applicable for HCO]

ECONOMICS
[HEC]

GE-EC – 41
Indian Economy

প্রাক্‌কথন

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'ইউ.জি.সি. ওপেন এণ্ড ডিস্ট্যান্স এডুকেশন রেগুলেশন ২০১৭' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)
Subject : Honours in Commerce (HCO)
বিষয় : যাম্মানিক বাণিজ্য
Course : Indian Economy
Course Code : GE-EC-41
(Applicable for HCO Student)

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, 2022
First Print : August, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)
Subject : Honours in Commerce (HCO)
বিষয় : যান্মানিক বাণিজ্য
Course : Indian Economy
Course Code : GE-EC-41
(Applicable for HCO Student)

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce
Netaji Subhas Open University (Chairparson)

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
Netaji Subhas Open University

ড. সজল কুমার মাইতি
Professor of Commerce (PG Dept.)
Hooghly Mohsin College

ড. আশিষ কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

ড. চিত্ত রঞ্জন সরকার
Professor of Commerce
Netaji Subhas Open University

শ্রী তপন কুমার চৌধুরী
Associate Professor of Commerce
Netaji Subhas Open University

সি.এ. সুভায়ন বসু
Assistant Professor of Commerce
Ananda Mohan College

শ্রী সুদর্শন রায়
Assistant Professor of Commerce
Netaji Subhas Open University

: রচনা :

একক 1 **to** 7: সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics
Netaji Subhas Open University

একক **8** : প্রিয়ন্থী বাগচি
Assistant Professor of Economics
Netaji Subhas Open University

: সম্পাদনা :

বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics
Netaji Subhas Open University

: বিন্যাস সম্পাদনা :

প্রিয়ন্থী বাগচি
Assistant Professor of Economics, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG : Commerce
(HCO)

Course : India Economy
Code : GE-EC-41

পর্যায় 1

একক-1	❑	ভূমিকা : অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে মৌল বিষয়সমূহ	7
একক-2	❑	ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ	31
একক-3	❑	ক্ষেত্রগত গতিপ্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ – I	52
একক-4	❑	ক্ষেত্রগত গতিপ্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ – II	৯৩

পর্যায় 2

একক-5	❑	ক্ষেত্রগত গতিপ্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ – III	137
একক-6	❑	ভারতের সামাজিক অর্থনীতি-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ	159
একক-7	❑	ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	187
একক-8	❑	'নীতি' আয়োগ	209

একক-1 ❑ ভূমিকা : অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে মৌল বিষয়সমূহ

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 প্রস্তাবনা

1.3 অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা

1.4 অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসার

1.5 অথনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক সূচক

- **1.5.1** জাতীয় আয় সূচক
- **1.5.2** মাথাপিছু আয় সূচক
- **1.5.3** জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান সূচক
- **1.5.4** মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গি
- **1.5.5** মানব উন্নয়ন সূচক
- **1.5.6** মানব উন্নয়ন সূচকের মূল্যায়ন

1.6 জাতীয় আয়

1.7 জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

- **1.7.1** স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও তিনটি জাতীয় উৎপাদন
- **1.7.2** স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়
- **1.7.3** আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয়
- **1.7.4** স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন
- **1.7.5** স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও স্থূল জাতীয় উৎপাদন
- **1.7.6** মাথাপিছু আয়

1.8 সারাংশ

1.9 অনুশীলনী

1.10 গ্রন্থপঞ্জি

1.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে—

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারের মধ্যে পার্থক্য
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পরিমাপ
- মানব উন্নয়ন সূচকের গঠন পদ্ধতি
- জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

1.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই এই এককের মূল লক্ষ্য। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তা এই আমরা বিবেচনা কর। অর্থনৈতিক আলোচনায় অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসার এই কথাদুটি সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে দেখতে গেলে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসার এই ধারণা দুটি এক নয়। এই দুই ধারণার মধ্যে পার্থক্য কী, তাও বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে। এছাড়া, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতটা হয়েছে তা পরিমাপ করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পরিমাপ নির্দেশ করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই সমস্ত বিকল্প পরিমাপ নিয়েও আমরা বিশ্লেষণ করব। এছাড়া, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই দেশের মোট জাতীয় উৎপন্ন বা জাতীয় আয়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। সেজন্য, জাতীয় আয় বলতে আমরা কী বুঝি, তা আমরা বিশ্লেষণ করবো। তাত্ত্বিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণা বিদ্যমান। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা নিয়েও বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে।

1.3 অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা (Concept of Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। স্বভাবতই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মুখ্য সমস্ত দিক বা বৈশিষ্ট্য (Aspects) উল্লেখ করে এর একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। সেইসব সংজ্ঞায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে Meir এবং Baldwin নামে দুই অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনেকের কাছেই বেশ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার ফলে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং যার মাধ্যমে দেশটির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে**। কাঠামোগত পরিবর্তন বলতে কোনো দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর গঠনে এবং জনসংখ্যার জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়। Meir এবং Baldwin প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সংক্ষেপে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া (process) অর্থাৎ এটি বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের ফল।

দ্বিতীয়তঃ, কোনো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে গেলে ঐ দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি ঘটতে হবে। কোনো দেশের প্রকৃত জাতীয় আয়কে (real national output) অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর অঙ্কে জাতীয় আয়কে ঐ দেশের জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় পাওয়া যায়। সুতরাং মাথাপিছু প্রকৃত আয়কে বাড়াতে হলে প্রকৃত জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু 'প্রকৃত' (real) আয় অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর অঙ্কে আয় বাড়তে হবে—মাথাপিছু আর্থিক আয় বা টাকার অঙ্কে আয় নয়। যদি কোনো দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে এবং শুধুমাত্র যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, তাহলে ঐ দেশের আর্থিক আয় বাড়বে, কিন্তু প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাড়বে না। সেক্ষেত্রে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে তা বলা যাবে না।

চতুর্থতঃ, প্রকৃত মাথাপিছু আয় শুধু দু-এক বছর বাড়লেই হবে না, মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি দীর্ঘকালব্যাপী হতে হবে। বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতির সময় কোনো দেশের মাথাপিছু আয় স্বল্পকালে বাড়তে পারে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে গেলে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে হতে হবে।

পঞ্চমতঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে বিবেচিত হতে গেলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগতও পরিবর্তন ঘটতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি Meir এবং Baldwin প্রদত্ত সংজ্ঞায় দেখতে পাওয়া যায়। তাই তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সন্তোষজনক সংজ্ঞা বলে বিবেচনা করা হয়। তবে Meir এবং Baldwin-এর সংজ্ঞায় একটি বিশেষ ত্রুটি আছে। আমরা জানি, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। দেশের সকলের আয় না বাড়লে মাথাপিছু গড় আয় বাড়তে পারে। যদি কোনো দেশের কেবলমাত্র ধনীদের আয় বাড়ে এবং গরিবদের আয় কমে, তাহলেও ঐ দেশের মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। কিন্তু তার ফলে দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্য বাড়ছে এবং সমস্ত লোকের আয় বাড়ছে না। বরং দেশের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে না, হয়তো বা তাদের জীবনযাত্রার মান কমছে। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার আয় না বাড়লে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না।

1.4 অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসার (Economic Development and Economic Growth)

সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রসার কথা দুটি আমরা সমার্থক ভাবে ব্যবহার করি। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, এই শব্দবন্ধ দুটি এক নয়। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রসারের মধ্যে পার্থক্য করতে চান। তাঁদের যুক্তি হল, অর্থনৈতিক প্রসার বলতে বোঝায় স্বল্পকালে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। এই কাঠামোগত পরিবর্তন বলতে প্রধানত দুটি বিষয়কে বোঝানো হয় ঃ (i) জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনে পরিবর্তন এবং (ii) জনসাধারণের জীবিকা কাঠামোতে পরিবর্তন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদানের অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের অবদানের

অনুপাত বাড়তে থাকে। অনুরূপভাবে, জনসাধারণের জীবিকার কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে বা তৃতীয় ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বাড়তে থাকে। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তন এবং জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তনকে একত্রে বলা হয় দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ঐ দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনের উল্লিখিত ধরনকে বলা হয় ক্লার্ক-ফিসার তত্ত্ব। কোনো দেশের জাতীয় আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি এই কাঠামোগত পরিবর্তন না ঘটে। তাহলে তাকে বলা হবে অর্থনৈতিক প্রসার। আর জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে এই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এই আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রসার কথাটি একটি স্বল্পকালীন ধারণা—এটি স্বল্পকালে প্রযোজ্য। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া, কেননা কোনো দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন দীর্ঘকালেই সম্ভব—এটি স্বল্পকালে বা দু'এক বছরে ঘটে না। আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে অর্থনৈতিক প্রসার অবশ্যই ঘটছে, কিন্তু অর্থনৈতিক প্রসার ঘটলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবেই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অর্থনৈতিক প্রসার হল প্রকৃত জাতীয় আয় ও প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি; আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক প্রসার ও কাঠামোগত পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক Clower-এর একটি সমীক্ষার শিরোনাম উল্লেখ করতে পারি। সাইবেরিয়া-র অর্থনীতির উপর এই সমীক্ষার ফলাফলের শিরোনাম ছিল ঃ উন্নয়নহীন প্রসার (Growth without development)। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াই অর্থনৈতিক প্রসার ঘটতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রসার ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কোনো দেশে অর্থনৈতিক প্রসার দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে ঐ দেশের নানারকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল জাতীয় আয়ের বণ্টনে ক্ষেত্রগত পরিবর্তন এবং জনসাধারণের জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন। পাশাপাশি, আরো যে-সমস্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে থাকে সেগুলি হল ঃ নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার, কৃৎকৌশলের উন্নতি, মূলধন গঠনের হারে পরিবর্তন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন, জনসাধারণের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শিক্ষার হারের পরিবর্তন, জনসাধারণের চেতনার বিকালের পরিবর্তন প্রভৃতি। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি দীর্ঘকালেই সম্ভব। আর এই সমস্ত পরিবর্তনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একাধারে কারণ ও ফল। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, কোনো দেশের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক প্রসারের ফলে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক প্রসার ও পরিবর্তন (economic development is growth plus change)। অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারের মধ্যে এই সীমারেখা টানেন না। যেমন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ Arthur Lewis তাঁর বিখ্যাত ''The Theory of Economic Growth'' বইয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝাতে 'growth' কথাটি ব্যবহার করেছেন। আর একঘেয়েমি কাটাতে বা বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে 'progress' বা 'development' কথাটি ব্যবহার করার সুপারিশ করেছে। সুতরাং Lewis-এর কাছে উন্নয়ন (development) এবং প্রসারের (growth) মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা বলবো যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল, দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের সাথে অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে ইতিবাচক পরিবর্তন।

1.5 অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক সূচক (Measures of Economic Development or Indications of Economic Development)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতটা ঘটেছে অর্থাৎ কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন্ স্তরে রয়েছে তা বিভিন্ন ভাবে পরিমাপ করা যায়। এদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ বলা যেতে পারে। বিভিন্ন রকম সূচকের দ্বারা কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা হয়েছে। এই পরিমাপগুলিকে তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক বা সূচক হিসাবেও অভিহিত করা হয়। বস্তুত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ হিসাবে এই নির্দেশক বা সূচক কথাটিই বেশি প্রচলিত। উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় আমরা মোটামুটি পাঁচটি উন্নয়ন নির্দেশকের পরিচয় পাই। এই পাঁচটি নির্দেশক হল ঃ

(i) মোট জাতীয় আয় সূচক,

(ii) মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় সূচক,

(iii) জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান,

(iv) মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জোগান, এবং

(v) মানব উন্নয়ন সূচক।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই পাঁচটি পরিমাপ নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

1.5.1 জাতীয় আয় সূচক (National Income Index)

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ (যেমন, সাইমন কুজনেৎস) মোট জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক বলে বিবেচনা করতে চান। তাঁদের মতে, মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলে ভাবা যেতে পারে। অবশ্য জাতীয় আয়কে কেবলমাত্র টাকার অঙ্কে ধরলে চলবে না—প্রকৃত জাতীয় আয়কে হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক বলে ভাবা যেতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ হিসাবে এই পরিমাপটি কিছুটা মোটা দাগের বা অতিসরল হলেও কখনও কখনও এই পরিমাপটির গুরুত্ব আছে। যেমন, কোনো দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় না বেড়ে জনসংখ্যা কমলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট প্রকৃত জাতীয় আয়কে বৃদ্ধি পেতেই হবে। আবার, যদি প্রকৃত জাতীয় আয় কমে এবং জনসংখ্যা যদি বেশি হারে কমে, তাহলেও মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়বে। কিন্তু তাকেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। তাই কুজনেৎস প্রমুখ কিছু অর্থনীতিবিদ মোট প্রকৃত জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন।

অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই পরিমাপের দুটি প্রধান অসুবিধা আছে।

প্রথমতঃ, প্রকৃত জাতীয় আয়কে উন্নয়নের সূচক হিসাবে ধরলে অনেক উদ্ভট সিদ্ধান্ত পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মোট প্রকৃত জাতীয় আয় ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের চেয়ে বেশি কেননা এই দেশটি ভারতের আয়তনের তুলনায় ক্ষুদ্র দেশ। এখন, জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে বলতে গেলে ভারতকে উল্লিখিত দেশগুলির চেয়ে বেশি উন্নত বলতে হয়। কিন্তু তা সত্য নয়। এক্ষেত্রে মাথাপিছু প্রকৃত

জাতীয় আয় বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি যে, সুইডেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ ভারত অপেক্ষা অনেক উন্নত কারণ এদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ভারত অপেক্ষা বেশি। আবার, কোনো দরিদ্র দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধনী দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে পারে। দরিদ্রদেশের প্রাথমিক মোট আয় (base income) কম হওয়ার দরুন এটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে উন্নয়নের সূচক বলে ধরলে দরিদ্র দেশটিকে উন্নততর বলতে হয়। কিন্তু সেটি ভুল সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার আমাদের সঠিক চিত্র দিতে পারে। তাই জাতীয় আয় অপেক্ষা মাথাপিছু আয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভালো সূচক বলে অনেকে মনে করেন।

1.5.2 মাথাপিছু আয় সূচক (Per Capita Income Index)

মাথাপিছু আয় হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক। মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলে ধরা যেতে পারে। জাতীয় আয় বাড়লেই যে মাথাপিছু আয় বাড়বে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় কমবে। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে না। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে গেলে মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমরা বলতে পারি যে, অন্যান্য বিষয় সমান বা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর উচ্চ বলে ধরা যেতে পারে। তেমনি, বিপরীত ক্ষেত্রে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নিম্ন বলে গণ্য করা যায়।

এখন, কোনো দেশের কোনো একটি বছরে মাথাপিছু প্রকৃত আয় (y)

$$= \frac{\text{ঐ বছরে মোট প্রকৃত জাতীয় আয় (Y)}}{\text{ঐ বছরের মধ্যবিন্দুতে মোট জনসংখ্যা (P)}}$$

সুতরাং, প্রতীকের সাহায্যে লিখতে গেলে, $y = \frac{Y}{P}$। এখন, আমরা বসেছি যে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় (y) বাড়তে পারে যদি মোট প্রকৃত জাতীয় আয় (Y) দেশের মোট জনসংখ্যার (P) চেয়ে বেশি হারে বাড়ে।

এটি খুব সহজেই দেখানো যায়।

আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, $y = \frac{Y}{P}$।

এই সমীকরণের উভয়দিকে log নিয়ে পাই,

$$\log y = \log Y - \log P$$

এখন, এই সমীকরণের সব চলরাশিগুলিকেই আমরা সময়ের (t) অপেক্ষক বলে ধরছি। তাহলে উভয়পক্ষকে সময়ের (t) সাপেক্ষে অবকলন করে পাই,

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dt} = \frac{1}{Y}\cdot\frac{dY}{dt} - \frac{1}{P}\cdot\frac{dP}{dt}$$

অর্থাৎ, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার = প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার – জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

সুতরাং, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার ধনাত্মক হতে গেলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাড়বে। তাহলে, মাথাপিছু আয় সূচক অনুযায়ী, যদি কোনো দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ঐ দেশের জসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ঐ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক। এর পিছনে কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথমত, মাথাপিছু প্রকৃত আয়, ক্রমবর্ধমান হলে আমরা মোটের উপর বলতে পারি যে, দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। **দ্বিতীয়ত,** আমরা দেখেছি যে, মাথাপিছু আয় সূচকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনা না করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না। তাই স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়ন পরিমাপ করতে হলে মাথাপিছু আয় সূচক সবচেয়ে উপযোগী। **তৃতীয়ত,** মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের পরিমাণের দ্বারা বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের তুলনা করা যায়। যেমন, বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শ্রেণিবিভাগ করে থাকে। যেমন, 1 জুলাই 2021 সালের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে (চলতি দামস্তরে মার্কিন ডলারে) বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাগ করেছে ঃ

শ্রেণি		মাথাপিছু আয় (চলতি দামস্তরে মার্কিন ডলার)
1. নিম্ন আয়ের দেশ	:	< 1,046
2. নিম্নতর-মধ্য আয়ের দেশ	:	1,046 – 4,095
3. উচ্চতর-মধ্য আয়ের দেশ	:	4,096 – 12,695
4. উচ্চ আয়ের দেশ	:	12,695

আমরা ২০২০ সালের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে শ্রেণি বিভাগ নীচের সারণিতে দেখিয়েছি।

সারণি 1.1

নির্বাচিত কিছু দেশের মাথাপিছু আয় (চলতি US ডলারে)

(2020 সালে)

	নিম্ন আয়ের দেশ (<1,046) মাথাপিছু আয়	
1.	আফগানিস্তান	516.75
2.	উগান্ডা	822.03
3.	বুরকিনা ফাসো	857.93

4.	মালি	862.45
5.	ইথিওপিয়া	936.34
	নিম্নতর মধ্যআয়ের দেশ (1,046 – 4,095)	
6.	হাইতি	1,272.37
7.	মায়ানমার	1,467.70
8.	ক্যামেরুন	1,537.13
9.	ভারত	1,927.71
10.	বাংলাদেশ	1,961.61
11.	ভুটান	3,000.78
12.	ইন্দোনেশিয়া	3,869.59
	উচ্চতর-মধ্যআয়ের দেশ (4,096 – 12,695)	
13.	ব্রাজিল	6,796.84
14.	মরিশাস	8,627.84
15.	কিউবা	9,477.85
16.	বুলগেরিয়া	10,079.20
17.	চিন	10,434.78
18.	কোস্টারিকা	12,140.85
	উচ্চ-আয়ের দেশ (> 12,695)	
19.	চিলি	13,231.70
20.	গ্রিস	17,622.54
21.	পর্তুগাল	22,176.30
22.	ফ্রান্স	39,030.36
23.	যুক্তরাজ্য (UK)	41,059.17
24.	কানাডা	43,294.65
25.	জার্মানি	46,208.43
26.	ডেনমার্ক	61,063.32
27.	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	63,593.44

সূত্র : data.worldbank.org

এভাবে মাথাপিছু আয়ের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের তুলনা করতে পারি। অবশ্য উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয়েরও কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। এই পরিমাপে আয়ের বণ্টন ধরা পড়ে না। যদি দেশের সাধারণ জনগণের আয় কমে এবং মুষ্টিমেয় ধনীর আয় বাড়ে, তাহলেও মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা বলা যাবেনা।

দ্বিতীয়ত, আমরা জানি, মাথাপিছু আয় = জাতীয় আয় ÷ জনসংখ্যা। যদি দেশের জাতীয় আয় না বেড়ে জনসংখ্যা কমে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। আবার, যদি জাতীয় আয় কমে এবং জনসংখ্যা যদি জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি হারে কমে, তাহলেও মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু এই দুটির কোনো ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে, তা বলা যাবে না।

তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয় বাড়লেই দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়ে, এটি সর্বদা সত্য নয়। OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) দেশগুলিতে বিগত কয়েক বছরে মাথাপিছু আয় বিস্ময়কর রকমের বেড়েছে। কিন্তু ঐ দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবযাত্রার মানের তেমন উন্নতি ঘটেনি।

চতুর্থত, মাথাপিছু আয় না বাড়লেও দরিদ্র জনসাধারণকে যদি জীবনধারণের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহজ শর্তে সরবরাহ করা হয়, তাহলে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। যেমন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, পানীয় জল প্রভৃতির জোগান দিলে নিম্ন আয়ের লোকেদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। সুতরাং, মাথাপিছু আয়ই জীবনযাত্রার মানের একমাত্র নির্দেশক নয়।

পঞ্চমত, অনেক সময় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, নানারকম দূষণ, শিল্পরোগ প্রভৃতির সৃষ্টি হতে পারে, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়লেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, তা বলা যায় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে মাথাপিছু আয় সূচকের এসমস্ত অসুবিধার জন্য অর্থনীতিবিদগণ বিকল্প সূচকের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এরূপ একটি বিকল্প সূচক হল জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমানের সূচক। এই সূচকটি নিয়ে আমরা নীচের বিভাগে আলোচনা করেছি।

1.5.3 জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান সূচক (Physical Quality of Life Index or PQLI)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে এই সূচকের কয়েকটি ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আছে। তাই বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করতে কয়েকটি বিকল্প সূচকের অবতারণা করেছেন। এই বিকল্প সূচক বলিতে অর্থনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি কিছু সামাজিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই এদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামাজিক সূচক বা সামাজিক নির্দেশক (Social indicators of economic development) বলে অভিহিত করা হয়। আমরা প্রধানত তিনটি সামাজিক সূচকের উল্লেখ করতে পারি ঃ

(a) জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান সূচক

(b) মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গি, এবং

(c) মানব উন্নয়ন সূচক।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই তিনটি সামাজিক নির্দেশক নিয়ে আমরা পরপর আলোচনা করব।

জীবনযাত্রার বাস্তব ভৌত গুণমান সূচক (PQLI) গঠন করেন Morris D. Morris এবং অন্যান্য কয়েকজন অর্থনীতিবিদ। তাঁদের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে আয় সূচক শুধুমাত্র দ্রব্য ও সেবাকার্যের পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং জীবনযাত্রার গুণগত মানকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যই হল জীবনযাত্রার মানের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। তাই Morris প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ জীবনযাত্রার বাস্তব গুণমান উন্নয়নের সূচক (PQLI) গঠন করেন। এই PQLI হল তিনটি উপসূচকের যৌথ সূচক (composite index)। এই তিনটি উপসূচক হল ঃ গড় আয়ু প্রত্যাশা বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। এই তিনটি উপসূচকের সরল যৌগিক গড়ই হল জীবনযাত্রার বাস্তব গুণমান সূচক (বা PQLI)। এই সূচকের মূল কথা হল, শুধু জাতীয় বা মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটল তা বলা যাবে না, পাশাপাশি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হওয়া দরকার। এই জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি বিভিন্ন সূচকের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। PQLI-এর প্রবর্তকেরা উপরোক্ত তিনটি সূচক ব্যবহার করে PQLI গঠন করেছেন।

এভাবে, Morris প্রদত্ত সূচকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান কতটা বাড়ল, সেই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি না ঘটলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটি অর্থহীন। তবে মরিসের PQLI-এরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করতে মরিস তিনটি উপসূচকের সরলগড় ব্যবহার করেছেন। আর উপসূচকে ব্যবহৃত বিষয় তিনটি হল ঃ গড় আয়ু প্রত্যাশা, শিশুমৃত্যুর হার এবং সাক্ষরতা। কিন্তু জীবনযাত্রার মান অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন, খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপদ পানীয় জল, পরিবহণের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি। সেজন্য মরিসের সূচকটিকে অনেকে অতি সরল বলে মনে করেন।

(ii) মরিস প্রদত্ত PQLI গঠন করতে তিনটি উপসূচকের সরল গড় নেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হল, জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে তিনটি উপসূচকের সমান গুরুত্ব ধরা হয়েছে। এটিও বিতর্কিত বিষয়। জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে তিনটি উপসূচকের গুরুত্ব সমান নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপসূচকগুলির গুরুত্বশীল গড় (weighted average) নির্ণয় করে সূচকটির মান বের করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও বিভিন্ন উপসূচককে কীরূপ গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নির্ণয় করার কোনো বস্তুনিষ্ঠ (objective) নিয়ম নেই। সেক্ষেত্রে PQLI-এর গঠন অনেকটাই মনোগত (subjective) বিষয় যেখানে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা (value judgements) এসে পড়ে।

এসমস্ত অসুবিধার জন্য বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের পরিমাণই ব্যবহার করতে চান।

1.5.4 মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Needs Approach)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গি। এই পদ্ধতিতে দেশের সাধারণ জনগণের কাছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলি কতটা পৌঁছেছে তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়। এই মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হল খাদ্য, বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষার সুযোগ। এই বিষয়গুলি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের

কাছে যত সহজলভ্য হবে, দেশটিতে ততই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলে ধরা হবে। এটিই হল মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা। এই মতবাদের মুখ্য প্রবক্তারা হলেন Paul Streeten, Norman Hicks, Shahid Javed Burki প্রমুখ। এই পদ্ধতিতে আয় বৃদ্ধিকে অবহেলা করা হয় না। তবে বর্ধিত আয় বা বর্ধিত উৎপাদন দরিদ্র ব্যক্তিরা পাচ্ছে কিনা এবং বর্ধিত উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের এই দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি অনুন্নত দেশের দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের দরিদ্রদের জীবনধারণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি মোটামুটি সঠিকভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গির তালিকায় স্থান পেয়েছে। মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য হল, সমাজের দরিদ্রদের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে সরকারকে প্রণোদিত করা। উন্নয়নের সুফল যেন দরিদ্র শ্রেণির কাছে পৌঁছায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে, জীবনধারণের জন একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তারা যেন পায়, সেটি নিশ্চিত করাই এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা আছে। জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি কী কী এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কীরূপ, সে সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি দরিদ্রদের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান দিয়ে সরাসরি দারিদ্র্য দূর করতে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চায়। এখানেই মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

1.5.5 মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index or HDI)

রাষ্ট্র সংঘের মানব উন্নয়ন কর্মসূচির (United Nations Development Programme বা UNDP) অধীনে 1990 সাল থেকে প্রতি বছর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report বা HDR) প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মাত্রা তুলনা করার জন্য একটি মানব উন্নয়ন সূচক বা HDI (Human Development Index) ব্যবহার করা হয়। এই সূচক তৈরির পিছনে পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ মাহবুব-উল-হক-এর প্রচেষ্টা এবং অমর্ত্য সেনের প্রেরণা অনেকখানি কাজ করেছে। UNDP-র প্রতিবেদন থেকে আমরা মানব উন্নয়ন সূচকের একটি সংজ্ঞা পাই। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, মাব উন্নয়ন সূচক হল ''a composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development–a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living.'' এই সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানব উন্নয়ন সূচক মানব জীবনের তিনটি ক্ষেত্রে গত সাফল্য বিবেচনা করে। এই তিনটি ক্ষেত্র হল ঃ (i) দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যবান জীবন যা প্রত্যাশিত আয়ু সূচকের দ্বারা পরিমাপ করা হয়। (ii) জ্ঞান যা শিক্ষা সূচকের দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং (iii) একটি সন্তোষজনক জীবনযাত্রার মান যা স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এই সূচক তিনটি হল তিনটি উপসূচক, যথা, প্রত্যাশিত আয়ু সূচক, শিক্ষা সূচক এবং স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি উপসূচকের সরল যৌগিক গড়। এই (HDI বা) মানব উন্নয়ন সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধে বিরাজ করে। যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 0.550 অপেক্ষা কম, সে সমস্ত দেশ মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সূচকের মান 0.55 থেকে 0.70-এর মধ্যে হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরে রয়েছে। যে সমস্ত দেশের এই মানব উন্নয়ন সূচকের মান 0.7-এর বেশি কিন্তু

0.8-এর কম, সেই সমস্ত দেশ হল উচ্চ মানব উন্নয়নের দেশ। আর সূচকের মান 0.8-এর বেশি হলে মানব উন্নয়ন অতি উচ্চস্তরে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়নের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থান এবং মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থান ভিন্নরূপ। কিছু দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অবস্থানের তুলনায় মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অবস্থান উচ্চতর। এর তাৎপর্য হল যে, ঐ সমস্ত দেশ তাদের উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছে। আবার, রাষ্ট্রসংঘের তৈরি তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু দেশের অবস্থান মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উপরে, কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত নীচে। এর তাৎপর্য হল যে, এই দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের দুর্বল শ্রেণির নিকট ততটা পৌঁছে দিতে পারেনি।

আমরা 1.2 নং সারণিতে নির্বাচিত কিছু দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মান দেখিয়েছি। UNDP-র শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী আমরা দেশগুলিকে HDI-এর মানের ভিত্তিতে 4টি শ্রেণিতে ভাগ করেছি— অতি উচ্চমানব উন্নয়নের দেশ, উচ্চ মানব উন্নয়নের দেশ, মধ্য মানব উন্নয়নের দেশ এবং নিম্ন মানব উন্নয়নের দেশ।

সারণি 1.2

নির্বাচিত কিছু দেশের HDI-এর মান ও অবস্থান, 2022

দেশ	মানব উন্নয়ন সূচকের মান
অতি উচ্চ মানব উন্নয়নের দেশ	
নরওয়ে	0.954
সুইজারল্যান্ড	0.946
আয়ারল্যান্ড	0.942
জার্মানি	0.939
ডেনমার্ক	0.930
USA	0.920
জাপান	0.915
অস্ট্রিয়া	0.914
উচ্চ মানব উন্নয়নের দেশ	
ইরান	0.797
শ্রীলংকা	0.780
কিউবা	0.778
মেক্সিকো	0.767
চিন	0.758

মালদ্বীপ	0.719
ইন্দোনেশিয়া	0.707
মধ্যমানব উন্নয়নের দেশ	
ভিয়েতনাম	0.693
ইরাক	0.689
ভারত	0.647
ভুটান	0.617
বাংলাদেশ	0.614
নিম্ন মানব উন্নয়নের দেশ	
পাকিস্তান	0.560
নাইজিরিয়া	0.534
সুদান	0.507
আফগানিস্তান	0.496

সূত্র : World Development Report, 2022

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2022 সালে ভারত মধ্যমানব উন্নয়নের দেশ। ঐ বছর ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকের মান 0.647। ভারতের সমগোত্রীয় কিছু দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মান ভারতের মান অপেক্ষা বেশি। যেমন, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া হল উচ্চ মানব উন্নয়নের দেশের তালিকাভুক্ত। এদের মানব উন্নয়ন সূচকের মান 0.7 থেকে .8-এর মধ্যে। বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকের মান কিছুটা উন্নতি ঘটেছে, তবে তা খুবই ধীরগতিতে। 2002 সালে ভারতের HDI-এর মান ছিল 0.595 অর্থাৎ ভারতের মানব উন্নয়ন তখনও ছিল মধ্যম স্তরের। 2004 সালে HDI অনুযায়ী 177টি দেশের মধ্যে ভারতের ক্রম অবস্থান ছিল 127। আর 2013 সালে ভারতের HDI-এর মান ছিল 0.586 এবং ভারতের ক্রম অবস্থান ছিল 135-তম। 2020 সালে এই মান ছিল 0.645 এবং 189টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ছিল 131-তম অর্থাৎ HDI-এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান (rank) বিশেষ পাল্টায়নি। 2022 সালে ভারতের HDI-এর মান 0.647 অর্থাৎ 2020 সালের তুলনায় অতি সামান্যই বেড়েছে। আমরা সারণি 1.3-এর 1990 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত ভারতের HDI এবং এর উপাদানগুলির গতি প্রকৃতি দেখিয়েছি। এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের HDI-এর উপাদানগুলির মান খুব ধীর গতিতে বেড়েছে এবং তার ফলে সামগ্রিক HDI-এর মানও ধীর গতিতে বেড়েছে।

সারণি 1.3

ভারতের HDI এবং এর উপাদানগুলির গতিপ্রকৃতি

বছর	জন্মকালে আয়ু প্রত্যাশা (বছর)	স্কুলে কাটানোর গড় সময় (বছর)	মাথাপিছু GNI (2017 ডলার ppp)	HDI
1990	57.9	3.0	1,787	0.429
2000	72.5	4.4	2,548	0.495
2005	64.5	4.8	3,217	0.536
2010	66.7	5.4	4,182	0.579
2015	68.6	6.2	5,391	0.624
2017	69.2	6.5	6,119	0.640
2018	69.4	6.5	6,427	0.642
2019	69.7	6.5	6,681	0.645

সূত্র : World Development Report, 2022, UNDP

1.5.6 মানব উন্নয়ন সূচকের মূল্যায়ন (An Evaluation of Human Development Index)

মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নির্দেশক। 1990 সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme) জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য এই সূচক ব্যবহার করে আসছে। এই সূচক গঠনের পিছনে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁরা হলেন Hagen, Adelman, Harbison, Morris, Norman Hicks, Streeten, Burki প্রমুখ। এঁদের নেতৃত্ব দেন পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ Mahabub-ul Haq। এ সমস্ত অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে আয়-সূচকের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তাঁরা বিকল্প কোনো সূচক গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন। অধ্যাপক Morris D. Morris জীবন ধারণের বাস্তব গুণমান সূচকের (সংক্ষেপে PQLI) ধারণার অবতারণা করেন। অন্যদিকে, Paul Streeten, Norman Hicks এবং Javed Burki উন্নয়ন পরিমাপের জন্য মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেন। এইসব প্রচেষ্টা এবং সমজাতীয় ধারণা সমষ্টিগত ভাবে রূপ পায় HDI-এর মাধ্যমে।

মানব উন্নয়ন সূচকে মানব উন্নয়ন বলতে মানুষের নির্বাচনের সুযোগ বা পরিসর বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বোঝানো হয়েছে (as the process of enlarging people's choices)। এখন, যে বিষয়গুলিতে মানুষের নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা দরকার সেগুলি হল : দীর্ঘ ও নীরোগ জীবনযাপনের সুযোগ, শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ এবং জীবনধারণের একটা সন্তোষজনক মান নির্বাহ করার সুযোগ। মানব উন্নয়নসূচক গঠনে এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনটি উপসূচকের দ্বারা এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে আয়ু-দৈর্ঘ্য (longevity), শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন (educational attainment) এবং জীবনযাত্রার মান (standard of living)। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি সূচকের যৌথ (composite) বা সমন্বিত সূচক। এখানে

আয়ু-দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় জন্মের সময় আয়ু-প্রত্যাশার (Life expectancy at birth) দ্বারা। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন পরিমাপ করা হয় প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা (দুই-তৃতীয়াংশ গুরুত্ব) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের বছর সংখ্যার (এক-তৃতীয়াংশ গুরুত্ব) গুরুত্বশীল গড়ের দ্বারা। আর জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করা হয় মাথাপিছু স্থূল অন্তর্দেশীয় আয়ের (Gross Domestic Product বা GDP) দ্বারা। HDI হল আয়ু-প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগতযোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন সূচকের সরল যোগিকগড়। এই HDI বা মানব উন্নয়ন সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, HDI-এর মান 0.5 থেকে যত উপরের দিকে 1-এর কাছাকাছি থাকবে, সেটি ততই মানব উন্নয়নের উচ্চতর মাত্রা নির্দেশ করবে। অন্যদিকে, HDI-এর মান যত 0.5 অপেক্ষা কম হবে, ততই সেটি নিম্নস্তরের মান উন্নয়ন নির্দেশ করবে।

এভাবে, মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) গঠন করতে মানুষের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে এরূপ প্রধান সমস্ত বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সূচকটির গঠন পদ্ধতিও বেশ সহজ ও সরল। তাছাড়া, বিভিন্ন উপসূচক গঠন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছে, সেগুলির অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আবার, উপসূচকগুলি গঠনের সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রদত্ত গুরুত্ব (weights) কিংবা উপসূচক গঠনের পদ্ধতিও বিশেষ যুক্তিযুক্ত। এককথায়, মানব উন্নয়ন সূচক গঠনের পদ্ধতি সহজ অথচ দক্ষ ও পরিশীলিত (simple and yet elegant)। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে অথবা মানব উন্নয়নের স্তর নির্ধারণে এই সূচকটি যথেষ্ট কার্যকরী, বাস্তবসম্মত এবং সহজ অর্থনৈতিক যুক্তির দ্বারা চালিত বলে মনে করা যেতে পারে। তবে এই মানব উন্নয়ন সূচকেরও (HDI) কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, HDI গঠন করার সময় তিনটি নির্দেশক বা উপসূচক বিবেচনা করা হয়। সেই তিনটি হল ঃ আয়ু-প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষা সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক। কিন্তু কেবলমাত্র এই তিনটিই মানব উন্নয়নের একমাত্র নির্দেশক নয়। আরো অনেক বিষয় মানব উন্নয়নের স্তর বা মাত্রা নির্ধারণ করে, যেমন, শিশু মৃত্যুর হার, শিশু ও বৃদ্ধদের পুষ্টির স্তর, সামাজিক নিরাপত্তা, সমাজে নারীদের স্থান প্রভৃতি।

দ্বিতীয়ত, মানব উন্নয়ন গঠন করার সময় উল্লিখিত তিনটি উপসূচককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। HDI হল ঐ তিনটি উপসূচকের সরল যৌগিক গড়। কিন্তু মানব উন্নয়নের স্তর নির্ধারণে এই উপসূচক গুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে।

তৃতীয়ত, মানব উন্নয়ন সূচকে বিবেচিত উপসূচকগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বস্তুনিষ্ঠ (Objective) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। উপসূচকগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার সমগ্র প্রক্রিয়াটি এক্ষেত্রে একান্তভাবে মনোগত (subjective) ব্যাপার।

চতুর্থত, অধ্যাপক Todaro-র মতে, মাথাপিছু আয় ও তার সঙ্গে কিছু সামাজিক নির্দেশক যোগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করবে তা মানব উন্নয়ন সূচক অপেক্ষা উন্নততর পদ্ধতি হবে। এই মতটি অবশ্য অনেকে মানতে নারাজ।

উপসংহারে আমরা বলবো যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক বা পরিমাপ হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় অপেক্ষা মানব উন্নয়ন সূচক নিঃসন্দেহে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া, মানব উন্নয়ন সূচক গঠন করার সময় মাথাপিছু স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপন্নকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সূচক মানুষের সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব

আরোপ করেছে। এটি নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের (economic well-being) উপর জোর দেয়নি। নিছক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি মানব উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। মানুষের আরো নানা বিষয়ের প্রয়োজন বা চাহিদা থাকে। সেগুলি পূরণ না হলে মানুষের উন্নয়নের পূর্ণ বিকাশ হয় না। নিছক সম্পদ নয়, সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। মাহবুবউল হক সঠিক ভাবেই বলেছেন যে, মানুষই সমাজের প্রকৃত সম্পদ, সুতরাং, শুধু বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধির দিকে জোর না দিয়ে মানব সম্পদের উন্নয়নের দিকে জোর দিতে হবে। তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটি প্রকৃতরূপে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে, HDI গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই সূচক চিরাচরিত সম্পদ (বা আয়) সৃষ্টির উপর জোর না দিয়ে দেশের প্রকৃত সম্পদের (অর্থাৎ জনসাধারণের) দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছে। এখানেই সূচকটির উৎকর্ষ ও স্বকীয়তা।

1.6 জাতীয় আয় (National Income)

কোনো দেশের বা জাতির সামগ্রিক আয় হল জাতীয় আয়। কোনো দেশের উৎপাদনী এককগুলি উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট বছরে মোট যে পরিমাণ শেষ উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে তার অর্থমূল্যের সমষ্টি হল জাতীয় আয়। অর্থনীতিবিদ মার্শালের ভাষায় কোনো দেশের প্রাকৃতিক সমপদের উপর শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে যে পরিমাণ নিট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য কোনো এক বছরে উৎপন্ন হয়, তারই মোট অর্থমূল্যকে ঐ দেশের ঐ বছরের জাতীয় আয় বলে।

কোনো দেশের জাতীয় আয়কে তিন দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, জাতীয় আয়কে উৎপাদনের সমষ্টি বা জাতীয় উৎপাদন হিসাবে ভাবা যেতে পারে। কোনো দেশে কোনো আর্থিক বছরে উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলি (অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) সকলে মিলে যে পরিমাণ শেষ (final) দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে, তাদের সমষ্টিই হল **জাতীয় উৎপাদন**। এখন, বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের ইউনিট বিভিন্ন। তাই এদের সমষ্টি বের করতে হলে এগুলিকে অর্থমূল্যে প্রকাশ করতে হয় অর্থাৎ দ্রব্যগুলির পরিমাণকে সংশ্লিষ্ট দাম দিয়ে গুণ করতে হয়। ঐ অর্থমূল্যগুলির সমষ্টিই হল জাতীয় উৎপাদনের মূল্য বা জাতীয় আয়। এভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করাকে বলা হয় উৎপাদন-শুমারি পদ্ধতি বা শেষ উৎপন্ন সমষ্টি (Census of Production Method or Final Products Total)।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় হল একটি জাতির আয় বা ঐ দেশের সমস্ত অধিবাসীর আয়। সুতরাং, জাতীয় আয়কে দেশের সমস্ত আয়ের সমষ্টি হিসাবেও বিচার করা যেতে পারে। এখন, প্রত্যেক ব্যক্তির আয় আসলে এক বা একাধিক উপাদন থেকে আয়। জমি থেকে আয় হল খাজনা, শ্রম থেকে আয় হয় মজুরি, মূলধন থেকে পাওয়া যায় সুদ, আর সংগঠন কার্য থেকে পাওয়া যায় মুনাফা। কোনো দেশের মোট উৎপন্ন মূল্য খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার আকারে উপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। সুতরাং, এই সকল উপাদান-আয়ের (factor income) সমষ্টিই হল জাতীয় আয়। অতএব, আমরা বলতে পারি, জাতীয় আয় ≡ মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট মুনাফা। এভাবে দেখলে জাতীয় আয় আসলে উপাদান আয়গুলির সমষ্টি। জাতীয় আয়কে এভাবে পরিমাপ করার পদ্ধতিকে বলে আয়শুমারি পদ্ধতি বা উপাদানকে প্রদত্ত মূল্যের সমষ্টি (Consus of Income Method or, Factor Payments Total)।

তৃতীয়ত, আয় এবং ব্যয় হল সাপেক্ষ পদ। একজনের যা আয়, তাই আর এক জনের ব্যয়। সুতরাং, জাতীয় আয়কে দেশের মোট ব্যয়ের সমষ্টি বা জাতীয় ব্যয় হিসাবেও দেখা যেতে পারে অর্থাৎ জাতীয় আয় ≡ জাতীয় ব্যয়। এখন, আমরা যদি ধরে নিই যে, দেশটি একটি বদ্ধ অর্থনীতি (অর্থাৎ কোনো আমদানি-রপ্তানি নেই) এবং দেশে মাত্র ভোগকারী ও বিনিয়োগকারী এই দুই শ্রেণির অর্থনৈতিক একক রয়েছে, তাহলে ঐ দেশের জাতীয় ব্যয় হল মোট ভোগ্যব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি। তাহলে, জাতীয় আয় ≡ জাতীয় ব্যয় ≡ মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয়। একটি দেশের জনসাধারণের হাতে যে মোট আয় এক বছরের মধ্যে এসে থাকে, তার একটি অংশ দেশবাসীদের জীবনধারণের জন্য ভোগ্যদ্রব্য কিনতে ব্যয়িত হয়। এই অংশটি হল মোট ভোগ ব্যয়। আয়ের অপর অংশটি আগামী বছরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন গঠনের কাজে লাগে। একে বলা হয় মোট বিনিয়োগ ব্যয়। সুতরাং, মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করে আমরা পাই মোট জাতীয় ব্যয় বা মোট জাতীয় আয়। এভাবে জাতীয় আয় পরিমাপকে বলা হয় ব্যয়শুমারি পদ্ধতি বা ভোগ-বিনিয়োগ সমষ্টি (Census of Expenditure Method or Consumption-Investment Total)।

যেভাবেই দেখি না কেন, জাতীয় আয়ের এই তিনটি দিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যা জাতীয় উৎপাদন, তাই-ই জাতীয় আয় এবং তাই-ই আবার জাতীয় ব্যয়। জাতীয় উৎপাদন ≡ জাতীয় আয় ≡ জাতীয় ব্যয়। একে জাতীয় আয় পরিমাপের মৌলিক অভেদ (Fundamental Identity in National Income Accounting) বলা হয়। সুতরাং, এই তিনটি ধারণার যে-কোনো একটির মাধ্যমে আমরা জাতীয় আয় পরিমাপ করতে পারি। তবে এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে উৎপাদনশুমারি এবং আয়শুমারি পদ্ধতি অধিক প্রচলিত।

1.7 জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা (Different Concepts of National Income)

1.7.1 স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product or GNP and Net National Product or NNP)

কোনো এক দেশে একটি আর্থিক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হয় তার অর্থমূল্য হল স্থূল জাতীয় উৎপাদন (GNP)। এখন, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে মূলধনি দ্রব্যের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। একে বলা হয় অবচয়। স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে অবচয় বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় উৎপাদন।

অর্থাৎ নিট জাতীয় উৎপাদন ≡ স্থূল জাতীয় উৎপাদন – অবচয়।

সংক্ষেপে, NNP ≡ GNP – D

এখন, স্থূল জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীকে টাকার অঙ্কে প্রকাশ করার জন্য প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদনকে সেই দ্রব্যের দাম দিয়ে গুণ করা হয়। যে বছরের দাম ব্যবহার করা হবে, সেই বছরের দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যাবে। যদি এই দামগুলি চলতি বছরের বাজার দাম হয়, তাহলে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মূল্যের সমষ্টিকে বলা হবে **চলতি বাজার দামে স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product at current market price)**। এখন, এই বাজার দামের মধ্যে সরকার আরোপিত পরোক্ষ কর অথবা সরকার প্রদত্ত ভরতুকি অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে এবং ভরতুকি যোগ করলে আমরা পাই উৎপাদনের **উপাদানের ব্যয়ে স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product at factor cost)**।

অর্থাৎ, উপাদানের ব্যয়ে স্থূল জাতীয় উৎপাদন ≡ স্থূল জাতীয় উৎপাদন – পরোক্ষ কর + ভরতুকি।

তেমনি উপাদানের ব্যয়ে নিট জাতীয় উৎপাদন ≡ নিট জাতীয় উৎপাদন – পরোক্ষ কর + ভরতুকি – অবচয়।

জাতীয় আয় বলতে এই উপাদানের ব্যয়ে নিট জাতীয় উৎপাদনকে বোঝায়।

1.7.2 স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় (Gross National Income or GNI and Net National Income or NNI)

কোনো দেশের সমস্ত উপার্জনকারী এককের আয় যোগ করে আমরা পাই সেই দেশের স্থূল জাতীয় আয়। কাজেই দেশের উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলির মোট আয় যোগ করলেই স্থূল জাতীয় আয় পাওয়া যাবে। উৎপাদনের উপাদানগুলি হল জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। জমির আয় হল খাজনা, শ্রমের আয় হল মজুরি, মূলধনের আয় হল সুদ, আর সংগঠনের আয় হল মুনাফা। সুতরাং আমরা নীচের অভেদটি লিখতে পারি ঃ

স্থূল জাতীয় আয় ≡ মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + মোট মুনাফা

আর, স্থূল জাতীয় আয় থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় বাদ দিলে আমরা পাই নিট জাতীয় আয়। অর্থাৎ,

নিট জাতীয় আয় ≡ স্থূল জাতীয় আয় – অবচয়

≡ মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + (মোট মুনাফা – অবচয়)

≡ মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + নিট মুনাফা

যেখানে নিট মুনাফা ≡ মোট মুনাফা – অবচয়।

1.7.3 আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় (Money National Income and Real National Income)

জাতীয় আয় পরিমাপ করার জন্য আমরা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে তাদের দাম দিয়ে গুণ করে সেই অর্থমূল্যগুলি যোগ করি। এই অর্থমূল্যের সমষ্টি হল **আর্থিক জাতীয় আয়** (Money National Income)। যে বছরের দামস্তর দিয়ে গুণ করা হয় সেই বছরের দামস্তরে জাতীয় আয়ের মান পাওয়া যায়। যে বছরের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিবেচনা করা হচ্ছে, যদি সেই বছরেরই দাম দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে আমরা পাই **চলতি বা বর্তমান দামে জাতীয় আয়** (National Income at current price)। অপরদিকে, কোনো বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়, তাই হল **প্রকৃত জাতীয় আয়** (Real National Income)। অপরদিকে, কোনো বছরে যে পরিমান দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় তাই হল **প্রকৃত জাতীয় আয়** (Real National Income)।

আর্থিক জাতীয় আয়কে দামস্তর দিয়ে ভাগ করলে প্রকৃত জাতীয় পাওয়া যায়। এই প্রকৃত জাতীয় আয় একই থাকলেও দামস্তর বাড়লে বা কমলে আর্থিক জাতীয় আয় বাড়বে বা কমবে। সুতরাং, আর্থিক জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাস দেখে প্রকৃত জাতীয় আয়ের কীরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি প্রয়োজন। শুধু তাই-ই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত জাতীয় আয়কে দেশের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি হারে বাড়তে হবে।

1.7.4 স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product or GDP and Net Domestic Product or NDP)

কোনো আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে শেষ (final) উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয়, তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে **মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন** বা **স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন** (GDP) বলে। এই স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় (Depreciation) বা D বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (NDP)। অর্থাৎ

$$NDP \equiv GDP - D$$ যেখানে D = অবচয়।

GDP এবং NDP উভয়ই বাজার দামে অথবা উপাদান দামে হিসাব করা যায়। বাজার দামে GDP পেতে গেলে দেশের ভৌগোলিক সীমানার (geographical territory) মধ্যে উৎপন্ন প্রতিটি দ্রব্য ও সেবাকার্যের পরিমাণকে বাজার দাম দিয়ে গুণ করে যোগ করা হয়। এভাবে আমরা পাই বাজার দামে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন। এর থেকে অবচয় বাদ দিয়ে আমরা পাই বাজার দামে নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন। আর, বাজার দামে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে এবং ভরতুকি যোগ করলে পাওয়া যায় উপাদান দামে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন। অনুরূপভাবে, বাজার দামে নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে এবং ভরতুকি যোগ করলে পাওয়া যায় উপাদান দামে নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন।

1.7.5 স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product or GDP and Gross National Product or GNP)

কোনো আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে (within the geographical territory) যে সমস্ত শেষ (final) উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্য তৈরি হয় তাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (Gross Demestic Product বা GDP) । অন্যদিকে, কোনো আর্থিক বছরে কোনো দেশের শ্রম ও মূলধন দ্বারা উৎপাদিত শেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে স্থূল জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা GNP) বলে। এক্ষেত্রে দ্রব্য বা সেবাকার্যের উৎপাদন দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বা বাইরে হতে পারে। কোনো উন্মুক্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেই দেশের অধিবাসীদের বিদেশ থেকে কিছু আয় পাওনা হয়। তেমনি, ঐ দেশের অধিবাসীরা বিদেশিদের কিছু অর্থ প্রদান করে থাকে যা বিদেশিদের আয় হিসাবে গণ্য। এই পাওনা ও প্রদানের পার্থক্যকে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় (Net Income from Abroad) বলা হয়। সেক্ষেত্রে, GDP ও GNP-র মধ্যে সম্পর্ক হ'ল ঃ

$$GNP \equiv GDP +$$ বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয়।

যদি এই নিট আয় ধনাত্মক হয়, তাহলে GNP > GDP হবে। যদি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় ঋণাত্মক হয়, তাহলে GNP < GDP হবে। যদি বিদেশ থেকে পাওনা ও বিদেশিদের পাওনা পরস্পর সমান হয়, তাহলে বিদেশ থেকে নিট প্রাপ্তি শূন্য হবে। তখন GNP ≡ GDP হবে।

বদ্ধ অর্থনীতিতে বৈদেশিক লেনদেন থাকে না। সুতরাং, **বদ্ধ অর্থনীতিতে GNP ≡ GDP** হবে। আবার GNP ও GDP থেকে অবচয় (D) বাদ দিলে যথাক্রমে NNP ও NDP পাওয়া যায়। অর্থাৎ $NNP \equiv GNP - D$ এবং $NDP \equiv GDP - D$। স্পষ্টতই, বদ্ধ অর্থনীতিতে NNP ≡ NDP হবে।

1.7.6 মাথাপিছু আয় (Per Income)

কোনো দেশের জাতীয় আয়কে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{কোনো বছরের জাতীয় আয়}}{\text{ঐ বছরের মধ্যবিন্দুতে জনসংখ্যা}}$$

জাতীয় আয় বলতে যদি আমরা আর্থিক জাতীয় আয়কে ধরি, তাহলে আর্থিক জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাথাপিছু আর্থিক জাতীয় আয় পাবো। আর যদি জাতীয় আয় বলতে আমরা প্রকৃত জাতীয় আয়কে ধরি, তাহলে প্রকৃত জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যাবে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়। এই মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়কে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক বলে ধরা হয়। যদি দেশের জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা একই হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় একই থাকবে। যদি জাতীয় আয় জনসংখ্যার থেকে বেশি হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। অন্যদিকে, জাতীয় আয় যদি জনসংখ্যার থেকে কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় কমবে। এখন, আমরা বলেছি যে কোনো দেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে সাধারণত ধরা হয় যে, ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। সুতরাং কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে গেলে ঐ দেশের প্রকৃত জাতীয় আয়কে জনসংখ্যার চেয়ে বেশি হারে বাড়তে হবে। তবেই দেশটির মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়বে বা দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা হবে।

1.8 সারাংশ (Summary)

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা : অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং যার মাধ্যমে দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসার : কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে তাকে অর্থনৈতিক প্রসার বা সমৃদ্ধি বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একযোগে অর্থনৈতিক প্রসার ও কাঠামোগত পরিবর্তন। অর্থনৈতিক প্রসার হল স্বল্পকালীন ধারণা। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল দীর্ঘকালীন ধারণা।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ বা নির্দেশক : কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন স্তরে রয়েছে বা ঐ দেশের কতটা উন্নয়ন ঘটেছে তা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন মানদণ্ড আছে। সেই মানদণ্ডগুলিকেই এক যোগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ বা নির্দেশক বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায়। আমরা মোটামুটি পাঁচটি এরূপ মানদণ্ডের পরিচয় পাই। সেগুলি হল— জাতীয় আয় সূচক, মাথাপিছু আয় সূচক, জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান, মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর জোগান এবং মানব উন্নয়ন সূচক।

৪. জাতীয় আয় সূচক : অর্থনীতিবিদ কুজনেৎস-এর মতে, কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় হল ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক অর্থাৎ জাতীয় আয় বেশি হলে উন্নয়নের স্তরও উচ্চ। এই পরিমাপটি অবশ্য একটু মোটা দাগের। কোনো দরিদ্র বড় দেশের মোট জাতীয় আয় কোনো ক্ষুদ্র আয়তনের উন্নত দেশের জাতীয় আয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে।

৫. মাথাপিছু আয় সূচক : অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক হল মাথাপিছু আয় সূচক। মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় যত বেশি, উন্নয়নের স্তর তত উচ্চ বলে ধরা যেতে পারে। তেমনি, মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নিম্ন বলে গণ্য করা যায়। তবে এই সূচকের প্রধান অসুবিধা হল, এই মানদণ্ডে আয়ের বণ্টন বিবেচনা করা হয়না। দেশের অল্প কয়েকজন ধনীর আয় বাড়লে এবং দরিদ্র বড় অংশের আয় কমলে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা বলা যাবে না।

৬. জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান সূচক : অর্থনীতিবিদ মরিস প্রদত্ত এই সূচকের মূলকথা হল, জনসাধারণের জীবযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান বাড়লে তবেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে। এই সূচকটি তিনটি উপসূচকের যৌথ বা সমন্বিত সূচক। এই তিনটি উপসূচক হল গড় আয়ু প্রত্যাশা বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। এই তিনটি উপসূচকের সরল যৌগিক গড়ই হল জীবনযাত্রার বাস্তব গুণমাণ সূচক (Physical Quality of Life Index বা PQLI)। অবশ্য জীবনধারণের গুণমান নির্ধারণে আরো অনেক বিষয়ের গুরুত্ব আছে। সেগুলি এই মানদণ্ডে ধরা হয়নি। তাছাড়া Morris-এর সূচকে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে তিনটি উপসূচকের সমান গুরুত্ব ধরা হয়েছে। এটিও বাস্তবসম্মত নয়।

৭. মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গি : এই মানদণ্ডে দেশের সাধারণ জনগণের কাছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলি কতটা পৌঁছেছে তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়। এই মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হল ঃ খাদ্য, বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিসেবা ও শিক্ষার সুযোগ। এই বিষয়গুলি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে যত সহজলভ্য হবে, দেশটিতে ততই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলে ধরা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দেশের দরিদ্রদের মৌল প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তবে এই মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি কী কী এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কীরূপ, সে সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে।

৮. মানব উন্নয়ন সূচক : মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI) হল তিনটি সামাজিক নির্দেশকের গড়। এই তিনটি সামাজিক নির্দেশক হল আয়ু প্রত্যাশা, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা ও শিক্ষা লাভ এবং মাথাপিছু আয়। আয়ু প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপাদন সূচক এই তিনটি সূচকের সরল যৌগিক গড় হল HDI বা মানব উন্নয়ন সূচক। এই সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। যে দেশে এই সূচকের মান যত বেশি, সেই দেশে তত বেশি মানব উন্নয়ন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। UNDP-র তত্ত্বাবধানে এবং পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ মাহবুব-উল হকের নেতৃত্বে একদল অর্থনীতিবিদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই HDI-এর ধারণাটি তৈরি করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme) অধীনে 1990 সাল থেকে প্রতিবছর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচকের দ্বারা ঐ দেশগুলিতে মানব উন্নয়নের স্তর নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়।

মানুষের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে এরূপ প্রধান সমস্ত বিষয়কেই মানব উন্নয়ন সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া, এই সূচকের গঠন পদ্ধতিও বেশ সরল ও যুক্তিযুক্ত। তবে এই সূচক গঠন করতে যে তিনটি উপসূচক ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের গুরুত্ব সমান বলে ধরা হয়েছে। বাস্তবে এই উপসূচকগুলির গুরুত্ব সমান না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৯. জাতীয় আয় : কোনো দেশের জনসাধারণ উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপন্ন হয় তার অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয়কে তিন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। **প্রথমত,** জাতীয় আয়কে সমগ্র দেশের উৎপাদনের সমষ্টি বা ***জাতীয় উৎপাদন*** হিসাবে দেখা যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** জাতীয় আয়কে দেশের সমস্ত **উপাদানগুলির আয়ের সমষ্টি** হিসাবেও দেখা যেতে পারে। **তৃতীয়ত,** জাতীয় আয়কে দেশের জাতীয় উৎপাদনের উপর **ব্যয়ের সমষ্টি** হিসাবেও দেখা যেতে পারে। জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জাতীয় ব্যয় এই তিনটি ধারণার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এদের যে-কোনো একটির মাধ্যমে কোনো দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়।

১০. জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

(ক) স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন : কোনো দেশে এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয় তার মূল্যকেই স্থূল জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। এই স্থূল জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের অবচয় বা ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় উৎপাদন।

(খ) স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় : উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য উপার্জনকারী ইউনিটগুলি এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ আয় করে, সেই আয়গুলিকে যোগ করলে পাওয়া যায় স্থূল জাতীয় আয়। এই স্থূল জাতীয় আয় থেকে মূলধনের অবচয় বা ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে পাওয়া যায় নিট জাতীয় আয়। কোনো দেশের নিট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় উৎপাদন সর্বদাই পরস্পর সমান।

(গ) আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয় : কোনো বছরে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীকে সেই বছরের দামস্তর দিয়ে গুণ করে যোগ করলে আমরা পাই বর্তমান মূল্যে জাতীয় আয় বা আর্থিক জাতীয় আয়। জাতীয় আয়কে অন্য বছরের দামস্তরেও প্রকাশ করা যেতে পারে। অপরদিকে, কোনো বছরের আর্থিক জাতীয় আয়কে সেই বছরের দাম সূচক দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ঐ বছরের প্রকৃত জাতীয় আয়।

(ঘ) স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন : কোনো আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে শেষ (final) উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয়, তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে স্থল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন বলে। এই স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অবচয় বাদ দিলে আমরা পাই নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন।

(ঙ) স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও স্থূল জাতীয় উৎপাদন : স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় যোগ করলে পাওয়া যায় স্থূল জাতীয় উৎপাদন। স্থূল জাতীয় উৎপাদনের মান স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের মানের সমান, কম অথবা বেশি হতে পারে।

(চ) মাথাপিছু আয় : কোনো দেশের কোনো বছরের জাতীয় আয়ের অঙ্ককে সেই দেশের ঐ বছরের মধ্যবিন্দুর জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় মাথাপিছু আয়। এই মাথাপিছু আয় টাকার অঙ্কে অথবা দ্রব্যের অঙ্কে হতে পারে। দ্রব্যের অঙ্কে মাথাপিছু আয় বা প্রকৃত মাথাপিছু আয়কে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে সাধারণত গণ্য করা হয়।

1.9 অনুশীলনী (Exercises)

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer Type Questions)

১. অর্থনৈতিক প্রসার কাকে বলে?
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও?
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক কাকে বলে?
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি নির্দেশকের নাম বল।
৫. কোন্ অর্থনীতিবিদ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে ধরতে চান?
৬. PQLI-এর পুরো নাম কী?
৭. PQLI-এই সূচকটি কে প্রবর্তন করেন?
৮. PQLI গঠন করতে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে?
৯. দেখাও যে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার = জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার – জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।
১০. UNDP-র পুরো কথাটি কী?
১১. মানব উন্নয়ন সূচক কোন সংস্থা প্রকাশ করে?
১২. HDI-এর পুরো কথাটি কী?
১৩. HDI নির্মাণে কোন্ অর্থনীতিবিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য?
১৪. OPEC-এর পুরো কথাটি কী?
১৫. মৌল প্রয়োজন পূরণ দৃষ্টিভঙ্গিতে কী কী বিষয়কে মৌল প্রয়োজন বলে ধরা হয়েছে?
১৬. মানব উন্নয়ন সূচকের তিনটি উপসূচক কী কী?
১৭. জাতীয় আয় কাকে বলে?
১৮. জাতীয় পরিমাপের কয়টি পদ্ধতি ও কী কী?
১৯. মাথাপিছু আয়ের সংজ্ঞা দাও।
২০. স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন কাকে বলে?
২১. GNP ও GDP-র পুরো নাম বল।
২২. GNP ও NNP-র মধ্যে সম্পর্ক কী?
২৩. GDP থেকে কীভাবে NDP পাওয়া যায়?
২৪. NNP ও NDP-র পুরো কথাগুলি কী কী?

■ মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium Answer Type Questions)

১. অর্থনৈতিক প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩. জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত?

৪. PQLI সূচকটির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের কয়েকটি সীমাদ্ধতা উল্লেখ কর।

৬. মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর জোগান সূচকটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে কতটা সন্তোষজনক বলে তুমি মনে কর।

৭, কোনো দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের মৌলিক অভেদ বলতে কী বোঝ?

৮. পার্থক্য নির্দেশ কর :

(ক) স্থূল জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন

(খ) স্থূল জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়

(গ) আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয়

(ঘ) স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন

(ঙ) স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন ও স্থূল জাতীয় উৎপাদন

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long Answer Type Questions)**

১. উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়, কতটা সন্তোষজনক বলে তুমি মনে কর।

২. জীবনযাত্রার বাস্তব বা ভৌত গুণমান সূচক সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে জীবনযাত্রার মান সূচকটি (PQLI) বিশ্লেষণ কর।

৪. মানব উন্নয়ন সূচক সম্পর্কে একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে মানব উন্নয়ন সূচকের মূল্যায়ন কর।

1.10 গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্যভুক্ত (2020) : অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২. Sarkhel, Jaydeb, Seikh Salim & Anindya Bhukta (2017) : Economic Development : Institution, Theory & Policy, Book Syndicate Private Limited, Kolkata.

৩. UNDP (1994) : Human Development Report, 1994, Oxford University Press, New York.

৪. সরখেল, জয়দেব এবং সেখ সেলিম (2019) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৫. Ghatak, S. (1990) : Development Economics, Longman, London.

৬. Meier, G.(ed.) (1984) : Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press, Oxford.

৭. Ray, D. (1998) : Development Economics, Oxford University Press, Delhi.

একক-2 ❑ ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য

2.2 প্রস্তাবনা

2.3 ভারতীয় অর্থনীতির মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ

2.4 জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন

2.5 ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন

2.6 ভারতে জীবিকা কাঠামো

2.7 ভারতে কাঠামোগত পরিবর্তনের তাৎপর্য

2.8 ভারতে সেবাক্ষেত্রচালিত উন্নয়ন

2.9 ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অংশ বৃদ্ধির কারণ

2.10 ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার কি উন্নয়নের নির্দেশক?

2.11 সারাংশ

2.12 অনুশীলনী

2.13 গ্রন্থপঞ্জি

2.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে—

- ভারতীয় অর্থনীতির মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন
- ভারতের জীবিকা কাঠামোর গতিপ্রকৃতি
- ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন ও তার তাৎপর্য
- সাম্প্রতিক কালে ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার এবং তার তাৎপর্য

2.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

ভারতীয় অর্থনীতিকে কখনও স্বল্পোন্নত অর্থনীতি, কখনও অনুন্নত অর্থনীতি, আবার কখনওবা বিকাশশীল অর্থনীতি বলে অভিহিত করা হয়। ভারতের অর্থনীতিকে কোন্ ধরনের অর্থনীতি বলে বর্ণনা করা উচিত তা

জানতে গেলে ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি জানা দরকার। সেজন্য বর্তমান এককে আমরা প্রথমেই ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে থাকলে সেই দেশের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তন ঘটে। কৃষি, খনি ইত্যাদি প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য বা সেবা ক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। দেশের জনসাধারণের জীবিকা কাঠামোতে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের কীরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা বোঝার জন্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ভারতের জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন কেমন হয়েছে তাও বিচার করা হয়েছে। উৎপন্ন কাঠামোর পরিবর্তন এবং জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তনকে একসাথে বলা হয় কোনো অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন। এই কাঠামোগত পরিবর্তন দেখে কোনো অর্থনীতির উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। ভারতীয় অর্থনীতি এখন উন্নয়নের কোন্ স্তরে রয়েছে তা বোঝার জন্যই আমরা দেশটির কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে এরূপ আলোচনা করেছি। এছাড়া, সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভারতের সাম্প্রতিক অগ্রগতিকে তাই অনেকে সেবাক্ষেত্রচালিত প্রসার বা উন্নয় বলে অভিহিত উচ্চ বা পরিণত স্তর নির্দেশ করে কিনা, তাও আমরা বর্তমান এককে বিশ্লেষণ ও বিচার-বিবেচনা করেছি।

2.3 ভারতীয় অর্থনীতির মৌল বৈশিষ্ট্যসূমহ (Basic Features of Indian Economy)

ভারত একটি স্বল্পোন্নত কিন্তু উন্নয়নশীল অর্থনীতি। **স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ হল সেই দেশ যার বর্তমান মাথাপিছু আয় কম এবং তার জীবনযাত্রার মান নিম্ন কিন্তু যার অর্থনৈতিক উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।** স্বল্পোন্নত দেশের এই সংজ্ঞা থেকে স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতির তিনটি মৌল লক্ষণের কথা বলা যেতে পারে। সেগুলি হল— (i) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, (ii) দারিদ্র্য বা জীবনযাত্রার নিম্নমান এবং (iii) উন্নয়নের সম্ভাবনা। বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ, নেপাল ও মায়ানমার, ভারত এবং কেনিয়া, আফগানিস্তান ও হাইতি, পাকিস্তান এবং ইরাক নানা বিষয়ে আলাদা। তবুও তাদের মধ্যে মৌল কয়েকটি বিষয়ে মিল রয়েছে। এরূপ প্রধান তিনটি মৌল সাধারণ বিষয় হল উল্লিখিত তিনটি অর্থাৎ স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান এবং উন্নয়নের সম্ভাবনা। এছাড়া, বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলির আরো কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল— মূলধনের স্বল্পতা, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, শিল্পে অনগ্রসরতা, জনসংখ্যার চাপ, বেকারি এবং নিম্নমানের মানবিক মূলধন, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য, প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা এখন ভারতীয় অর্থনীতির মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব। ভারতীয় অর্থনীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

(i) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা (Low per capita income)

উন্নত দেশের তুলনায় ভারতের মাথাপিছু আয় খুবই কম। 1951 সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর ভারতের জাতীয় আয় কিছুটা বেড়েছে বটে, তবে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে মাথাপিছু আয় খুব বেশি বাড়েনি। আমরা 2.1 নং সারণিতে নির্বাচিত কিছু দেশের 2020 সালের মাথাপিছু স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন দেখিয়েছি।

দেখা যাচ্ছে, ভারতের মাথাপিছু স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, জর্ডন প্রভৃতি দেশের তুলনায়ও যথেষ্ট কম (অর্ধেকেরও কম)। আর USA, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের তুলনায় তা ভীষণ কম। 2020 সালে ভারতের স্থূল অন্তর্দেশীয় মাথাপিছু আয় ছিল 1928 ডলারের মতো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছিল 63,593 ডলার অর্থাৎ ভারতের মাথাপিছু আয়ের প্রায় 33 গুণ। ভারতের মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা এই সারণি থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

সারণি 2.1

নির্বাচিত কিছু দেশের মাথাপিছু স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (2020)

(চলতি মার্কিন ডলারে)

দেশ	**মাথাপিছু আয়**
আফগানিস্তান	516.75
ইথিওপিয়া	936.34
নেপাল	1,155.14
পাকিস্তান	1,188.86
ভারত	1,927.71
ইরাক	4,145.86
জর্ডান	4,282.77
মেক্সিকো	8,329.27
মালয়েশিয়া	10,412.35
হাঙ্গেরি	15,980.74
গ্রিস	17,622.54
স্পেন	27,063.19
ইতালি	31,714.22
জাপান	40,193.25
যুক্তরাষ্ট্র (U.K.)	41,059.17
USA	63,593.44
নরওয়ে	67,329.68
সুইজারল্যান্ড	87,097.04

সূত্র : data.worldbank

(ii) জাতীয় আয়ের গঠন (Composition of National Income)

জাতীয় আয়ের গঠন বলতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনকে বোঝায় অর্থাৎ জাতীয় আয়ে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের (প্রাথমিক ক্ষেত্র) অবদান, শিল্পক্ষেত্রের (মাধ্যমিক ক্ষেত্র) অবদান এবং তৃতীয় বা সেবাক্ষেত্রের

অবদান (ব্যাঙ্ক, বিমা, বাণিজ্য প্রভৃতি) এই জাতীয় আয়ের গঠন থেকে জানা যায়। কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদানের ধরন থেকে সেই দেশের উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। উন্নত দেশের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কম। এটি সাধারণত 2 থেকে 4 শতাংশ। আর স্বল্পোন্নত দেশেণ জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান তুলনামূলকভাবে বেশি। 2017 সালে ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল 18%, মাধ্যমিক ক্ষেত্রের 30% এবং সেবাক্ষেত্রের 52% (সূত্র : lms.indianeconomy.net)।

(iii) জীবিকা কাঠামোর ধরন (Pattern of occupation structure)

ভারতের জীবিকা কাঠামোর ধরন থেকেও দেশটির অনুন্নতি ধরা পড়ে। উন্নত দেশে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা যেখানে 2 থেকে 5 শতাংশের মতো, ভারতে এই অনুপাত যথেষ্ট বেশি, 2020 সালে ভারতের মোট কর্মরত জনসংখ্যার 41.5 শতাংশ ছিল কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মে (প্রাথমিক ক্ষেত্রে) নিযুক্ত ছিল। আর শিল্পক্ষেত্রে (মাধ্যমিক ক্ষেত্র) নিযুক্ত ছিল 26.2 শতাংশ এবং সেবা ক্ষেত্র বা তৃতীয় ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল 32.3 শতাংশ। অর্থাৎ শিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল কর্মরত জনসংখ্যার 58.5 শতাংশ। (সূত্র : NSSO)। উন্নত দেশে এই অনুপাত 90 শতাংশেরও বেশি। ভারতের কৃষিতে মোট জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বাড়ছে যদিও শতকরা হিসাবে তা কমেছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা দিচ্ছে।

(iv) জনসংখ্যার বিপুল আয়তন (Large size of population)

ভারতে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। 2011 সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল 121 কোটি। 2022 সালের 11 এপ্রিল এই সংখ্যাটা দাঁড়ায় 140.40 কোটি। যদিও সম্প্রতি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সামান্য হলেও কমেছে (1 শতাংশের সামান্য কম), কিন্তু মোট জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রতি বছর বাড়তি জনসংখ্যা 1.4 কোটির মতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

(v) ব্যাপক বেকারি এবং দারিদ্র্য (Widespread unemployment and poverty)

ভারতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ পুরোপুরি বেকার। আর একটা বড় সংখ্যায় রয়েছে অর্ধ-বেকার এবং প্রচ্ছন্ন বেকার। এই বিপুল বেকার সমস্যায় পিছনে প্রধান কারণগুলি হল দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পক্ষেত্রের ধীর অগ্রগতি, গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের রুগ্ণতা প্রভৃতি। আর এই বেকারত্বের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক দারিদ্র্য। কোনো বৃক্তি কর্মহীন বা বেকার হয়ে পড়লেই তার আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় এবং সে দরিদ্র হয়ে পড়ে। বেকারি ও দারিদ্র্য তাই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ভারতে দারিদ্র্য পরিমাপের নানা চেষ্টা হয়েছে। সেই পরিমাপগুলির ফলাফল থেকে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, ভারতে প্রায় 30 শতাংশ লোক জীবন-ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ভোগব্যয়টুকু করতে পারে না। এদের চরম দরিদ্র বলে ধরা হয়। ভারতে সম্প্রতি (মার্চ, 2022) দারিদ্র্য কিছুটা কমেছে বলে অনেকে দাবি করেন। তাঁরা মনে করেন যে, ভারতের দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার 25 শতাংশের মতো। 140 কোটির দেশে এর অর্থ হল, দারিদ্র্য সীমার নীচের জনসংখ্যা 35 কোটির মতো। এই সংখ্যাটি অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। সুতরাং দ্বিতীয় বা উদার মতটি ধরে নিলেও দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের প্রায় 35 কোটি লোক জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রটুকু সংগ্রহ করতে পারেনা।

(vi) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য (Inequality in the distribution of income and wealth)

ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে তীব্র বৈষম্য বর্তমান। আয়ের অসমতার বিচারে বিশ্বে ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছে রাশিয়া। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ভারতের আয় বেড়েছে বটে, তবে সেই বাড়তি আয়ের সুফল দরিদ্রতম লোকেদের কাছে পৌঁছায়নি। আয় বৈষম্যের পিছনে বড় কারণ হল সম্পদের মালিকানায় বৈষম্য। মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর হাতে বিপুল পরিমাণ আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের 2022 সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, 2021 সালে ভারতের জনসংখ্যার। শতাংশ সচ্ছলতম ব্যক্তি জাতীয় আয়ের 22 শতাংশ ভোগ করত। আর অতি সচ্ছল 9 শতাংশ ব্যক্তি ভোগ করত জাতীয় আয়ের 35 শতাংশ। প্রতিবেদনটিতে আরো দেখা যাচ্ছে যে, ঐ সালে ভারতের জনসংখ্যার 50 শতাংশ দরিদ্র ব্যক্তি জাতীয় আয়ের মাত্র 13 শতাংশ ভোগ করত (সূত্র : World Inequality Report, 2022, World Bank)।

(vii) শিল্পে অনগ্রসরতা এবং বৈষম্য (Backwardness and inequality in industries)

ভারত শিল্পে অনগ্রসর। যেটুকুবা অগ্রগতি শিল্পে হয়েছে তা অপর্যাপ্ত এবং ভারসাম্যহীন। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের যদিও বা কিছুটা প্রসার হয়েছে, মূলধনি শিল্পের তেমন প্রসার ঘটেনি। ভারতে পরিকাঠামো শিল্পের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এধরনের শিল্পের বিকাশই জরুরি। আবার, ভারতের শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, দিল্লি, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যের শিল্পে যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্যগুলিতে শিল্পের আদৌ বিকাশ ঘটেনি।

(viii) মূলধনের অভাব (Lack of Capital)

অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও মূলধনের অভাব। নার্কসের মতে, মূলধনের অভাবের জন্য স্বল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। স্বল্পোন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় কম। ফলে মূলধন গঠন কম এবং শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। তার ফলে তাদের আয় কম। এভাবে অনুন্নত দেশে একটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে এবং দেশটিকে দারিদ্র্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখে।

(ix) বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি (Large trade deficit)

দু'একটি বছর বাদ দিলে পরিকল্পনা শুরুর (1951) বছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি থেকে গেছে। আর এই ঘাটতি ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে এক বিপুল আয়তন লাভ করেছে। তাছাড়া, অন্য অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের মতোই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনের। এর অর্থ হল, ভারত প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এ ধরনর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য হার শিল্পজাত দ্রব্যের অনুকূলে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের প্রতিকূলে থাকে (Prebisch Singer Thesis)। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে ভারতসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলি তেমন লাভবান হতে পারেনি।

(x) দ্বৈত অর্থনীতি (Dual economy)

অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও দ্বৈত অর্থনীতি বিরাজ করে। এই কথার তাৎপর্য হল, ভারতীয় অর্থনীতির অল্প কিছু অংশ খুবই উন্নত এবং অবশিষ্ট বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনুন্নত। উন্নত অংশের উৎপাদন কৌশল

খুবই আধুনিক। কিন্তু অনুন্নত অংশের উৎপাদন কৌশল চিরাচরিত ও সাবেকি ধরনের (traditional)। এধরনের অর্থনীতিকে দ্বৈত অর্থনীতি বলে। এরূপ অর্থনীতিতে উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চল পাশাপাশি বিরাজ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (interactions) থাকে না। ফলে উন্নত অঞ্চল দেশের অনুন্নত অঞ্চলকে টেনে উপরে তুলতে পারেনা। দুটি অঞ্চল সহাবস্থান করে (co-exist)।

(xi) মানবিক মূলধনের নিম্নমান (Low quality of human capital)

ভারতের জনসংখ্যার বড় অংশ নিরক্ষর। তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল। আধুনিক কোনো ধ্যানধারণা বা উৎপাদন কৌশল তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। অনেকেই বংশানুক্রমিক ভাবে একই পেশা গ্রহণ করে। ফলে শ্রমের চলনশীলতা ব্যাহত হয়। এসবের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম হয়। তাছাড়া, শ্রমিকদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার অভাব। জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ায় এদের শারীরিক সক্ষমতা কম। এ কথায় বলতে গেলে, ভারতের জনসংখ্যার গুণগত মান খুবই নিম্ন। এটি আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে।

(xii) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (Other features)

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও ভারতের অর্থনীতিতে আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল— (ক) সমাজে নারীদের নীচু স্থান, (খ) শিশুমৃত্যুর উচ্চহার (high infant mortality rate) (গ) শিশু শ্রমিকের আধিক্য, (ঘ) নারীদের অপুষ্টি, নিরক্ষরতা এবং অশিক্ষা, (ঙ) পরিবর্তন বিমুখ সমাজ কাঠামো, (চ) জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, (ছ) অদক্ষ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন, (ছ) রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রভৃতি।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভারতীয় অর্থনীতির অনুন্নতিকেই প্রকাশ করে। একথা ঠিক যে 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনার হাত ধরে (1951-2017) ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে, ভারতের শিল্পকাঠামো বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ঔপনিবেশিক ধরন অনেকটাই দূর হয়েছে, কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি কমছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ছে, কাঙ্ক্ষিত দিকে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তন ঘটছে ইত্যাদি। কিন্তু পাশাপাশি এটিও ঠিক যে, বিশ্বের দরিদ্রদের একটা বড় অংশই ভারতে বাস করে, বিশ্বের অপুষ্ট শিশুদের বড় অংশই ভারতে। শিশুদের অপুষ্টির ফলে তাদের শরীরের বয়স অনুপাতে বৃদ্ধি হচ্ছে না। বিষয়টি আমরা নীচের অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল থেকে মোটামুটি অনুমান করা চলে যে ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। ফলে ভারতের 5 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের একটা বড় অংশ অপুষ্টিতে ভোগে। আমরা সারণি 2.2 তে এরূপ শিশুদের অপুষ্টির চিত্রটি দেখিয়েছি। দেখা যাচ্ছে, শিশু অপুষ্টির হার ভারতে খুব বেশি। এর ফলে আগামী দিনে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া, অপুষ্টির ফলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি কম হবে (wasting) এবং উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হবে অর্থাৎ খর্বাকৃতি বা বেঁটে হবে। এই বয়স অনুপাতে স্বাভাবিক বাড়ন্ত না হওয়া (স্বাস্থ্যের অবক্ষয় বা wasting) এবং বেঁটে হওয়ার (stunting) চিত্রটি আমরা 2.3 নং সারণিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, 1998-2020 সালের সময়কালে কম ওজন বা হীন স্বাস্থ্যের শিশুর অনুপাত কমেনি (18 শতাংশের মতো)। আর শিশুদের উচ্চতা কম হওয়ার সমস্যা শতাংশের বিচারে কমেছে বটে, তবে অনাপেক্ষিক (absolute) বিচারে এই হার বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দু'দশকেও

ছিল খুবই বেশি। ভারতে এক-তৃতীয়াংরেণও বেশি শিশুর (5 বছরের কম বয়সি) উচ্চতা স্বাভাবিক চেয়ে কম। ভারত সহ এশিয়ার ও আফ্রিকার অনেক স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশেই এই সমস্যা বিদ্যমান।

সারণি 2.2

ভারতে 5 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের অপুষ্টির হার (শতাংশে)

2000–2002	18.4
2005–2007	19.6
2011–2013	15.0
2018–2020	15.3

সূত্র : WorldBank.org
World Development Report, 2021

সারণি 2.3

ভারতে 5 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের স্বাস্থ্যের অবক্ষয়ের ও বেঁটে হওয়ার হার (শতাংশে)

বছর	স্বাস্থ্যের অবক্ষয়	খর্বাকৃতি
1998–2002	18	54
2004–2008	20	48
2010–2014	16	38
2016–2020	18	34

সূত্র : World Bank, Planning Commission of India, NITI Aayog, Global Hunger Index এবং Multidimensional Poverty Index-এর বিভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি।

তথ্যসূত্র ঃ 25 Nov, 2021, Times of India.

2.4 জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন (Sectoral Distribution of National Income)

অর্থনৈতিক কার্যকলাপের চরিত্র অনুযায়ী কোনো দেশের অর্থনীতিকে তিনটে ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। সেই তিনটি ক্ষেত্র হল ঃ

(i) প্রাথমিক ক্ষেত্র ঃ এই ক্ষেত্রের কাজকর্মের মধ্যে জমির ভূমিকা প্রধান। প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে কৃষি, খনি, মৎস্য চাষ প্রভৃতি।

(ii) মাধ্যমিক ক্ষেত্র ঃ এই ক্ষেত্রের কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণ। মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিল্প, নির্মাণ কার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ প্রভৃতি।

(iii) সেবামূলক ক্ষেত্র ঃ এই ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের পরিষেবা উৎপাদন ও বণ্টন। সেবামূলক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক পরিসেবা, বিমা পরিসেবা প্রভৃতি।

জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন বলতে এই তিনটি ক্ষেত্র থেকে জাতীয় আয়ের কত কত অংশ আসে অর্থাৎ জাতীয় আয়ের গঠনকে বোঝায়। কোনো দেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদান কীরূপ, তাই-ই জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন থেকে জানা যায়। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনটিকে উৎপন্ন কাঠামো (Output structure) বলেও অভিহিত করব হয়। ঠিক তেমনি, কোনো অর্থনীতির এই তিনটি ক্ষেত্রের নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকও অনুরূপভাবে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে প্রাথমিক জীবিকা (primary occupation) বলে। অনুরূপভাবে, মাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে মাধ্যমিক স্তরের জীবিকা (secondary occupation) বলা হয়। তেমনি, সেবাকার্যে নিযুক্ত জনসাধারণের জীবিকাকে

তৃতীয় স্তরের জীবিকা (tertiary occupation) বলে। এই তিনটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার গঠনকে একসাথে জীবিকা কাঠামো (occupation structure) বলা হয়। উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোকে একসাথে কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো (economic structure) বলা হয়। এই অর্থনৈতিক কাঠামো (অর্থাৎ উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামো) দেখে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের .(Clark-Fisher Thesis) মতে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথেসাথে মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। অনুরূপ ভাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পেতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বাড়তে থাকে। সুতরাং, কোনো দেশের উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোর ধরন দেখে সেই দেশটির উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। যদি দেখা যায় যে, জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদানের অনুপাত কমছে এবং মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্রের অবদানের অনুপাত বাড়ছে এবং পাশাপাশি জীবিকা কাঠামোতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়, তাহলে বলা যাবে যে, দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাই আমরা পরের বিভাগগুলিতে ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন ও ভারতের জীবিকা কাঠামোও আলোচনা করব। বিগত বছরগুলিতে ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের তাৎপর্য অর্থাৎ এই কাঠামোগত পরিবর্তন কতটা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করছে তা আমরা বিশ্লেষণ করব।

2.5 ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন (Sectoral Distribution of National Income in India)

ক্লার্ক ফিশার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে, কোনো দেশের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন থেকে ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দেশটি যত উন্নত হতে থাকে, জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি কীরূপ তা দেখার জন্য আমরা পরিকল্পনা কালে (1950-51 থেকে 2016-17) ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন বিবেচনা করেছি। 2.4 নং সারণিতে আমরা উল্লিখিত সময়কালে ভারতে স্থূল দেশীয় উৎপন্নের ক্ষেত্রগত বণ্টন দেখিয়েছি।

সারণি 2.4

ভারতে স্থূল দেশীয় উৎপন্নের ক্ষেত্রগত বন্টন

(1980-81 সালের দামস্তরে)

ক্ষেত্র	1950-51	1970-71	1996-97	2002-03*	2016-17**
প্রাথমিক ক্ষেত্র	55.3	44.5	26.1	21.9	15.1
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	16.1	23.6	31.0	26.9	31.1
সেবা ক্ষেত্র	28.6	31.9	42.9	52.2	53.8
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

টীকা : * 1999–2000 সালের দামস্তরে, ** 2011–2012 সালের দামস্তরে
সূত্র : National Accounts Statistics, CSO, 2018

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1950–51 সালের পর থেকে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগত কমে আসছে। 1950–51 সালে ভারতে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপন্নে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল 55.3 শতাংশ। 1970–71 সালে এই অবদান কমে দাঁড়ায় 44.5 শতাংশ। আর 2016-17 সালে প্রাথমিক ক্ষেত্রে অবদান হল 15.1 শতাংশ। প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে কৃষি, বনজ সম্পদ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি। এদের মধ্যে কৃষিকার্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 1996-97 সালে যখন প্রাথমিক ক্ষেত্রের জাতীয় আয়ে অবদান ছিল 26.1 শতাংশ, তখন কৃষির অবদান ছিল 24.4 শতাংশ। 2016–17 সালে যখন প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমে 15.1 শতাংশে পৌঁছায়, তখন শুধুমাত্র কৃষির অবাদন হল 13.5 শতাংশ।

সারণি থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপাদনে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950–51 সালে মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে জাতীয় দেশীয় উৎপন্নের 16.1 শতাংশ উদ্ভূত হয়েছিল। 1996–97 সালে এই অংশ বেড়ে দাঁড়ায় 31 শতাংশ। তারপর অবশ্য ভারতের জাতীয় দেশীয় উৎপন্নে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান কিছুটা কমে যায় (26.9 শতাংশ)। পুনরায় 2016–17 সালে এই অবদান বেড়ে 31.1 শতাংশে পৌঁছায়। ভারতে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিল্প, খনিজদ্রব্য, নির্মাণ কার্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ। এদের মধ্যে শিল্পই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান ধীরে ধীরে বাড়ছে।

ভারতের স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপন্নে সেবাক্ষেত্রের অবদানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1950–51 সালে সেবাক্ষেত্রের অবদান ছিল 28.6 শতাংশ। 1996.97 সালে এই অবদান বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 43 শতাংশ। আর 2016–17 সালে সেবাক্ষেত্রের অবদান দাঁড়ায় প্রায় 54 শতাংশ। ভারতে সেবামূলক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য ও পরিবহণ, ব্যাংকিং ও বিমা প্রভৃতি। এদের মধ্যে বাণিজ্য ও পরিবহণই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে আমরা দেখছি যে, পরিকল্পনাকালে (1950–51 থেকে 2016–17) ভারতে স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপন্নে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমেছে। অন্যদিকে, মাধ্যমিক এবং সেবাক্ষেত্রের এই অবদান বেড়েছে। সুতরাং, ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যায় যে, ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বন্টনের পরিবর্তন দেখেই এই সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে। ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বে বলা হয় যে, কোনো দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র ও সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনে অনুরূপ ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই প্রকাশ করে। তবে এই পরিবর্তন খুব ধীর গতিতে হয়েছে। এর পিছনে প্রধান কারণ হল শিল্পের অগ্রগতির মন্থর হার।

2.6 ভারতে জীবিকা কাঠামো (Occupation Structure in India)

কোনো দেশের মোট শ্রমিকরে কত অংশ অর্থনীতির কোন্ ক্ষেত্রে নিযুক্ত, তাকে ঐ দেশের জীবিকা

কাঠামো বলে। আমরা জানি, কোনো দেশের অর্থনীতিকে তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায় ঃ (i) প্রাথমিক ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, বনজ সম্পদ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি। (ii) মাধ্যমিক ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে শিল্প, খনি, নির্মাণ কার্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ প্রভৃতি। (iii) সেবা ক্ষেত্র বা তৃতীয় স্তরের ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, পরিবহণ, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি। এই তিনটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকেও অনুরূপভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে প্রাথমিক জীবিকা, মাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে মাধ্যমিক স্তরের জীবিকা এবং সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসাধারণের জীবিকাকে তৃতীয় স্তরের জীবিকা বলে। এখন, ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পায় এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র ও সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয়ে কোন্ ক্ষেত্রের অবদান কতটা অর্থাৎ জাতীয় আয়ের কতটা অংশ কোন্ ক্ষেত্র থেকে আসে, তাকে বলে উৎপন্ন কাঠামো। অন্যদিকে, জনসংখ্যার কত অংশ কোন্ ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত, তাকে বলা হয় জীবিকা কাঠামো। এই উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোকে একসাথে অর্থনৈতিক কাঠামো বলা হয়। আমরা ভারতের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কালে উৎপন্ন কাঠামোর পরিবর্তন অর্থাৎ জাতীয় আয়ে ক্ষেত্রগত বণ্টন নিয়ে আগের বিভাগে আলোচনা করেছি। বর্তমান বিভাগে আমরা তাই ভারতের জীবিকা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা 1951 থেকে 2020 সালের মধ্যে ভারতের জীবিকার ধরনের গতিপ্রকৃতি 2.5নং সারণিতে উপস্থাপিত করেছি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1951 থেকে 1991 সালের মধ্যে ভারতের জীবিকা কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত কার্মরত জনসংখ্যার অনুপাত সামান্য কমেছে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মরত জনসংখ্যার অনুপাত সামান্যই বেড়েছে।

সারণি 2.5

ভারতে জীবিকার ধরন ঃ 1951 – 2020 (শতকরা হিসাবে)

ক্ষেত্র	1951	1991	1999	2006	2020
প্রাথমিক ক্ষেত্র	72.1	66.8	60.4	58.6	41.5
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	10.7	12.7	15.8	18.5	26.2
সেবা ক্ষেত্র	17.2	20.5	23.8	22.9	32.3
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

সূত্র : 1. 1951 এবং 1991 সালের জন্য Census Report
2. 1999, 2006 এবং 2020 সালের জন্য NSSO তথ্য

1991 সালের পর থেকে অবশ্য জনসংখ্যার জীবিকা কাঠামোয় কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও জাতীয় উৎপন্নের ক্ষেত্রগত বণ্টনের তুলনায় জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। দেখা যাচ্ছে যে, 2006 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার প্রায় 60 শতাংশ প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত। আর এই প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষিই প্রধান। আমরা দেখছি যে, ঐ সময়ের মধ্যে কৃষি থেকে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের অংশ কমে গেলেও কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত কমেনি। মাধ্যমিক ক্ষেত্র এবং সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার

অনুপাতও 1991 সাল পর্যন্ত প্রায় একই আছে। সুতরাং, 1951-1991 সালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয়ের কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটলেও জীবিকা কাঠামোয় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ উৎপন্ন কাঠামোয় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটলেও জীবিকা কাঠামোয় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কেবলমাত্র 2006 সাল থেকে 2020 সালের মধ্যে ভারতের জীবিকা কাঠামোয় সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। তা-ও মোট কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় 42 শতাংশ প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত এবং অবশিষ্ট 58 শতাংশ মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত। VKRV Rao এটিকে ভারতের কাঠামোগত পশ্চাদ্‌পসরণ (structural refrogression) বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতের জাতীয় আয়ের কাঠামোর পরিবর্তন অথচ জীবিকা কাঠামোর এই অনড়তাকে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক উনয়নের সমস্যা ও বিবোধাভাস (both the problem and the paradox of Indian Economic Development) বলে অভিহিত করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতে উৎপন্ন কাঠামোয় পরিবর্তন ক্লার্ক-ফিশায় তত্ত্ব মাসিক ঘটেছে, কিন্তু জীবিকা কাঠামোয় পরির্বতন সেই তত্ত্ব মাসিক ঘটেনি। এককথায়, ভারতের অর্থনতৈিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন না হওয়ার পিছনে অনেক বিষয় কাজ করছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পে অগ্রগতির মন্থরতা। আমরা বলতে পারি যে, ভারতে জাতীয় আয়ের কাঠামোর পরিবর্তন ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব মাফিক ঘটেছে, কিন্তু জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন ঐ তত্ত্ব মাফিক হয়নি।

2.7 ভারতে কাঠামোগত পরিবর্তনের তাৎপর্য (Significance of Change in Structural Change in India)

ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে, কোনো দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন থেকে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্ক একটা ধারণা করা যায়। কাঠামোগত বণ্টনের দুটি দিক ঃ **প্রথমত,** কাঠামোগত বণ্টন বলতে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের অবদানকে বোঝায়। একে বলা হয় উৎপন্ন কাঠামো (output structure) অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন। দ্বিতীয়ত, কাঠামোগত বণ্টনের আর একটি দিক হল দেশের কর্মরত জনসংখ্যার জীবিকা কাঠামো (occupation structure) অর্থাৎ দেশের মোট শ্রমিকের কত অংশ কোন্ ক্ষেত্রে নিযুক্ত। উৎপন্ন কাঠামো এবং জীবিকা কাঠামোকে একসাথে বলা হয় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো (economic structure)। এখন, ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের মতে, কোনো দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে ঐ দেশের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমে এবং মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান বাড়ে। দেশের কর্মরত জনসংখ্যার জীবিকা কাঠামোতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। এই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জাতীয় আয়ে ও জীবিকা কাঠামোয় পরিবর্তনের তাৎপর্য বিচার করা যেতে পারে। ভারতের আয় ও জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাই ঃ

(i) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমেছে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে।

(ii) ভারতের জাতীয় আয়ে শিল্পক্ষেত্রের অবদান বাড়লেও তা খুব ধীর গতিতে বেড়েছে। আলোচ্য সময়কালে আমাদের শিল্পগুলির উন্নয়নের হার খুব দ্রুত ছিল না। ফলে দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পক্ষেত্রে অবদান কিছুটা বাড়লেও তা খুব ধীরে বেড়েছে। 1965-80 সময়কালে শিল্পের অগ্রগতি যথেষ্ট মন্থর ছিল।

(iii) ভারতের শিল্পগুলিকে সংগঠিত ও অসংগঠিত এই দুই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। পরিকল্পনাকালে সংগঠিত শিল্পের গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, অসংগঠিত শিল্পের গুরুত্ব ততটা বাড়েনি। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের একটা বড় অংশ হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। এই শিল্পগুল বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন। অনেক ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। মাঝারি ও বড় শিল্প ইউনিটগুলি তাদের গ্রাস করছে। তাছাড়া, অতিক্ষুদ্র (micro) এবং ক্ষুদ্র (small) শিল্প ইউনিটগুলি মাঝারি ও বড় আয়তনের শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। এসবের ফলে ভারতে সংগঠিত শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্ব কমেছে।

(iv) জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটলেও জনসাধারণের জীবিকা কাঠামোয় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এর পিছনে প্রধান কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ না বাড়া। ভারতের শিল্পক্ষেত্র দেশের প্রতিবছর বাড়তি শ্রমিককে কাজের সুযোগ করে দিতে পারেনি। এর ফলে একদিকে বেকার সমস্যা বেড়েছে এবং অন্যদিকে জীবিকা কাঠামো মোটামুটিভাবে অনড় থেকে গেছে।

(v) ভারতের জাতীয় আয়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের চেয়ে সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান বেশি হারে বেড়েছে। সেবা ক্ষেত্রের প্রসারের পিছনে প্রধান কারণগুলি হল ঃ উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের সেবা ও বিলাস দ্রব্যের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সেবাক্ষেত্রে জনসাধারণের বেশি ব্যয় করার প্রবণতা, বৈদ্যুতিন লেনদেন এবং ব্যবস্থার ফলে বহুরকমের সেবামূলক কাজের উৎপত্তি এবং তাদের প্রসার, সামাজিক পরিসেবা যাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি।

এখন প্রশ্ন হল, দ্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতে যে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে, তা কি উচ্চতর উন্নয়নের স্তর নির্দেশ করছে? এর উত্তরে আমরা বলবো যে, ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তন অবশ্যই দেশটির কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে। তবে তা বিরাট কিছু উন্নয়নের অবস্থা নির্দেশ করে না। আমাদের এই সংযত মন্তব্যের পিছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করছে। **প্রথমত,** ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনে পরিবর্তন ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব মাফিক ঘটেনি। **দ্বিতীয়ত,** ভারতে যে সেবাক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে তা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের সেবাক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে তুলনীয় নয়। উন্নত দেশে সেবাক্ষেত্রের প্রসার সেই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিণত স্তর নির্দেশ করে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা নয়। এখানে বরং অনুন্নতির কারণেই সেবাক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। ভারতে শিল্পের প্রসার পর্যাপ্ত নয়। বাড়তি জনসংখ্যাকে শিল্পক্ষেত্রে কাজ দেওয়া যায়নি। ফলে কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ অসম্ভব বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্রের এই বিপুল উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার একটা অংশ শহরে কাজের খোঁজে ভিড় করেছে। এরা শহরে নানা দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য নানারকম সেবামূলক কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান আদৌ বাড়েনি। দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি। সুতরাং সেবা ক্ষেত্রের প্রসার সর্বদাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচারক নয়।

2.8 ভারতে সেবাক্ষেত্রচালিত উন্নয়ন (Service-led Growth in India)

ভারতের জীবিকা কাঠামো এবং উৎপন্ন কাঠামো বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পরিকল্পনাকালে জীবিকা কাঠামোয় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু জাতীয় উৎপন্নের কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। 1950-51 সাল থেকে 2020-21 সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় উৎপন্নের ক্ষেত্রগত বণ্টন বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে

যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই বণ্টনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা 2.6 নং সারণিতে 1950-51 থেকে 2020-21 সময়কালে ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনে দীর্ঘকালীন পরিবর্তন দেখিয়েছি। এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1950-51 সালে ভারতের জাতীয় আয়ে তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্রের অবদান ছিল 30.3 শতাংশ। 1990-91 সালে সেবাক্ষেত্রের অবদান বেড়ে দাঁড়ায় 41.9 শতাংশ। পাশাপাশি, প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ঐ সময় কালে 53.1 শতাংশ থেকে 30.4 শতাংশে নেমে আসে। আর মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান 16.6 শতাংশ থেকে বেড়ে হয় 27.7 শতাংশ। 2002-03 সালে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান আরো কমে দাঁড়ায়। 21.9 শতাংশ। শিল্পক্ষেত্রের অবাদন কিন্তু বাড়েনি। বরং তা সামান্য কমে 26.9 শতাংশে দাঁড়ায় অর্থাৎ 1990-91 সাল থেকে 2002-03 সময়কালে শিল্পের অগ্রগতির হার উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু ঐ সময়কালে জাতীয় উৎপন্নে সেবাক্ষেত্রের অবদান 41.9 শতাংশ থেকে বেড়ে 52.2 শতাংশে পৌঁছায়। এরপর 2002-03 সাল থেকে 2020-21 সাল পর্যন্ত এই প্রায় দু'দশক সময়কালে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান আরো কমেছে— 21.9 শতাংশ থেকে 16.4 শতাংশ। শিল্পের অবদান 26.9 শতাংশ, থেকে বেড়ে হয়েছে 29.3 শতাংশ আর সেবা ক্ষেত্রের অবদান হয়েছে 54.3 শতাংশ। অর্থাৎ নতুন শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান অর্ধেকেরও বেশি। ভারতের সাম্প্রতিক উন্নয়নকে অনেকে তাই সেবা ক্ষেত্রচালিত উন্নয়ন (service. led growth) বলে।

সারণি 2.6

ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান (শতকরা)
(1950-51 থেকে 2020-21)

ক্ষেত্র	1950-51	1990-91	2002-03	2020-21
প্রাথমিক ক্ষেত্র	53.1	30.4	21.9	16.4
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	16.6	27.7	26.9	29.3
সেবা ক্ষেত্র	30.3	41.9	52.2	54.3
মোট	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

টীকা : 1. 1950-51 এবং 1990-91 সালের তথ্য 2004-05 সালের দান স্তরে।
2. 2002-03 সালের তথ্য 1999-2000 সালের দাম স্তরে।
3. 2020-21 সালের তথ্য 2011-12 সালের দাম স্তরে।

সূত্র : National Accounts Statistics, CSO, 2018

সারণি 2.6 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান এই শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ভারতে সেবাক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে : (ক) বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, (খ) পরিবহণ, মুজতকরণ ও যোগযোগ, (গ) ফিনান্স, বিমা এবং রিয়াল এস্টেট, এবং (ঘ) জনসমষ্টিমূলক ও ব্যক্তিগত সেবাকার্য। আমরা যদি সেবাক্ষেত্রের এই উপ-ক্ষেত্রগুলির (sub-sectors) বৃদ্ধির হার বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 1990-91 সাল থেকে এই উপ-ক্ষেত্রগুলির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য ক্ষেত্রের (মাধ্যমিক ও প্রাথমিক ক্ষেত্র বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি। স্বভাবতই, জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের শতকরা অনুপাত এর

ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা 2.7 নং সারণিতে 1990-91 থেকে 2013-14 সালের সময়কালে ভারতের সেবাক্ষেত্রের অন্তর্গত উপ-ক্ষেত্রগুলির প্রসারের হার দেখিয়েছি। তুলনার সুবিধার জন্য আমরা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হারও তুলে ধরেছি। এই সারণি কে দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র 1999-2000 সাল থেকে 2007-08 সময়কালে নির্মাণ শিল্পের গড় বৃদ্ধির হার (10.5 শতাংশ) সেবা ক্ষেত্রের উপ-ক্ষেত্রগুলির বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি ছিল। সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য বছরগুলিতে সেবাক্ষেত্রের বিভিন্ন উপ-ক্ষেত্রগুলির বার্ষিক বৃদ্ধির হার অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি ছিল। এই তথ্যই ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধিকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করছে।

সারণি 2.7

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার
(1990-91 সাল থেকে 2013-14 সাল পর্যন্ত)

অর্থনৈতিক কাজকর্ম	1990-91 থেকে 2000-2001	1999-2000 থেকে 2007-08	2004-05 থেকে 2013-14
প্রাথমিক ক্ষেত্র			
1. কৃষি, বনজসম্পদ ও মৎস্যচাষ	2.6	2.8	3.8
মাধ্যমিক ক্ষেত্র			
2. খনি ও পাথর খাদ	3.9	5.1	2.8
3. শিল্প-কারখানা	5.9	7.6	6.9
4. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জলসরবরাহ	6.5	4.6	6.3
5. নির্মাণ শিল্প	5.1	10.5	7.5
সেবা ক্ষেত্র			
6. বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	7.2	8.8	9.0
7. পরিবহন, মজুতকরণ ও যোগাযোগ	8.0	13.8	9.0
8. ফিনান্স, বিমা এবং রিয়াল এস্টেট	8.4	8.8	11.5
9. জনসমষ্টি ও ব্যক্তিগত সেবাকার্য	6.7	5.6	7.0

সূত্র : National Accounts Statistics, CSO-এর বিভিন্ন সূত্র থেকে নির্ণীত।

2.9 ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অংশ বৃদ্ধির কারণ (Causes of Increase in Share of Service Sector to India's National Income)

বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের শতকরা অনুপাত বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের এই অবদান-অনুপাত বৃদ্ধির পিছনে নানা কারণ কাজ করেছে। সংক্ষেপে সেই কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

1. 1991 সালে ভারত সরকার নতুন শিল্পনীতির মাধ্যমে সংস্কার ও উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিময়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়। একচেটিয়া ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি খুবই শিথিল ও উদার করা হয়। এসবের ফলে ভারতে আয় বৈষম্য খুবই বেড়েছে। উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছে এবং তাদের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে। ঐ শ্রেণির লোকেদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার ফলে তাদের সেবা ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেড়েছে। ভারতের সাম্প্রতিক আয় বৈষম্য দেশটির সেবা ক্ষেত্রের প্রসারের অন্যতম কারণ।

2. 1990-এর দশকে উদার শিল্পনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানা আর্থিক সংস্কার শুরু হয়। ব্যাংক, বিমা, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি মূলধনকে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান করা হয়। বিদেশি মূলধনকেও এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়। এসবের ফলে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন শতাব্দীতে বেসরকারি বিনিয়োগ (বিদেশি বিনিয়োগসহ) বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বহু দেশি-বিদেশি সংস্থা পারস্পরিক সহযোগিতার (joint collaboration) মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। 2010 সালের পর থেকে এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ভারতের সেবাক্ষেত্রের প্রসারের পিছনে সরকারের উদারনীতি বিশেষভাবে কাজ করেছে।

3. একথা ঠিক যে, নানা অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে ভারতের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বাড়ার সাথে সাথে মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশি বেশি ব্যয় করতে চাইছে। 2000 সালের পর থেকে ভারতে বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেক ম্যানেজমেন্ট স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও অনেক বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম, নার্স ট্রেনিং স্কুল, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট স্কুল, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য স্যারবেটরি ইত্যাদির সংখ্যা খুবই বেড়েছে। এর ফলেও ভারতে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে।

4. কোনো দেশে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে থাকে, তখন বিভিন্ন ধরনের কাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষায়ণ (specialisation) ঘটে। অনেক শিল্প সংস্থা কিছু কাজকর্ম নিজেরা না করে ঐ বিষয়ে দক্ষ এরূপ কার্যকে দিয়ে করিয়ে নেয়। এই ব্যবস্থা উভয়পক্ষেরই কাছে লাভজনক। এই ব্যবস্থার দ্বারা শিল্প সংস্থাগুলি অনেক কাজে বিশেষজ্ঞের সেবা পায়। সব ধরনের কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ শ্রমিক রাখতে হয় না। ফলে তাদের মজুরি বাবদ ব্যয় করে। অন্যদিকে, বাইরের সংস্থাটিও এধরনের কিছু piece-meal কাজ করার সুযোগ পায়। সমগ্র কাজটি সুসম্পন্ন করার দায় প্রায়শই তাদের থাকে না। চলতি কথায় একে বলা হয় outsourcing অর্থাৎ বাইরের কোনো উৎস বা সুযোগ থেকে কাজটি করিয়ে নেওয়া। অধ্যাপক জগদীশ ভগবদী এ ধরনের কাজকর্মকে splintering বলে অভিহিত করেছেন (splintering-এর অর্থ হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পষ্ট অংশে বিভাজন)। এখন,

এই সমস্ত ভাঙা বা টুকরো কাজকর্মের মূল্যকে সেবাক্ষেত্রের অবদান বলে গণ্য করা হয়। সম্প্রতি, বিশেষত 2000 সালের পর থেকে, এই outsourcing বা splintering-এর চল খুব বেড়েছে। এর ফলে সেবাক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে। এই কাজগুলি ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের কাজ হলেও শিল্পোৎপাদনের হিসাবে কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়না। এই outsouring কাজগুলিকে সেবা ক্ষেত্রের কাজ হিসাবেই গণ্য করা হয়।

5. বর্তমানে বৈদ্যুতিন কলাকৌশলের প্রযুক্তিতে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এবং তথ্য প্রযুক্তির দ্বারা চালিত সেবা ক্ষেত্রের (IT & ITES : Information Technology and Information Technology Enabled Services) বিস্ময়কর প্রসার ঘটেছে। অনেক নতুন নতুন দ্রব্য ও সেবাকার্য এই ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়েছে। ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার, সেল ফোনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং এর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন প্রভৃতির ফলে ভারতে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এটিও ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রসারের পিছনে কাজ করেছে।

6. সাম্প্রতিক কালে ভারতের সরকারি প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে নানা আর্থিক সাহায্য, বেকার ভাতা, বার্ধক্যভাতা, বিধবা ভাতা, দুর্ঘটনাজনিত কারণে পরিবারের কারও মৃত্যু হলে এককালীন অর্থসাহায্য ইত্যাদির ফলে সরকারি ব্যয় বহুগুণ বেড়েছে। এসবের ফলেও ভারতের জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে।

7. ভারতে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সেবাকার্যের দ্রুত প্রসার ঘটছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে দিন দিন নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, ই-মেল, হোয়াট্‌স অ্যাপ, ইনস্ট্রাগ্রাম, NEFT, RTGS প্রভৃতির দৌলতে বর্তমানে রেল ও বিমান টিকিট কেনা, হোটেল বুকিং, ট্যাক্স বুকিং, e-commerce-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত কাজের সুযোগ যত বাড়ছে, পর্যটন শিল্পও তত প্রসার লাভ করছে। আর এসমস্ত পরিসেবা দিতে অনেক ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র সংস্থা এগিয়ে এসেছে। তাদের আয়ও সেবা ক্ষেত্রের আয়, কেননা এরা পর্যটকদের নানা পরিসেবা দান করছে। এসবের ফলেও ভারতে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। ভারতের জনসাধারণ যতই বৈদ্যুতিক লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, ততই এই ধরনের সেবামূলক কাজের প্রসার ঘটবে।

8. সংস্কার-পরবর্তী যুগে ভারতে ব্যাপক নগরায়ন ঘটেছে। বড় ও মাঝারি শহরগুলিকে কেন্দ্র করে বহুতলবিশিষ্ট আবাসন গড়ে উঠছে। এটিও ভারতে সেবাক্ষেত্রের দ্রুত বৃদ্ধির পিছনে কাজ করছে। নগর প্রসারের সাথে সাথে যোগাযোগ, জনকৃত্যক (public utility) ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে। নগর জীবন খুবই ব্যস্ত জীবন। তাই নাগরিকেরা অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাড়িতে বসেই পেতে চায় (home delivery)। তারা সংসারের অনেক প্রয়োজনীয় কাজ অপরকে সার্ভিস চার্জ দিয়ে করিয়ে নেয় (বাড়িতে বসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত দেওয়া, বিদ্যুৎ বিল মেটানো, বাড়িতে অতিথি এলে অর্ডার দিয়ে খাবার আনিয়ে নেওয়া প্রভৃতি)। এককথায়, মানুষের ভোগের ধরনের পরিবর্তন ঘটে, নতুন নতুন দ্রব্য ও সেবাকার্য ভোগের তালিকায় (consumption basket) ঠাঁই পায়। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততার ফলে এবং ভোগের ধরনে পরিবর্তনের ফলে মানুষের ভোগের দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে সেবাদ্রব্যের (services) গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। এর ফলেও ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রাধান্য বাড়ছে এবং জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের শতকরা অবদান বাড়ছে।

9. ভারতে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ বিশেষ বাড়েনি। আর অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। ফলে কৃষি হয়ে পড়েছে জনাকীর্ণ। কৃষিতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক প্রচ্ছন্ন বেকার। শিল্পে মন্দা এবং কৃষির ব্যর্থতার দরুন ভারতে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই বেকারদের একটা বড় অংশ বর্তমানে আর্থিক চাপে অসংগঠিত সেবাক্ষেত্রে যা-হোক একটা কাজ জুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলেও ভারতে অসংগঠিত সেবাক্ষেত্রের দ্রুত প্রসার ঘটেছে।

10. আধুনিক শিল্প পরিচালনায় নানা পরিবর্তন ও নানা জটিলতা এসেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন শ্রম কল্যাণ, শিল্প ক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, জনসংযোগ, বিপণন, কর্মচারীদের জন্য নানা ক্ষেত্রে আইনি পরিসেবা প্রদান, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি খাতে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হয়। এসবের ফলেও ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার ঘটছে। এবং জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অংশ বাড়ছে।

2.10 ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার কি উন্নয়নের নির্দেশক? (Is Expansion of Service Sector in India an Indicator of Growth?)

বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের মতে, কোনো দেশ যত উন্নত হতে থাকে, ততই তার জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। দেশের কর্মরত জনসংখ্যার জীবিকা কাঠামোতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। তাহলে প্রশ্ন হল, ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের এই অবদান বৃদ্ধি কি উন্নয়নের উচ্চতর স্তর নির্দেশ করে? ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব অনুসরণ করলে বলতে হয় যে, ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত টানার আগে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে :

আমরা জানি যে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অংশ সর্বাধিক। উন্নত দেশে এরূপ ঘটনার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করে। **প্রথমত,** উন্নত অর্থনীতির উৎপাদন কাঠামো সুবিস্তৃত। সেখানে বহুবিচিত্র রকমের দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত উৎপাদনকে কেন্দ্র করে নানা সেবামূলক কাজের প্রসার ঘটে। **দ্বিতীয়ত,** বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্য, ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থা খুবই উন্নত। এসব ক্ষেত্রে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ নিযুক্ত। এইসব দেশগুলিতে জাতীয় আয়ে ব্যাংক ও বিমা ক্ষেত্রের অবদান বা আর্থিক ক্ষেত্রের অবদান খুব বেশি। তাছাড়া, উন্নত দেশগুলিতে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বেশি। ফলে জীবনধারণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি এদের আগেই মিটে গেছে। জনসাধারণের বড় অংশের এখন চহিদা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পরিসেবা নানা বিলাসদ্রব্য ও আরামদায়ক দ্রব্যের জন্য চাহিদা। তাই এ ধরনের উন্নত অর্থনীতিতে শিল্পদ্রব্য (manufactured goods) অপেক্ষা সেবাদ্রব্যের চাহিদা বেশি। তাই এই দেশগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতার বড় অংশই সেবাদ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনে নিয়োজিত হয়। স্বভাবতই, উন্নত দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের তুলনায় সেবা ক্ষেত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আয় কম বলে তাদের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা বেশি; সেবাদ্রব্য ও বিলাস দ্রব্যের

চাহিদা কম। ভারতে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা মেটাতে গেলে দ্রব্য উৎপাদনের উপর জোর দিতে হয়। সুতরাং ভারত এখনও উন্নয়নের পরিণত স্তরে (matured state) পৌঁছায়নি। জাতীয় আয়ে সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান বাড়লেই আমরা বলতে পারি না যে, ভারত উন্নয়নের পরিণত স্তরে পৌঁছে গেছে। আমরা বড় জোর বলতে পারি যে, ভারত উন্নয়নের দিকে তার যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের এরূপ সতর্ক মন্তব্য করার পিছনে কয়েকটি বিষয় কাজ করছে। সেই বিষয়গুলি আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

প্রথমত, ভারতের উৎপন্ন কাঠামোর পরিবর্তন ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব মাসিক (in clark-Fisher line) ঘটেছে। কিন্তু জীবিকা কাঠামোয় পরিবর্তন তেমন ঘটেনি। ভারতের জীবিকা কাঠামো মোটামুটি অনড়। এর পিছনে প্রধান কারণ হল ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতা এবং শিল্পে অগ্রগতির মন্থর হার। তাই ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের উচ্চ অবদান দেশটির উন্নয়নের উচ্চ স্তর প্রকাশ করে না।

দ্বিতীয়ত, ভারতে শিল্পের যেটুকু বা প্রসার ঘটেছে, শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োগ আদৌ বাড়েনি। শিল্পের এই অগ্রগতিকে অনেকে কর্মহীন প্রসার বা jobless growth বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে ভারতের কৃষিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন ও মরত্তমি বেকারি। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করায় ভারতীয় কৃষি হয়ে পড়েছে জনাকীর্ণ। এই উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যার একটা বড় অংশ শহরে এসেছে কাজের সন্ধানে। এদের অধিকাংশই অদক্ষ শ্রমিক এরা শহরের অসংগঠিত সেবাক্ষেত্রে নানা ছোটোখাটো কাজ নিয়েছে, যেমন, চায়ের দোকানে কাজ, বাস বা রেলস্টেশনে মুটে-মজুরের কাজ, ছোটোখাটো দোকানে হেল্পারের কাজ, হোটল ও রেস্টুরেন্টে বয়ের বা বেয়ারার কাজ প্রভৃতি। এ ধরনের কাজে তাদের মজুরি প্রায় জীবনধারণের স্তরের মজুরি। এই কাজের ফলে তাদের নিজেদের দারিদ্র্য কমেনি; দেশেরও কোনো উন্নতি ঘটেনি। এরা অসংগঠিত সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত। এদের আয়ও সেবাক্ষেত্রের আয়। তাই এদের এধরনের কাজের ফলে জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়ছে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় অর্থনীতিতে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও খুব বেশি। এদের একটা অংশ ব্যাংক, বিমা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এজেন্ট বা দালালের কাজ করছে। অনেকে ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য, স্টেশনারি জিনিসপত্র, বই প্রভৃতির অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করছে। এরা নিজেদের যোগ্যতামান অনুযায়ী কাজ পায়নি। অর্থনীতির ভাষায় এরা হল প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার। এদের অনেকে আবার সংবাদপত্র ফেরি, ট্রেনে এবং বড় রাস্তার মোড়ে বই ও পত্র-পত্রিকা বিক্রি করে। ভারতে তীব্র বেকারির ফলে এরা এধরনের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এদের আয়ত্ত সেবা ক্ষেত্রের আয়। এধরনের কাজের প্রসারের ফলেও জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়ে, যদিও এই কাজগুলি দেশের অর্থনৈতিকুন্নয়নে সাহায্য করেন ।

চতুর্থত, ভারতের পরিবহণ ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও রয়েছে অসংখ্য অদক্ষ শ্রমিক। মোটর গ্যারেজে মেকানিকের হেল্‌পার, বাসস্ট্যান্ডে বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতি পরিষ্কার করা, পর্যটন স্থানে হোটেল থেকে যাত্রী এনে বাস বা ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজে এরা যুক্ত। ট্রেনে যে ছেলেটি জুতো পালিশ করে বা হকারি করে, গ্রামে গঞ্জে যারা নানা মনোহারি দ্রব্য ও শাকসবজি ফেরি করে, শহরের ছোটো খাটো মোড়ে যারা ফলের দোকান চালায় ইত্যাদি আরও অনেকের কাজ সেবাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এদের সংখ্যা বাড়লে অঙ্কের হিসাবে সেবাক্ষেত্রের প্রসার ঘটে বটে, কিন্তু সমগ্র দেশের প্রসার বা উন্নতি ঘটেনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে যে সেবাক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে তা আসলে দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং

বেকারির সম্মিলিত ফল। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে দেশগুলির উন্নয়নের পরিণত স্তরে পৌঁছানোর ফলে। এর সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার তুলনীয় নয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অনগ্রসরতা ও শিল্পের উন্নতির মন্থরতার ফলেই সেবাক্ষেত্রের এরূপ প্রসার ঘটেছে। এটি ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের ভারসাম্যহীনতাকেই প্রকাশ করে।

2.11 সারাংশ (Summary)

১. ভারতীয় অর্থনীতির মৌল বৈশিষ্ট্যসমূহ : স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বা মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি হল : কম মাথাপিছু আয়, কৃষির প্রাধান্য, বিপুল আয়তনের জনসংখ্যা, ব্যাপক দারিদ্র্য, তীব্র বেকার সমস্যা, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য, দ্বৈত্য অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, মানবিক মূলধনের নিম্নমান প্রভৃতি।

২. জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন : কোনো দেশের জাতীয় আয়ে সেই দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং সেবা ক্ষেত্রের অবদানই হল সেই দেশের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন। একে কোনো দেশের উৎপন্ন কাঠামোও বলা হয়। আর কোনো দেশের কর্মরত জনসংখ্যার কত অংশ কোন্ ক্ষেত্রে নিযুক্ত, তাকে বলা হয় ঐ দেশের জীবিকা কাঠামো। উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোকে একসাথে বলা হল কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো।

৩. ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন : 2016-17 সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয়ের 15.1 শতাংশ আসে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে, 26.9 শতাংশ আসে মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে এবং 53.8 শতাংশ আসে সেবাক্ষেত্রে থেকে।

৪. ভারতে জীবিকা কাঠামো : পরিকল্পনা কালে ভারতের জীবিকা কাঠামোয় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। পরিকল্পনার শুরুতে অর্থাৎ 1951 সালে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত ছিল 72 শতাংশ, মাধ্যমিক ক্ষেত্রে ছিল 11 শতাংশ এবং সেবামূলক ক্ষেত্রে এই অনুপাত ছিল 17 শতাংশ। 2020 সালে এই অনুপাতগুলি যথাক্রমে 42 শতাংশ, 26 শতাংশ এবং 32 শতাংশ।

৫. ভারতে সেবাক্ষেত্র চালিত উন্নয়ন : সংস্কার পরবর্তীকালে (1991 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অনেকে তাই ভারতের সাম্প্রতিক উন্নয়নকে সেবাক্ষেত্রচালিত উন্নয়ন বলে অভিহিত করেছেন।

৬. ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অংশবৃদ্ধির কারণ : ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অংশ বৃদ্ধি পিছনে প্রধান কারণগুলি হ'ল ঃ সেবা ও বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যাপক নগরায়ণ, পর্যটন শিল্পের প্রসার, কৃষির ব্যর্থতা, শিল্পে মন্দা প্রভৃতি।

৭. ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার কি উন্নয়নের নির্দেশক? : ভারতের সেবাক্ষেত্রের প্রসার উন্নয়নের নির্দেশক নয়, বরং এটি ভারতের দারিদ্র্য ও অনুন্নতির ফল। কৃষির ব্যথা ও শিল্পের মন্দার ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা

সেবাক্ষেত্রের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কোনো একটা কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে। এতে তাদের দারিদ্র্য কমেনি, কিংবা দেশটিও কোনো উন্নতি ঘটেনি। উন্নত দেশে জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধি দেশটির উন্নয়নের উচ্চতর স্তর নির্দেশ করে। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত জনবহুল দেশে সেবাক্ষেত্রের প্রসার দারিদ্র্য ও বেকারির ফল। এধরনের দেশে জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধি উচ্চতর উন্নয়নের স্তর নির্দেশ করে না।

2.12 অনুশীলনী (Exercises)

■ সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer-Type Questions)

১. স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশ কাকে বলে?
২. স্বল্পোন্নত অর্থনীতির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো
৩. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাকে বলে?
৪. ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য বলতে কী বোঝ?
৫. দ্বৈত অর্থব্যবস্থা কাকে বলে?
৬. ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
৭. ভারতের অনুন্নতির দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ কর।
৮. কোনো দেশের অর্থনীতিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় ও কী কী?
৯. প্রাথমিক ক্ষেত্র কাকে বলে?
১০. মাধ্যমিক ক্ষেত্রের সঙ্গে কোন্ কোন্ কাজকর্ম যুক্ত?
১১. সেবা ক্ষেত্র বলতে কী বোঝ?
১২. জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন বলতে কী বোঝায়?
১৩. কোনো দেশের জীবিকা কাঠামো বলতে কী বোঝ?
১৪. ভারতে সেবাক্ষেত্র চালিত উন্নয়ন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?
১৫. ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধির প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।

■ মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium Answer-type Questions)

১. ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বটি কী?
২. ভারতে জাতীয় আয়ের কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোর মধ্যে কীরূপ সংযোগ লক্ষ করা গেছে?
৩. কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে কী বোঝ?
৪. ভারতে জীবিকা কাঠামোর কীরূপ পরিবর্তন ঘটেছে?
৫. ভারতে কাঠামোগত পরিবর্তনের তাৎপর্য বর্ণনা কর।
৬. ভারতে সেবাক্ষেত্র চালিত উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?
৭. ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধির দুটি কারণ বর্ণনা কর।

৮. জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন বলতে কী বোঝ?

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long Answer-type Questions)**

১. ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করো।

২. পরিকল্পনাকালে ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন বর্ণনা কর।

৩. স্বাধীনতার পর ভারতের জীবিকা কাঠামো আলোচনা কর।

৪. ভারতে কাঠামোগত পরিবর্তনের তাৎপর্য বর্ণনা করো।

৫. ভারতে জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের সাম্প্রতিক অংশ বৃদ্ধির কারণগুলি উল্লেখ কর।

৬. ভারতে সেবাক্ষেত্রের প্রসার কি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও?

2.13 গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখসেলিম (2022) : ভারতীয় অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. (2019) : ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. সেখ সেলিম (2011) : ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

৪. Sarkhel, Jaydeb & Seikh Salim (2010) : Economic Principles and Indian Economic Problems, Book Syndicate Private Limited, Kolkata.

৫. Datt, Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : Indian Economy, S. Chand and Company Limited, New Delhi.

৬. Puri, V. K. & S. K. Mishra (2020) : Indian Economy, Himalaya Publishing House, Mumbai.

একক-3 ❑ ক্ষেত্রগত গতিপ্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ – I

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 প্রস্তাবনা

3.3 ভারতের কৃষিক্ষেত্র

3.4 ভারতীয় কৃষির সমস্যা বা বৈশিষ্ট্য

3.5 ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার সমস্যা

- **3.5.1** স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণ
- **3.5.2** কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলাফল
- **3.5.3** কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি
- **3.5.4** গৃহীত ব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

3.6 ভারতে সবুজ বিপ্লব

- **3.6.1** সবুজ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- **3.6.2** সবুজ বিপ্লবের ফলাফল

3.7 ভূমি সংস্কার ঃ সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

- **3.7.1** ভারতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি
- **3.7.2** ভূমি সংস্কার কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়ন

3.8 ভারতে গ্রামীণ ঋণ

- **3.8.1** ভারতে গ্রামীণ ঋণের সমস্যাবলি
- **3.8.2** গ্রামীণ ঋণের সমস্যা দূর করতে সরকারি ব্যবস্থাসমূহ
- **3.8.3** সরকার গৃহীত ব্যবস্থাদির মূল্যায়ন

3.9 কৃষিপণ্যের বিপণন

- **3.9.1** ভারতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা
- **3.9.2** ভারতে কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার ত্রুটি
- **3.9.3** কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারি ব্যবস্থা
- **3.9.4** কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থার মূল্যায়ণ

3.10 সারাংশ

3.11 অনুশীলনী

3.12 গ্রন্থপঞ্জি

3.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে—

- ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব কতখানি
- ভারতীয় কৃষির বর্তমান সমস্যাবলি
- ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার সমস্যা ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার
- ভারতে সবুজ বিপ্লব ও তার ফলাফল
- ভারতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির মল্যায়ন
- ভারতে গ্রামীণ ঋণের সমস্যা ও তার সম্ভাব্য প্রতিবিধান
- ভারতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো

3.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় যে, কৃষিই হল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কৃষির উন্নতি ছাড়া ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষি প্রধান অর্থনৈতিক কাজকর্ম হলেও ভারতের কৃষিতে নানা সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল স্বল্প উৎপাদনশীলতার সমস্যা। এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে। কৃষির উৎপাদনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 1960-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে নতুন কৃষি কৌশল প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। ফলে ভারতে কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয় বলে অনেকে মনে করেন। এই সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি কতদূর সফল হয়েছে তাও আমরা বর্তমান এককে বিশ্লেষণ করব। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য চাই উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। এই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ভূমি সংস্কার। ভারতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়েও আমরা বর্তমান এককে বিচার করব। ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হল কৃষি ঋণের বা গ্রামীণ ঋণের সমস্যা। এই গ্রামীণ-ঋণের সমস্যা ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার নিয়েও বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে। সবশেষে, ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণন ব্যবস্থা কেমন, সে সম্পর্কেও বিচার-বিবেচনা করা হবে। কৃষির উন্নতির জন্য চাই কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা। এই বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সেই ব্যবস্থাগুলি কতদূর সফল হয়েছে তা বর্তমান এককে পর্যালোচনা করা হবে।

3.3 ভারতের কৃষিক্ষেত্র (Agricultural Sector of India)

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কোনো অর্থনীতিতে কোনো ক্ষেত্রের গুরুত্ব বিচার করার দুটি প্রধান মাপকাঠি বা মানদণ্ড আছে। **প্রথম,** দেশের জাতীয় আয়ে ঐ ক্ষেত্রটির অবদান এবং **দ্বিতীয়,** দেশের জনসংখ্যার কত শতাংশ ঐ ক্ষেত্রে নিযুক্ত। উভয় মাপকাঠির বিচারেই ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

প্রথমত, 1950-51 সালে ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় 57 শতাংশ কৃষি থেকে আসত। তারপর অবশ্য এই অবদান ক্রমাগত কমতে থাকে। 2000-01 সালে এই অবদান দাঁড়ায় 24.7। 2007-08 এই অবদান আরো কমে হয় 17.8 শতাংশ (সব তথ্যগুলিই 1999-2000 সালের দামস্তরে) (সারণি 3.1)। 2004-05 সালের দামস্তরে 2013-14 সালে এই অবদান আরো কমে দাঁড়ায় 13.9 শতাংশ। 2020-21 সালে কৃষিসহ প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল জাতীয় আয়ের 16.4 শতাংশ (2011-12 সালের দামস্তরে)। দেখা যাচ্ছে, কৃষিক্ষেত্র থেকে এখন ভারতের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ আসে। তবে কৃষির এই অবদান ক্রমাগত কমছে। তবে উন্নত দেশগুলির তুলনায় এই অবদান এখনও যথেষ্ট বেশি। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান 1 থেকে 4 শতাংশের মতো (সারণি 3.2)। সেই হিসাবে দেখতে গেলে ভারতের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের গুরুত্ব অনেক দেশের তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

সারণি 3.1

ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষিক্ষেত্রের অংশ (শতকরা)

বছর	জাতীয় আয়ে কৃষির অংশ
1999–2000 সালের দামস্তরে	
1950–51	56.5
1990–91	34.0
2000–01	24.7
2007–08	17.8
2004–05 সালের দামস্তরে	
2008–09	15.7
2010–11	14.5
2013–14	13.9

টীকা : কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে কৃষিকার্য, বন এবং মৎস্যচাষ

সূত্র : (i) Economic Survey, 2007-08
(ii) National Accounts Statistics, 2015

দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থানের দিক থেকেও ভারতে এককভাবে কৃষির অবদান সর্বাধিক। 1951 সালে ভারতের মোট কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় 70 শতাংশ লোক কৃষিতে নিযুক্ত ছিল। 1991 সালে তা সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় 68 শতাংশ। 2011 সালের আদমশুমারি রিপোর্টে কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই।

সারণি 3.2

জাতীয় আয়ের (ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে মার্কিন ডলারে)

ক্ষেত্রগত বণ্টন, 2017 (শতকরা হিসাবে)

দেশ	প্রাথমিক ক্ষেত্র	মাধ্যমিক ক্ষেত্র	সেবাক্ষেত্র
সুইজারল্যান্ড	0.7	25.6	73.7
USA	0.9	19.1	80.0
ফ্রান্স	1.7	19.5	78.8
স্পেন	2.6	23.2	74.2
অস্ট্রেলিয়া	3.6	25.3	71.1
বিশ্ব	6.4	30.0	63.6
থাইল্যান্ড	8.2	36.2	55.6
মালয়েশিয়া	8.8	37.6	53.6
বাংলাদেশ	14.2	29.3	56.5
ভারত	15.4	23.0	61.6
পাকিস্তান	24.4	19.1	56.5

সূত্র : CIA World Factbook

তবে ঐ সালের Agriculture Census অনুযায়ী ভারতে গ্রামীণ পরিবারের 61.1 শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী 2019 সালে ভারতে মোট কর্মরত জনসংখ্যার 43 শতাংশ ছিল কৃষিতে নিযুক্ত (সারণি 3.3)। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে এই অংশ 5 শতাংশেরও কম। সাধারণত, অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলে কৃষিক্ষত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অনুপাত কমতে থাকে। কিন্তু ভারতের জীবিকা কাঠামোয় এ ধরনের পরিবর্তন এখনও লক্ষ করা যাচ্ছে না (সারণি 3.4)।

তৃতীয়ত, ভারতের শিল্পক্ষেত্রটি বিশেষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বস্ত্রশিল্পের জন্য তুলো, চিনি শিল্পের জন্য আখ, চট শিল্পের জন্য কাঁচাপাট প্রভৃতি কৃষির সরবরাহ করে থাকে। আবার শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বাড়াতে গেলেও কৃষির উন্নতি প্রয়োজন। কৃষির উন্নতি ঘটলে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়বে। ফলে শিল্পের বিকাশ ঘটবে। ভারতে শিল্পের উন্নতির জন্যও তাই কৃষির উন্নতি প্রয়োজন।

চতুর্থত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ভারতের কৃষির অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যগুলি হল চা, চিনি, তৈলবীজ, তামাক প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য। 1950-51 সালে ভারতে মোট রপ্তানিজাত আয়ের প্রায় 70 শতাংশই ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। অবশ্য 1990-এর দশক থেকে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়তে থাকে। ফলে মোট রপ্তানিতে কৃষির অংশ কমতে থাকে (সারণি 3.5)। 1996-97 সালে এই অংশ ছিল 20.3 শতাংশ। 2009-10 সালে তা আরো নেমে দাঁড়ায় 10.6

সারণি 3.3
নির্বাচিত কিছু দেশে কৃষিতে মোট কর্মরত জনসংখ্যার শতকরা অংশ (2019)

দেশ	কৃষিতে কর্মরত জনসংখ্যা (%)
USA	1
নরওয়ে	2
জাপান	3
অস্ট্রিয়া	4
হাঙ্গেরি	5
ব্রাজিল	9
চিন	25
পাকিস্তান	37
বাংলাদেশ	38
ভারত	43
মায়ানমার	49
ভুটান	56

সূত্র : World Bank

সারণি 3.4
ভারতে কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যা (দশ লক্ষে)

কর্মরত ব্যক্তিদের শ্রেণিবিভাগ	1951	2011
A. কৃষক	70 (50)	118.7 (24.6)
B. কৃষি শ্রমিক	28 (20)	144.3 (30.0)
C. কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যা (A+B)	98 (70)	263.0 (54.6)
D. অ-কৃষি শ্রমিক	42 (30)	218.7 (45.4)
E. মোট কর্মরত জনসংখ্যা (C+D)	140 (100)	481.7 (100)
F. মোট জনসংখ্যা	361	1,210

টীকা : বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি মোট কর্মরত জনসংখ্যার (দফা–E) শতকরা অংশ প্রকাশ করছে।

সূত্র : Agricultural Statistics at a Glance, 2012 থেকে নির্ণীত।

শতাংশ। সম্প্রতি অবশ্য এই অনুপাত সামান্য বেড়েছে। 2018-19 সালে এই অনুপাত ছিল 11.8 শতাংশ।

পঞ্চমত, ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও কৃষির অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজাত পণ্য পরিবহন করেই ভারতের রেল ও সড়ক বিভাগ সর্বাধিক আয় করে থাকে। আবার, ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারও অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে, যে বছর কৃষির ফলন বেশি, সেই বছর জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারও সন্তোষজনক। সরকারের আর্থিক আয়ও অনেকখানি কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন ভালো হলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। শিল্পের

সারণি 3.5
ভারতের মোট রপ্তানিতে কৃষির অংশ (শতকরা)

বছর	শতকরা অংশ
1996–97	20.3
2005–06	10.6
2011–12	12.8
2013–14	14.2
2015–16	12.5
2018–19	11.8

সূত্র : Economic Survey, 2020-21

বিকাশের হার বাড়ে। ফলে সরকারের বিভিন্ন খাতে কর-সংগ্রহ বাড়ে। বিশেষত রাজ্য সরকারগুলির রাজস্ব সংগ্রহ অনেকাংশে কৃষির উন্নতির উপর নির্ভরশীল।

3.4 ভারতীয় কৃষির সমস্যা বা বৈশিষ্ট্য (Problems or Features of Indian Agriculture)

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতীয় কৃষিতে নানা সমস্যা রয়েছে। একথা ঠিক যে, ভারতীয় অর্থনীতির ওঠা-নামা কৃষির ওঠানামার সঙ্গে অনেকখানি জড়িত। ভারতের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে এবং কর্মরত জনসংখ্যারও একটা বড় অংশ কৃষিতে নিযুক্ত। তবুও ভারতের কৃষি নানা সমস্যায় দীর্ণ। ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই তা পরিস্ফুট হবে।

প্রথমত, ভারতের কৃষি পদ্ধতি প্রাচীন আমলের। প্রাচীন যুগের সেই লাঙল ও বলদ দিয়ে এখনও অনেক অঞ্চলে কৃষিকার্য চলে। বৈজ্ঞানিক ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় না। ভারতের কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, আধুনিক জলসেচ প্রভৃতির প্রয়োগ যথেষ্ট কম। সবুজ বিপ্লবের পর কিছু কিছু অঞ্চলে এসবের ব্যবহার বাড়লেও সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে ভারতের কৃষি পদ্ধতি সনাতন ধরনের।

দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষিকার্য অতিমাত্রায় প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল মাত্র 48 শতাংশ জমিকে জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় 52 শতাংশ জলসেচের জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এর ফলে কৃষি উৎপাদন অস্থিতিশীল। ভালো আবহাওয়ার বছরে কৃষি উৎপাদন বেশি হয় এবং খারাপ আবহাওয়ার বছরে কৃষি উৎপাদন খুব কমে যায়। এজন্য বলা হয়, Indian agriculture is a gamble in monsoons.

তৃতীয়ত, ভারতে অধিকাংশ কৃষকই কৃষিকে জীবনধারণের উপায় হিসাবে দেখে। এটিকে লাভজনক বৃত্তি বা পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। কৃষকেরা মূলত নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য কৃষিকার্য করে থাকে। উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করার তাগিদ এখানে কম। ফলে ফসলের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম হয়। বর্তমানে অবশ্য এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষকেরা এখন শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদন না করে বাণিজ্যিক শস্যও উৎপাদন করছে।

চতুর্থত, ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম। যেমন, ধানের ক্ষেত্রে 2016 সালে ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 3,790 কেজি। ঐ বছর চিনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় 6900 কেজি। গম, ডাল, জোয়ার বা ভুট্টা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ভারতের উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট কম। এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারতের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদনশীলতা বিশ্বের গড় উৎপাদনের তুলনায় কম। শুধুমাত্র আখের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদনশীলতা বিশ্বের গড় উৎপাদনশীলতার কাছাকাছি। আমরা এ সম্পর্কে পরের বিভাগে (বিভাগ ৩.৫) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

পঞ্চমত, ভারতে কৃষিতে জোতের গড় আয়তন খুবই ছোটো। তাছাড়া, জমিগুলি শুধু ছোটোই নয়, সেগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। ফলে বৃহদায়তনে চাষবাস করা সম্ভব হয় না। 1991 সালে ইংলন্ডে কৃষি খামারের গড় আয়তন ছিল 40 হেক্টর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 120 হেক্টর, সেখানে ভারতে কৃষি খামারের গড় আয়তন ছিল 1.57

হেক্টরের মতো (1 হেক্টর = 2.471 একর = 10,000 বর্গমিটার)। ভারতে কৃষি জোতের গড় আয়তন ক্রমশ কমছে। 2010-11 সালে ভারতে কৃষিজোতের গড় আয়তন ছিল 1.16 হেক্টর। 2015-16 সালে তা কমে দাঁড়ায় 1.08 হেক্টর।

ষষ্ঠত, ভারতের কৃষিতে বিপুল সংখ্যক প্রচ্ছন্ন বেকার দেখা যায়। কৃষিকার্যে চালানোর জন্য যত লোক প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি লোক কৃষিতে নিযুক্ত রয়েছে। এদের কৃষি থেকে সরিয়ে নিলেও কৃষির মোট উৎপাদন কমবে না। এ ধরনের কৃষি শ্রমিকদের প্রচ্ছন্ন বেকার বলা হয়। এই প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের (disguised unemployment) মূল কারণ হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব।

সপ্তমত, প্রচ্ছন্ন বোকারের পাশাপাশি ভারতের কৃষিতে রয়েছে মরশুমি বেকার। ভারতের কৃষি প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। তাই সারাবছর চাষের কাজ হয়না। তাই বছরে প্রায় চার-পাঁচ মাস চাষিকে বেকার থাকতে হয়। এই মরশুমি বেকারত্বের (seasonal unemployment) প্রধান কারণ হল কৃষিকার্যে বৈচিত্র্যের অভাব (lack of diversification)।

অষ্টমত, ভারতের কৃষিতে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন করা হয় বটে, তবে উৎপন্ন ফসলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই হল খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্যে নিযুক্ত জমির পরিমাণও মোট জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। এখানে, বাণিজ্যিক ফসলের চাষ-আবাদ তুলনায় কম। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য, নানা ধরনের ডাল, তৈলবীজ ও বাগিচা শস্য। এই সকল শস্য দেশের সর্বত্র সমভাবে উৎপন্ন হয় না। আবার, উৎপাদন পদ্ধতিতেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈচিত্র্য বা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

নবমত, ভারতীয় কৃষির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জমর মালিকানা বণ্টনে অসাম্য। গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে ভূমিহীন পরিবার অথবা অতি স্বল্প জমির মালিকানা-বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যাই বেশি। অল্প সংখ্যক পরিবারের হাতেই জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত। এককথায়, ভারতে জমির মালিকানা বণ্টনে তীব্র অসাম্য রয়েছে।

দশমত, ভারতের কৃষিতে জমির মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্কেও বৈচিত্র্য রয়েছে। জমির মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে এই সম্পর্ককে বলা হয় কৃষির উৎপাদন সম্পর্ক। ভারতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির মালিক নিজেই জমির চাষ করে। আবার কোথাও জমির মালিক নিজে চাষ না করে জমিটি অপরকে চাষ করতে দেয়। একে ভাগচাষ প্রথা (share cropping) বলে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিক নিজে কোনো কৃষিকাজ না করে ক্ষেত মজুরদের দিয়ে চাষ করায়। ক্ষেতমজুরদের আবার বিভিন্ন শ্রেণি আছে এবং তাদের মজুরি প্রদানের ব্যবস্থার মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভারতে জমির মালিক ও প্রকৃত চাষির মধ্যে অনেক সময়ই নানা ধরনের মধস্বত্বভোগী কাজ করে। কৃষিতে এধরনের উৎপাদন সম্পর্ক কৃষির উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক নয়।

ভারতীয় কৃষির এই বৈশিষ্ট্যগুলিই এর সমস্যা নির্দেশ করে। সমস্যাগুলি হল, সেকেলে উৎপাদন পদ্ধতি, জলসেচের অভাব, কৃষিজোতগুলি ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত, কৃষিতে ব্যাপক প্রচ্ছন্নও মরশুমি বেকারি, জীবনধারণের স্তরে কৃষিকার্য পরিচালনা, জমির মালিকানা বণ্টনে অসাম্য, বাণিজ্যিক শস্যের প্রসার না ঘটা এবং সর্বোপরি স্বল্প উৎপাদনশীলতা। ভারতীয় কৃষির এই স্বল্প উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা পরের বিভাগে আলোচনা করব। ভারতীয় কৃষির উন্নতি ঘটাতে গেলে উপরোক্ত সমস্যাগুলি দূর করতে হবে।

3.5 ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার সমস্যা (Problem of Low Productivity in Indian Agriculture)

আমরা জানি, কৃষি হল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এখানে জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে। দেশের কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক কৃষিতে নিযুক্ত। দেশের প্রধান কয়েকটি শিল্প যেমন, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, পাটশিল্প, চা শিল্প প্রভৃতি কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। আবার গ্রামীর বা কৃষিক্ষেত্রই হল শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার। কৃষির উৎপাদন বাড়লে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে; শিল্পক্ষেত্র প্রসারিত হয়। দেশে খাদ্যের জোগান দেয় কৃষি। আবার, কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ভারত কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও উপার্জন করে। কিন্তু এতসব গুরুত্ব সত্ত্বেও ভারতে কৃষিক্ষেত্রটি মোটেই উন্নত নয় এবং এর উৎপাদন ব্যবস্থা আদৌ দক্ষ নয়। ভারতীয় কৃষিতে নানা সমস্যা বিদ্যমান। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল স্বল্প উৎপাদনশীলতার সমস্যা। ভারতীয় কৃষিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা খুবই কম। আবার শ্রমিক পিছু উৎপাদনশীলতাও কম। বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে ভারত এ ব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে। এমনকি, প্রধান খাদ্যশস্য, যেমন, ধান, গম, জোয়ার/ভুট্টা এবং ডালশস্যের ক্ষেত্রে ভারতের কৃষির উৎপাদনশীলতা বিশ্বের গড় উৎপাদনশীলতার চেয়েও কম। কেবলমাত্র আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের হেক্টর প্রতি উৎপাদন বিশ্বের গড় উৎপাদনের সমতুল। আমরা 3.6 নং সারণিতে নির্বাচিত কিছু দেশের 2016 সালের কৃষি উৎপাদনশীলতা দেখিয়েছি।

সারণি 3.6

নির্বাচিত কিছু দেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা, 2016

(হেক্টর প্রতি কিলোগ্রামে)

সারণি 3.6(a) ধানের ক্ষেত্রে

দেশ	উৎপাদনশীলতা
চিন	6,866
ব্রাজিল	5,464
বিশ্বের গড়	**4,577**
মায়ানমার	3,818
ভারত	3,790

সারণি 3.6(b) গমের ক্ষেত্রে

দেশ	উৎপাদনশীলতা
জার্মানি	7,641
চিন	5,396
কানাডা	3,470
বিশ্বের গড়	**3,401**
ভারত	3,034

সারণি 3.6(c) : জোয়ার/ভুট্টার ক্ষেত্রে

দেশ	উৎপাদনশীলতা
USA	10,960
আর্জেন্টিনা	7,443
চিন	5,967
বিশ্বের গড়	**5,632**
ভারত	2,616

সারণি 3.6(d) : ডালশস্যের ক্ষেত্রে

দেশ	উৎপাদনশীলতা
USA	2,034
চিন	1,732
ব্রাজিল	1,008
বিশ্বের গড়	**958**
ভারত	588

সারণি 3.6(e) : আখের ক্ষেত্রে

দেশ	উৎপাদনশীলতা
কলম্বিয়া	86,399
ব্রাজিল	75,180
চিন	73,620
ভারত	**70,394**
বিশ্বের গড়	70,134

টীকা : 1 হেক্টর = 2.471 একর
= 10,000 বর্গমিটার

সূত্র : Agricultural Statistics at a Glance, 2018, Government of India

উপরের সারণিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে ধানের উৎপাদনশীলতা চিনের উৎপাদনশীলতার 40 শতাংশের মতো। গমের ক্ষেত্রেও ভারতের উৎপাদনশীলতা জার্মানির উৎপাদনশীলতার 40 শতাংশ। জোয়ার / ভুট্টার ক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদনশীলতা আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতার মাত্র 24 শতাংশ অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশেরও কম। ডালশস্যের ক্ষেত্রে চিত্রটি প্রায় একই রকম। ভারতের উৎপাদনশীলতা আমেরিকার উৎপাদনশীলতার 29 শতাংশের মতো। আর এই চারটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ভারতের কৃষির উৎপাদনশীলতা বিশ্বের গড় উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা কম। শুধু মাত্র আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের গড় উৎপাদনশীলতা বিশ্বের গড় উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা সামান্য বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারতের আগে রয়েছে কলম্বিয়া, ব্রাজিল, চিন প্রভৃতি দেশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদনশীলতা বিশ্বের অনেক দেশের উৎপাদানশীলতার তুলনায় যথেষ্ট কম।

3.5.1 স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণ (Causes of Low Productivity)

ভারতীয় কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার পিছনে অনেক কারণ কাজ করছে। এই কারণগুলিকে আমরা প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। সেগুলি হ'ল ঃ

(ক) সাধারণ কারণসমূহ

(খ) প্রতিষ্ঠানগত কারণসমূহ, এবং

(গ) প্রযুক্তিগত কারণসমূহ।

আমরা এই কারণগুলি একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

(ক) সাধারণ কারণসমূহ (General Causes)

ভারতীয় কৃষিতে কম উৎপাদনশীলতার পিছনে সাধারণ কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং অ-কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ না বাড়ায় কৃষি খুবই জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে জোতগুলির ক্রমাগত ছোটো হয়ে পড়ছে। এর ফলে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষকেরা অনেকেই নিরক্ষর এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। তারা নতুন উৎপাদন কৌশল গ্রহণে আগ্রহী নয়। তাছাড়া, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহালও নয়। এটিও ভারতের কৃষিতে স্বল্প উৎপাদন-শীলতার অন্যতম প্রধান কারণ।

তৃতীয়ত, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গেলে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ সরবরাহ করা দরকার। তাছাড়া কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা, ফসল সঞ্চয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে কৃষকদের জন্য এসমস্ত পরিসেবার অভাব রয়েছে। এর ফলেও কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ে না।

(খ) প্রতিষ্ঠানগত কারণসমূহ (Institutional Causes)

ভারতীয় কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার পিছনে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কারণও দায়ী। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, ভারতে কৃষিজোতের আয়তন খুব ছোট। 2015-16 সালে ভারতে কৃষিজোতের গড় আয়তন ছিল 1 হেক্টরের মতো। এর ফলে যান্ত্রিক প্রথায় নিবিড় চাষ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, একই জোতের অধীনে ভূমিখণ্ডগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ফলে এক জমি থেকে অন্য জমিতে যেতে শ্রম ও সময় নষ্ট হয়। আবার, জোতগুলি বিক্ষিপ্ত হবার ফলে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, ভারতে প্রায়শই জমির মালিক নিজে চাষ করে না। তারা প্রজাদের চাষের জন্য জমি বিলি করে। এই প্রজাদের চাষ করার অধিকরের কোনো স্থায়িত্ব নেই। ফলে প্রজারা জমির স্থায়ী উন্নতি ঘটাতে আগ্রহী নয়। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কম হয়।

(গ) প্রযুক্তিগত কারণসমূহ (Technological Causes)

ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার পিছনে প্রযুক্তিগত কিছু বাধাও দায়ী। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, ভারতে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি সেকেলে ধরনের। এখানে বহু জায়গায় বলদ ও লাঙলের সাহায্যে চাষ করা হচ্ছে। পশ্চিমী দেশগুলির এবং জাপানের ন্যায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। এর ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা কম রয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, সবুজ বিপ্লবের পর ভারতের কিছু অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, ক্ষুদ্র জলসেচ প্রভৃতির ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য যে পরিমাণ এবং অন্যান্য উপকরণে অর্থের প্রয়োজন তা অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির নেই। ফলে নতুন প্রযুক্তি ভারতে তেমন বিস্তার লাভ করতে পারে নি। এর ফলেও কৃষি উৎপাদনশীলতা বিশেষ বাড়েনি।

তৃতীয়ত, ভারতীয় কৃষির অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জলসেচের সমস্যা। এখানে জলসেচের সুযোগ প্রসার লাভ করেনি। ফলে কৃষিকার্য মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। কোনো বছর অতিবৃষ্টি এবং কোনো বছর খরা বা অনাবৃষ্টির ফলে কৃষি উৎপাদন মার খায়। ভারতের মোট কৃষিযোগ্য জমির অর্ধেকেরও বেশি অংশে জলসেচের কোনো সুযোগ নেই। এর ফলেও ভারতের কৃষিতে উৎপাদনশীলতা কম।

3.5.2 কৃষিতে স্বল্প উপাদনশীলতার ফলাফল (Effects of Low Productivity in Agriculture)

ভারতের কৃষিত স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলে অর্থনীতিতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষির কম উৎপাদনশীলতার বিরূপ ফলাফলগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলে দেশে নানা সময়ে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য বিদেশ থেকে অনেক সময়ে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। এর ফলে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলে কৃষকের আয় কম থেকে গেছে। কৃষকের আয় না বাড়ার ফলে শিল্প জাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়েনি। ফলে শিল্পের অগ্রগতির হারও মন্থর থেকে গেছে।

তৃতীয়ত, কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলে অনেক সময় শিল্পক্ষেত্র প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্যের জোগান পায়নি। এটি শিল্পের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

চতুর্থত, কৃষির উৎপাদনশীলতা কম বলে কৃষকের আয় কম। আর আয় কম বলে তারা খাজনা, কর, ঋণের কিস্তি ও সুদ মেটাতে পুনরায় ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। এভাবে গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততার সমস্যা বাড়ছে।

পঞ্চমত, স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি অনেক সময়ই তার সংসারের ভরণপোষণ করতে পারছেনা। তারা গ্রামীণ মহাজন ও জোতদারের কাছে জমিতে ফসল থাকা অবস্থাতেই (standing crop) বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এতে চাষি তার ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলে এভাবে কৃষকেরা নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ও শোষিত হচ্ছে।

3.5.3 কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি (Measures to Raise Agricultural Productivity)

ভারতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের তরফ থেকে নানা ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার যুগের (1950-51 থেকে 2016-17) বছরগুলিতে কৃষির উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সেই ব্যবস্থাগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত, ভারতীয় কৃষির একটা বড় সমস্যা হল কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি। এই চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে কৃষির বাইরে বিকল্প কর্মসংস্থানের চেষটা করা হয়েছে। যেমন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অগ্রগতির উপর

জোর দেওয়া হয়েছে। এই শিল্পগুলি খুবই শ্রমনিবিড়।

দ্বিতীয়ত, নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন, ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষির উন্নতির পথে বাধাগুলি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জমিদার শ্রেণির অবলোপ, প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা ও খাজনা নিয়ন্ত্রণ, জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা, উদ্বৃত্ত জমিতে সমবায় চাষ প্রচলনের উদ্যোগ নেওয়া প্রভৃতি।

তৃতীয়ত, কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গেলে জলসেচের প্রসার দরকার। এতে একদিকে যেমন আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা দূর হবে, অন্যদিকে তেমনি সারাবছর কৃষিকাজ চালানো যাবে। ভারতে বিভিন্ন পরিকল্পনায় বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এগুলি হল বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্প। পাশাপাশি, ক্ষুত্র সেচ প্রকল্পের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে ছোটো সেচ প্রকল্পগুলিতে বিদ্যুতের জোগান দেওয়া হচ্ছে। জলসেচের সুযোগ আরো বাড়াতে পারলে ভারতীয় কৃষি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। তখন সারাবছর কৃষিকাজ চলবে। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

চতুর্থত, গ্রামীণ ঋণদানের ক্ষেত্রে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমবায় ঋণদান সমিতির কাজকর্মের প্রসার ঘটানো হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের শাখা বিস্তার করা হচ্ছে। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক এবং কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক (National Bank for Agriculture and Rural Development বা NABARD) গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্র চাষিদের মধ্যে ঋণ প্রদানের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জনধন যোজনা ও গ্রামীণঋণ সরবরাহে সহায়তা করছে।

পঞ্চমত, কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা, সমবায় কৃষি বিপণন সমিতি প্রতিষ্ঠা, কৃষিদ্রব্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা, হিমঘরের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এছাড়া কৃষিজাত দ্রব্যের মান নির্ধারণ করা, তাদের শ্রেণিবিন্যাস করা (grading) প্রধান প্রধান কৃষিদ্রব্যের দাম ঘোষণা, কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যয় ও দাম কমিশন (Commission for Agricultural Costs and Prices বা CACP) স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসবের ফলে চাষি তার ফসলের ন্যায্য দাম পাবে বলে আশা করা যায়।

ষষ্ঠত, কৃষকরা যাতে উন্নত প্রযুক্তি, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে আগ্রহী হয় তার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরে আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া, উন্নত বীজ, সার, ওষুধ প্রভৃতির জোগান বাড়ানোরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

3.5.4 গৃহীত ব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন (A Brief Evaluation of the Adopted Measures)

ভারতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ কমানোর চেষ্টা হচ্ছে, নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে, জলসেচ প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ঋণদানের ব্যবস্থা উন্নত করা হচ্ছে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হচ্ছে, কৃষকদের মধ্যে উন্নত বীজ, সার ও প্রযুক্তির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে প্রভৃতি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কৃষির উৎপাদনশীলতা বিশেষ বাড়েনি। আসলে ভারতের কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি। এই চাপ কমাতে না পারলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ার সম্ভাবনা কম। বিগত বছরগুলিতে ভারতে শিল্পের

বিকাশ কিছুটা হলেও নিয়োগ বাড়েনি (Jobless growth বা কর্মহীন প্রসার)। ফলে কৃষিক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমিককে শিল্পে সরানো যায়নি। আবার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু উদারীকরণের যুগে এই শিল্পগুলি বড় ও মাঝারি আয়তনের শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। ফলে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। অনেক শিল্প ইউনিট উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োগ বাড়েনি এবং কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ কমানো যায়নি। প্রধানত এই কারণে কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ও আয় বিশেষ বাড়ছে না। তাছাড়া, ভারতের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির অধিকাংশই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই নিম্ন। ফলে। তারা চিন্তাভাবনায় রক্ষণশীল এবং পরিবর্তন বিপুল। তারা চিরাচরিত কৃষিপদ্ধতিতেই আস্থাশীল। ফলে তাদের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণের জনপ্রিয়তা বাড়ানো যাচ্ছে না। প্রধানত এই দুটি সমস্যার (কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ এবং কৃষকদের রক্ষণশীলতা) সমাধান করতে না পারলে ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম।

3.6 ভারতে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution in India)

1960 -এর দশকের মধ্যভাগে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ এবং জলসেচ ব্যবহার করে ভারতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর এক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে কৃষি উপাদান বাড়ানোর এক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে কৃষি উৎপাদন, বিশেষত গমের উৎপাদন, উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার এই ঘটনাকে ভারতে সবুজ বিপ্লব বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই নতুন কার্যক্রমের স্তম্ভ মূলত তিনটি ঃ (i) উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, (ii) ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার প্রসার এবং (iii) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার। কৃষি বিজ্ঞানীর ডাঃ এম. এস. স্বামীনাথন এই সবুজ বিপ্লব কার্যক্রমের প্রধান উদ্যোক্তা। ডাঃ স্বামীনাথনকে তাই ভারতে **'সবুজ বিপ্লবের জনক'** বলা হয়।

3.6.1 সবুজ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Green Revolution)

1960-এর শতকের মাঝামঝি সময়ে ভারতে কৃষি উৎপাদন চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে সবুজ বিপ্লব বা কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি (New Strategy in Agriculture) বলে উল্লেখ করা হয়। এটিকে অনেকে উচ্চ ফলনশীলবীজ কর্মসূচি বা High Yiebling varieties (HYV Programme) বলেও উল্লেখ করে থাকেন। এই সবুজ বিপ্লব বা কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির কতকগুচলি বৈশিষ্ট্য আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

1. চিরাচরিত নিম্ন ফলনশীল বীজের পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের উন্নত বীজে ছোটো ছোটো গাছে ফলন খুব বেশি হয়।

2. ফলন বাড়ানোর জন্য জমির পুষ্টিসাধক বস্তুগুলিকে বাড়াতে হয়। তার জন্য জমিতে রাসায়নিক সার দিতে হয়। উচ্চ ফলনশীল বীজের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার বেশি করে ব্যবহার করতে হয়।

3.6.2 সবুজ বিপ্লবের ফলাফল (Effects of Green Revolution)

আমরা প্রধানত উৎপাদন, নিয়োগ আয় বন্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতের সবুজ বিপ্লবের প্রভাব বা ফলাফল আলোচনা করব।

কৃষি উৎপাদনের উপর সবুজ বিপ্লবের প্রভাব বা ফলাফল (Effect of Green Revolution on Agricultural Production)

সবুজ বিপ্লব বা নতুন কৃষি কৌশলের (New Agricultural Strategy) ফলে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। তবে কৃষি প্রযুক্তির সুফল গমের ক্ষেত্রে যতটা পাওয়া গেছে, ধানের ক্ষেত্রে ততটা সুফল পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, ডাল, তৈলবীজ, তুলো, পাট প্রভৃতি শস্যের ক্ষেত্রেও এর কৃতিত্ব অল্প। গমের উৎপাদন 1960-61 সালে ছিল 11 মিলিয় টন। 1990-91 সালে তা বেড়ে হয় 55 মিলিয়ন টন। 1999-2000 সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় 76 মিলিয়ন টন। দেখা যাচ্ছে, 40 বছরে গমের উৎপাদন প্রায় 7 গুণ বেড়েছে। ধানের উৎপাদন 1960-61 সালে ছিল 35 মিলিয়ন টন। 1990-91 সালে তা বেড়ে হয় 75 মিলিয়ন টন। আর 1999-2000 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 90 মিলিয়ন টন। ধানের ক্ষেত্রে ঐ 40 বছরে উৎপাদন প্রায় 2.6 গুণ বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, গমের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল অনেক কম। তাছাড়া, সবুজ বিপ্লবের সময়কালে ডালের উৎপাদন খুবই ওঠানামা করেছে। আবার, জনার, ভুট্টা এবং তৈলবীজের উৎপাদন ও বাড়েনি। এছাড়া, তুলো, পাট প্রভৃতি বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রেও 1960-74 এই সময়কালে উৎপাদন বৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 1973-77 সালের পর আখের উৎপাদন কিছুটা বেড়েছিল বটে, তবে তা কোনো বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নয়। Dharm Narain এই অবস্থানে **নগদ শস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় পঙ্গুত্ব** (Near paralysis in the output of cash crops) বলে বর্ণনা করেছেন। তাই অনেকে মনে করেন যে, অল্প কয়েকটি ফসলের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের ফলে যে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তাকে বিপ্লব বলে গণ্য করা যায়। তাঁরা মনে করেন যে, সমস্ত প্রধান ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়লে তবেই তাকে বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়। তবে নতুন প্রযুক্তির গ্রহণের ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। ভারত এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ম্ভর।

সুতরাং, কৃষি উৎপাদনের উপর সবুজ বিপ্লবের সামগ্রিক প্রভাব খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম হল গম, যাকে সবুজ বিপ্লবের কেন্দ্র বিন্দু বলা যেতে পারে। গমের উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল সত্যিই চমকপ্রদ। 1960-61 সালে ভারতে গমের উৎপাদনশীলতা ছিল হেক্টর প্রতি 851 কেজি। 2014-15 সালে তা বেড়ে হয় 2,872 কেজি। অর্থাৎ 54 বছরে গমের উৎপাদনশীলতা প্রায় 3.4 গুণ বৃদ্ধি পায়। কল্যাণ সোনা, সোনালিকা প্রভৃতি উচ্চফলনশীল গম বীজের অবদান এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবুজ বিপ্লবকে অনেকে তাই গম বিপ্লব (wheat revolution) বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় কৃষি ছিল অনড় ও স্থবির। সবুজ বিপ্লব কৃষিতে এই অনড়তা ও স্থবিরতা ভাঙতে পেরেছিল। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্যে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা প্রায় দূর হয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বেড়েছে। এই উদ্বৃত্ত দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া, বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়ার ফলে খাদ্যশস্যের দামে অনেকটা স্থিরতা এসেছে। খাদ্যের আপৎকালীন মজুত ভাণ্ডার (buffer stock) গড়তেও সবুজ বিপ্লব সাহায্য করেছে।

নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের উপর সবুজ বিপ্লবের প্রভাব (Effect of Green Revolution on Employment)

সবুজ বিপ্লবের ফলে শ্রমিকের নিয়োগ বেড়েছে কিনা, সে সম্পর্কে সমীক্ষকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

একপক্ষ মনে করেন যে, নতুন কৃষিকৌশলে নানারকম যন্ত্রপাতি, যেমন, হারভেস্টার, থ্রেসার, টিলার প্রভৃতির ব্যবহার বেড়েছে। এগুলি চরিত্রগতভাবে শ্রম-সঞ্চয়ী (labour saving)। সুতরাং, এগুলির ব্যবহারের ফলে শ্রমের চাহিদা কমেছে এবং তার ফলে শ্রমিক নিয়োগ কমেছে। অপরপক্ষ মনে করেন যে, কৃষিত নতুন কৌশল ব্যবহারের পলে একই জমিতে একাধিকবার চাষ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে শ্রমিকের চাহিদা বেছে। এখন সারাবছরই কৃষিকার্য চলে। কৃষি কাজকর্মের ঋতুগত চরিত্র অনেকটাই দূর হয়েছে। সারা বছরই কৃষিশ্রমিকের চাসহদা তৈরি হয়েছে। সুতরাং সবুজ বিপ্লব একদিকে যেমন শ্রমসঞ্চয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শ্রমের চাসহদা কমিয়েছে, অন্যতিদকে তেমনি সারা বছর কৃষিকার্যের সম্ভাবনা তৈরি করে কৃষিশ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়েছে। এই ধনাত্মক ওঋণাত্মক প্রভাবের ফলে কৃষিশ্রমিকের নিট নিয়োগ বা কর্মসংস্থান বেড়েছে কিনা তা বলা শক্ত। হনুমন্ত রাও মনে করেন যে, সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে ট্রাক্টর ব্যবহারের ফলে কৃষিতে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কমেছে। তাঁর ভাষায় ''the net employment of tractor use may turn out to be negative''. মার্টিন জে. মিলিংস এবং অর্জুন সিং-ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাক্টর, হারভেস্টার, থ্রেসার প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে বহু সংখ্যক শ্রমিকের কর্মহানি ঘটেছে।

আয় বন্টনের উপর সবুজ বিপ্লবের প্রভাব (Effect of Green Revolution on Distribution of Income)

সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত নতুন কৃষি-কৌশলে ঝুঁকি বেশি। HYV বীজের ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গের আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গের বড় ধরনের আক্রমণ হলে ছোটো চাতিষ সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারে। বড় চাষি কিন্তু এই ধরনের প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে পারে বা সমালে নিতে পারে। তাছাড়া, বড় চাষিরা নতুন কৃষিকৌশলের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। ছোটো চাষি তা পারে না। ফলে এই নতুন কৃষি কৌশলে ছোটো ও বড় চাষির মধ্যে আয় বৈষম্য বাড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আবার, এই নতুন প্রযুক্তির চাষে ব্যয় খুব বেশি। এই ব্যয় নির্বাহ করতে চাষিদের ঋণ নিতে হয়েছে। ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি বন্ধক রাখতে বড় চাষিই সমর্থ হয়েছে। তাদের ঋণের জন্য দরকষাকষির ক্ষমতাও বেশি। ফলে বড় চাষি অপেক্ষাকৃত সহজশর্তে ঋণ পেয়েছে। এ ধরনের সুবিধা ছোটো চাষি পায়নি। সুতরাং, এই কৃষি ঋণের বিষয়টিও বড় ও ছোটো চাষির মধ্যে আয় বৈষম্য বাড়িয়েছে। ছোটো চাষিদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার ছোটো চাষিদের কম সুদে ঋণ দিয়েছে, ভরতুকি দিয়ে রাসায়নিক সারের জোগান দিয়েছে। কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলি ছোটো-বড় সব ধরনের চাষিদের নানারকম পরামর্শ নিয়ে সাহায্য করেছে। ফলে ছোটেশ চাষিরাও সবুজ বিপ্লবের সুবিদা ভোগ করতে সমর্ত হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, ভরতুকি দেওয়া রাসায়িনক সার ও অন্যান্য উপরকণ এবং কম সুদে ঋণের সুবিধা ছোটো চাষির তুলনায় বড় চাষিই বেশি পেয়েছে। সুতরিাং, সবুজবিপ্লবের ফলে বড়ো ও ছোটো চাষির মধ্যে আয়বৈষম্য যে বেড়েছে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আবার, সবুজ বিপ্লব বা কৃষির নয়া কৌশল দেশের সব অঞ্চলে সমভাবে প্রসারিত হয়নি। ফলে সবুজ বিপ্লব ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। একটি সমীক্ষায় হনুমন্ত রাও দেখেছেন যে, কৃষির এই নতুন প্রযুক্ত বিভিন্ন অ্যচলের মধ্যে বড়ো ও ছোটো চাষির মধ্যে এবং একদিকে জোতদার ও অন্যদিকে ভূমিহীন শ্রমিক ও প্রজাকৃষকের মধ্যে আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। একথা ঠিক যে, পরম অঙ্গে (in absolute terms)। দেখতে গেলে নতুন কৃষিকৌশলের সুবিধা ছোটেশ, বড় সবশ্রেণির চাষিই পেয়েছে। তবে আপেক্ষিক ভাবে বা

তুলনামূলকভাবে (in relative terms) দেখতে গেলে এই সুবিধা ছোটো চাষির তুলনায় বড় চাষি বেশি পেয়েছে এবং কম উন্নত অঞ্চলের তুলনায় বেশি উন্নত অঞ্চল বেশি লাভবান হয়েছে। এককথায় সবুজ বিপ্লব বা কৃষির নয়া কৌশল শ্রেণিগত এবং অঞ্চলগত বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে।

উৎপাদন পদ্ধতির উপর সবুজ বিপ্লবের প্রভাব (Effect of Green Revolution on Production System)

ভারতে সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন সমীক্ষা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা হল রুদ্র, মাজিদ ও তালিবের সমীক্ষা। এই সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতে ধনতান্ত্রিক কৃষির উদ্ভব ঘটেছে। কৃষিতে এই নতুন কৌশল প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় কৃষি এখন লাভজনক বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে এক ধরনের ভদ্রলোক চাষির উদ্ভব ঘটেছে। এদের বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ট টাকা আছে। তারা সেই টাকা এখন কৃষিতে বিনিয়োগ করতে চাইছে। তারা যন্ত্রপ্রয়োগ করে এবং উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহার করে কৃষি শ্রমিকদের দিয়ে চাষ করাচ্ছে। তাদের এই কৃষিকার্যের মূল লক্ষ্য হল মুনাফা সর্বাধিক করা। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা এলাকায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক্তন সেনাকর্মী, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবী এবং ধনী ব্যবসায়ীরা কৃষিকে শিল্পের মতো ব্যবহার করছে। তারা ছোটো চাষিদের জমি বেশি দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে। জমিবন্ডগুলিকে একত্রিত করে বড় আকারের কৃষিখামার গঠন করছে। তারপর সেই কৃষি খামারে যান্ত্রিক প্রথায় কৃষিকার্য সম্পন্ন করছে। এক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন নিবিড়। এতে শ্রমিক কম লাগে। এভাবে শ্রমের খরচ কমিয়ে তারা মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করছে। এটি আসলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছোটো চাষি ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। সেটি আবার মালিকদের সস্তায় মুজর নিয়োগ করতে সাহায্য করছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির চরিত্রই তাই। এরূপ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে ছোটো চাষি তার জমির মালিকানা হারায় এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। বড়ো চাষিরাও ছোটো চাষিকে ইজারা বা ভাগচাষের দেওয়া জমি ফিরিয়ে নিচ্ছে। সেই জমি তারা বেশি যন্ত্রপাতি ও কম মজুর দিয়ে চাষ করাচ্ছে। সবুজবিপ্লবের ফলে এভাবে একদিকে ছোট জোতগুলি বড় জোতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্র চাষি ভূমিহীন ক্ষেতমুজরে পরিণত হচ্ছে এবং তার ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। ছোটো চাষিদের জোতগুলি ধীরে ধীরে ধনী চাষিদের দখলে চলে যাচ্ছে এবং জোতের আয়তন বড় হচ্ছে। সেই বড় জোতে অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবী, ধনী ব্যবসায়ী এবং অবসর প্রাপ্ত সেনাকর্মীরা কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং যথাসম্ভব কম সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ ধনতান্ত্রিক প্রথায় কৃষিকার্য পরিচালনা করছে। যে স্থানে সবুজ বিপ্লব যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে (যেমন, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি) সেখানে এই প্রবণতা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে প্রজাকৃষক ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার (peasant farming) পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক সেখানে প্রজাকৃষক ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার (peasant forming) পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার (capitalist farming) উদ্ভব ও প্রসার ঘটছে।

সবুজ বিপ্লবের আরো কিছু প্রভাব (Some other Effects of Green Revolution)

ভারতে সবুজ বিপ্লবের আরো কয়েকটি প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে পারি।

1. দেশের যে-সব অঞ্চলে সেচের সুবিধা রয়েছে, সেইসব অঞ্চলে নতুন প্রযুক্তি প্রসার লাভ করেছে। অ-সেচসেবিত অ্যাচলে সবুজ বিপ্লবের প্রসার তেমন ঘটেনি।

2. নতুন কৃষি পদ্ধতি ব্যয়বহুল। এতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা ছোটো চাষির সাধ্যের বাইরে। তাই নতুন প্রযুক্তির সুবিধা বড় চাষিরাই গ্রহণ করতে পেরেছে। মাঝারি ও ছোটো চাষিরা নতুন প্রযুক্তির সুবিধা বড় চাষিরাই গ্রহণ করতে পেরেছে। মাঝারি ও ছোটো চাষিরা নতুন প্রযুক্তির সুফল গ্রহণ করতে পারেনি। এই সবুজ বিপ্লবের ফলে তাই গ্রামীণ ভারতে আয় বৈষম্য বেড়েছে।

3. যে-সব অঞ্চলে চাষিদের সাক্ষরতার স্তর উন্নত, সেইসব অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব বেশি প্রসার লাভ করেছে। সাক্ষরতার হার যেখানে কম, সেখানে সবুজ বিপ্লব তেমন প্রসার লাভ করেনি। এটিও উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে।

4. সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষকদের আয় বেড়েছে। ফলে অনেক শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। শিল্পক্ষেত্র এভাবে কৃষির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। আবার, শিল্পের তৈরি নানা যন্ত্রপাতি ও কৃষি উপকরণ সবুজ বিপ্লবকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। সবুজ বিপ্লব এভাবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে পরস্পর-নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আরো জোরদার করেছে।

5. সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষি অনেক বেশি বাজারমুখী হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি কিনতে, বীজ, সার ও কীটনাশক কিনতে, এমনকি ঋণ জোগাড় করতে চাষি বাজারমুখী হয়েছে।

6. সবুজ বিপ্লব যে সমস্ত অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে সেই সমস্ত অঞ্চলে একাধিকবার চাষ হয়। ফলে বছরের সারা সময়েই কৃষিকার্য চলে। সবুজ বিপ্লবের ফলে এভাবে কৃষি মরশুমিধর্মিতা হ্রাস করেছে।

7. সবুজ বিপ্লব রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার ঘটিয়েছে। এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে গেছে। ফলে পানীয় জলে আর্সেনিকের দূষণ ঘটেছে। কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্য দূষিত হয়েছে। কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার জীববৈচিত্র্য নষ্ট করেছে এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিপর্যস্ত করেছে।

অনেকে তাই সবুজ বিপ্লবকে 'বিপ্লব' আখ্যা দিতে রাজি নন। তাঁদের মতে, সবুজ বিপ্লব বা কৃষির নয়া প্রযুক্তি গ্রামীণ ভারতে কর্মহানি ঘটিয়েছে এবং আয় বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া, সবুজ বিপ্লব সারাদেশে সমভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে এই বিপ্লব যতটা সফল ও প্রসারিত হয়েছে, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মাত্র কয়েকটি জেলাতেই তা সীমাবদ্ধ। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও সবুজ বিপ্লব তেমন প্রসার লাভ করেনি। কৃষির নতুন প্রযুক্তি তাই দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া, সকল কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও সবুজ বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েনি। গমের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব যতটা সফল, ধান, পাট বা তুলোর ক্ষেত্রে তা সফল হয়নি। তাই এটিকে বিপ্লব বলা চলে না। নতুন কৃষি কৌশল ভারতের কৃষিতে একটা বড় পরিবর্তন (major break through) এনেছে, কিন্তু এটাকে বিপ্লব বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়। ভারতীয় কৃষি এখনও প্রকৃতির খেয়াল–খুশির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিতে বিপ্লব ঘটলে চিত্রটি নিশ্চয়ই আলাদা হত। তাছাড়া, উপযুক্ত ভূমি সংস্কার না করে বীজ-সার-জল প্রয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এই কৌশল বড় চাষিকেই সাহায্য করেছে এবং গ্রামীণ ভারতে শ্রেণি-সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছে। রাষ্ট্র সংঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক U. Thant তাই বলেছেন যে, ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ না করে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি নিয়ে আসবে (The Green Revolution may indeed prove to be a pandora's box rather than a cornucopia unless developing countries

urgently push through land reforms)। অনেকে তাই মনে করেন যে, ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ না করে এই নতুন কৃষি কৌশলকে যদি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সবুজ বিপ্লব রক্তাক্ত বিপ্লবে (red revolution) পরিণত হতে পারে।

3.7 ভূমি সংস্কার : সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য (Land Reforms : Definition and Objectives)

ভূমি সংস্কার বলতে দুটি বিষয়কে প্রধানত দুটি বিষয়কে বোঝানো হল : (i) জমির মালিকানা স্বত্বের সংস্কার অর্থাৎ জমির পুনর্বণ্টন এবং (ii) প্রজাস্বত্বের সংস্কার অর্থাৎ প্রজারা যে ইজারা বা ভাগে নেওয়া জমিতে চাষ করে সেই ইজারা বা ভাগ চাষের শর্তাদির সংস্কার। Doreen Warriner ভূমি সংস্কারের একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিয়েছে। তাঁর মতে, চিরাচরিত এবং মান্য (accepted) মত অনুসারে ভূমি সংস্কার বলতে বোঝায় ক্ষুদ্র চাষি ও কৃষিশ্রমিকদের স্বার্থে জমির পুনর্বণ্টন। আর বিস্তৃততর ও বর্তমানে প্রচলিত সংজ্ঞা অননুসারে ভূমি সংস্কার হল কৃষির প্রতিষ্ঠানগত *যে-কোনো* উন্নয়ন। এক কথায়, **ভূমি সংস্কার বলতে বোঝায় কৃষি উন্নয়নের পথে প্রতিষ্ঠানগত বাধাগুলির অপসারণ করা।** জমির মালিকানা স্বত্বের সংস্কার বলতে বোঝায় জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী জমির পুনর্বণ্টন। আর প্রজাস্বত্ত্বের সংস্কার বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ও প্রকৃত চাষিদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ, খাজনার হার নিয়ন্ত্রণ, জমিতে প্রজা বা ভাগচাষিদের চাষের স্থায়ী স্বত্ত্ব প্রদান প্রভৃতি।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ভূমি সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য হল দুটি। **এক,** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যেসব প্রতিষ্ঠানগত বাধা আছে সেগুলি দূর করে কৃষি উন্নয়নের উপযোগী কাঠামো গড়ে তোলা। **দুই,** গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করা।

3.7.1 ভারতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি (Land Reform Programmes in India)

ভারতের ভূমি সংস্কার কর্মসূচির মূল উপাদানগুলি নিম্নরূপ :

1. মধ্যাস্বত্বভোগীদের অপসারণ (Abolition of intermediaries),
2. প্রজাস্বত্বের সংস্কার (Tenancy reforms)
3. জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ (Fixation of ceiling on land holdings)
4. জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of land holdings)
5. সমবায় চাষ প্রবর্তন (Introduction of co-operative forming)

আমরা এই কর্মসূচি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

1. মধ্যসত্ত্বভোগীদের অপসারণ : মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদার, তালুকদার ইত্যাদিদের অপসারণ করে প্রকৃত চাষিদের হাতে জমি অর্পণ করা। এজন্য জমিদারি বিলোপ আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে বলা হয় যে, জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ করা হবে। এভাবে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে তা ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষিদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

2. প্রজাস্বত্বের সংস্কার : মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের হাতে থাকা জমি প্রজাদের মধ্যে ইজারা বিলি করে। এই

ইজারার একটি প্রধান রূপ হল ভাগচাষ প্রথা। এই প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এগুলিকে এক সাথে প্রজাস্বত্ব সংস্কার বলা হয়। বিভিন্ন রাজ্যে এসম্পর্কে আইন পাশ হয়েছে। এইসব আইনের প্রধান ব্যবস্থাদি নিম্নরূপ :

(ক) সমস্ত রাজ্যেই খাজনার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য খাজনার পরিমাণ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন।

(খ) সমস্ত রাজ্যেই প্রজাস্বত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আইন পাশ করা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো প্রজাকেই উচ্ছেদ করা চলবে না। যদি প্রজা খাজনা না দেয় বা জমি চাষ না করে ফেলে রাখে বা জমির অপব্যবহার করে, তবেই প্রজাকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। আবার, জমির মালিক নিজে চাষ করতে চাইলেও প্রজাদের কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে নিতে পারে। তবে সমস্ত জমি ছাড়িয়ে নেওয়া চলবে না।

(গ) বিভিন্ন রাজ্যের আইনে এই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে যে, প্রজারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের চাষ করা জমিতে মালিকানা অর্জন করতে পারে। বন্যা, অনাবৃষ্টি বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সরকার যদি চাষিদের খাজনা মকুব করে, তাহলে মালিকদেরও প্রজাদের খাজনা মকুব করতে হবে।

3. জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ : ভারতে ভূমি সংস্কারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচচ হল জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন। প্রায় সব রাজ্যেই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভিত্তিতে জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আইন পাশ করা হয়েছে।

4. জোতের সংহতিসাধন : ভারতে ভূমি সংস্কারের আর একটি কর্মসূচি হল জোতের সংহতিসাধন। ভারতের জোতগুলি ছোটো ছোটো এবং সেগুলি অসংবদ্ধ। জোতের অসংবদ্ধতা প্রতিহত করার জন্য রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় আইনপাশ করতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় সরকার পরামর্শ দিয়েছে।

5. সমবায় চাষ প্রবর্তন : ভারতে ভূমি সংস্কারের অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য হল সমবায় চাষ প্রবর্তন। ভূমি সংস্কার আইনে বলা হয়েছে যে, মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ করে এবং জোতের ঊর্ধ্বসীমা প্রয়োগ করে সরকারের হাতে যে উদ্‌বৃত্ত জমি আসবে সেই উদ্‌বৃত্ত জমিতে যৌথভাবে সমবায় প্রথায় চাষ করা হবে।

3.7.2 ভূমি সংস্কার কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়ন (An Evaluation of the Progress of Land Reform Programmes)

ভারতে ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা আইন পাশ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে নানা ফাঁক, দুর্বলতা ও অসংগতি আছে।

প্রথমত, মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণের জন্য যে জমিদারি বিলোপ আইন পাশ করা হয় তা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের জমিদারি বিলোপের মতো নয়। যেমন, ভারতের আইনে জমিদারদের চাষের জন্য কিছু জমি রাখতে দেওয়া হয়। সেই জমি তারা প্রচাদের মধ্যে ইজারা বিলি করেছে এবং প্রজাদের নানাভাবে শোষণ করেছে। তাছাড়া, জমিদারির বিনিময়ে, জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, কিছুটা নগদে এবং কিছুটা ঋণপত্রে। এভাবে সরকারের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অপব্যবহার হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রজাস্বত্বের স্থায়ী অধিকার আইনসম্মত ভাবে স্বীকৃত হলেও বিভিন্ন অঞ্চলে এই আইনকে অমান্য করে জমির মালিকানা প্রজাদের সঙ্গে মৌখিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রজাস্বত্বের লিখিত দলিল না থাকায়

যে-কোনো অজুহাতে প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। জমি থেকে উৎখাত হওয়া প্রজারা ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। প্রজাস্বত্ব আইনগুলি পাশ হবার পর শহরে বসবাসকারী জমির মালিকেরা অনেকে তাদের জমি বেচে দিতে শুরু করে। এই সমস্ত জমি কিনে নেয় গ্রামের সম্পন্ন চাষিরা। নিজেরা চাষ করবে এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তারা প্রজাদের উচ্ছেদ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে অলিখিত চুক্তিতে প্রজাদের মধ্যে জমি বিলি করে। ফলে সহজেই তারা প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারে।

তৃতীয়ত, জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের আইনগুলির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যে ঊর্ধ্বসীমার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া, এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি ছাড় দেওয়া হয়েছে, যেমন, চা, কফি, রবার বাগিচার জন্য নিযুক্ত জমি, পশুপালনের জন্য নিযুক্ত জমি, চিনি কলের মালিকানাভুক্ত আখ চাষে নিযুক্ত জমি, কৃষি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রভৃতি। অনেকে এসবের অজুহাতে উদ্‌বৃত্ত জমি রেখে দিয়েছে। ফলে উদ্‌বৃত্ত জমি বিশেষ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, জোতের ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইনগুলিও যথাযথভাবে রূপায়িত হয়নি। বড় বড় জোতের মালিকরা বেনামে বহু জমি রেখে দিয়েছে। উদ্‌বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ ও তা পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে নানা বিচারাধীন মামলা-মোকদ্দমাও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিকরা বাগিচা, মেছো ভেড়ি প্রভৃতির নামে চাষের জমি রেখে দিয়েছে। এভাবে তারা জোতের ঊর্ধ্বসীমা আইনকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে।

চতুর্থত, ভূমি সংস্কার কর্মসূচির অন্তর্গত আর একটি বিষয় ছিল বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড জোতগুলিকে একত্রিত করা যাতে বৃহদায়তনের চাষের সুবিধা পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কোনো কোনো রাজ্যে আইন পাশ করা হয়েছে। কোনো রাজ্যে কার্যক্রমটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, আবার কোনো কোনো রাজ্যে তা ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। তবে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ বাদ দিলে জোতের সংহতি সাধনের কাজটি বিশেষ এগোয়নি।

পঞ্চমত, বিক্ষিপ্ত জোতগুলিকে একত্রিত করে সমবায় চাষ প্রবর্তন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। সেই প্রস্তাবও বিশেষ কার্যকর হয়নি। সমবায় চাষ সম্পর্কে কোনো রাজ্যই আলাদাভাবে কোনো আইন পাশ করেনি। তবে চাষিরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করলে সরকার নানা ভাবে সাহায্য করবে এরূপ আশ্বাস অনেক রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে রাখা হয়েছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ভারতে ভূমি, সংস্কার কর্মসূচি সফল হয়নি। বড় বড় চাষিরা বেনামে বহু উদ্‌বৃত্ত জমি রেখেছে। কৃষক-প্রজাকে আজও উচ্ছেদ করা হচ্ছে, জোতের সংহতিসাধনের জন্য কিছুই বিশেষ করা হয়নি। আর সমবায় চাষও আদৌ প্রসারলাভ করেনি। ভারতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির এই ব্যর্থতার পিছনে নানা কারণ আছে। সেই কারণগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

প্রথমত, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আসনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে আইন পাশ হতে অনেক সময় লেগেছে। ইতিমধ্যে বড় চাষিরা তাদের বাড়তি জমি বেনামে হস্তান্তরিত করেছে।

দ্বিতীয়ত, ভূমি-সংস্কার আইনে নানা অসংগতি বা ফাঁক রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে বড় চাষিদের সন্তুষ্ট করতে ফাঁক রাখা হয়েছে। ফলে অনেকেই ভূমি সংস্কার আইনকে ফাঁকি দিতে পেরেছে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন রাজ্যের আইনের মধ্যেও নানা ধরনের ব্যবধান ও অসংগতি আছে।

চতুর্থত, ভারতের আমলাতন্ত্রের একটা বড় অংশ সম্পন্ন কৃষি পরিবার থেকে এসেছে। ফলে তারা ভূমি সংস্কার আইন রূপায়িত করতে আগ্রহী নয়।

পঞ্চমত, ভারতের ক্ষুদ্র চাষি ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরা দরিদ্র ও নিরক্ষর তারা অসংগঠিত। ফলে ভূমি সংস্কার আইন রূপায়ণের জন্য তারা সরকারকে চাপ দিতে পারেনি।

ষষ্ঠত, জোতের সংহতি সাধনের জন্য কোনো রাজ্যই উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

সপ্তমত, সমবায় চাষ সম্পর্কে চাষিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা হয়নি।

অষ্টমত, গ্রামাঞ্চলে বড় চাষিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি। তারা ভূমি সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে বাধা দিয়েছে।

নবমত, ভারতে জমি সংক্রান্ত নথিপত্র যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়। উপযুক্ত নথিপত্রের অভাবে অনেক সময়ই ভূমি সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত করা যায়নি।

এসমস্ত কারণে ভারতে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি সফল হয়নি। অথচ ভারতের ন্যায় শিল্পোন্নত কৃষিপ্রধান দেশে ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। **প্রথমত,** ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত চাষি জমির মালিকানা পেলে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। **দ্বিতীয়ত,** সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। **তৃতীয়ত,** আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে জোতের অসংবদ্ধতা দূর করতে হবে। আর তার জন্য ভূমিসংস্কার প্রয়োজন। সরকারকে তাই ভূমি সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণের কথা উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

3.8 ভারতে গ্রামীণ ঋণ (Rural Credit in India)

কৃষিকার্যের ব্যয় নির্বাহ করা, জমির উন্নতি ঘটানো, খাজনা মেটানো, পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় মেটানো ইত্যাদির জন্য চাষি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে যে অর্থসাহায্য নিয়ে থাকে তাকেই কৃষি ঋণ বা গ্রামীণ ঋণ বলে। শিল্পের ন্যায় কৃষিতও মূলধনের প্রয়োজন। কৃষির জন্য বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়, কৃষিকার্যের দৈনন্দিন খরচ, জমির উন্নয়ন, উৎপন্ন শস্যের বিপণন ইত্যাদি সব কাজেই অর্থের প্রয়োজন। ভারতের চাষিরা প্রায়শই তাদের নিজস্ব সঞ্চয় বা অন্যান্য সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের সবটা সংগ্রহ করতে পারে না। ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের আয় স্বল্প। ফলে তাদের সঞ্চয়ও নগণ্য। এছাড়া রয়েছে কৃষি উৎপাদনে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা, যেমন, আবহাওয়ার অবস্থা, কীটপতঙ্গের আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে কৃষি উৎপাদন খুবই অস্থিতিশীল। এছাড়া, সাম্প্রতিক কালে কৃষি উপকরণের (বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, পাম্প চালানোর জন্য জ্বালানি প্রভৃতি) দাম খুবই বেড়েছে। কৃষিপণ্য বিপণনের ব্যয় এবং কৃষিপণ্য মজুতকরণের ব্যয়ও বর্তমানে যথেষ্ট বেড়েছে। এসমস্ত কারণে ভারতীয় চাষি, বিশেষত ছোটো ও মাঝারি চাষি, তার কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থের সংস্থান করতে পারে না। তাই চাষিদের নানা প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে ঋণ করতে হয়। এই ঋণকেই বলে গ্রামীণঋণ বা কৃষি ঋণ (Rural credit or Agricultural Credit)।

কৃষি ঋণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কৃষি ঋণের উদ্দেশ্য, মেয়াদ, উৎস ইত্যাদি অনুসারে কৃষি ঋণের শ্রেণি বিভাগ করা হয়। যেমন, কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য অনুসারে কৃষি ঋণকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ

করা হয় : (ক) উন্নয়নমূলক ঋণ, (খ) উৎপাদনের জন্য ঋণ, (গ) বিপণনের জন্য ঋণ এবং (ঘ) ভোগের জন্য ঋণ। এদের মধ্যে কৃষির উন্নয়ন (অর্থাৎ জমির স্থায়ী উন্নয়ন, পতিত জমি উদ্ধার, নতুন জমি ক্রয়, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি), কৃষি উৎপাদন ও কৃষিপন্য বিপণনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ (productive credit) বলে। এ ধরনের ঋণ সাধারণত চাষির ঋণের ভার বাড়ায় না। বরং তা কৃষি উৎপাদননে সাহায্য করে। এসমস্ত ঋণ ছাড়াও দৈনন্দিন ভোগ ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য (শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি) চাষি ঋণ নিয়ে থাকে। এ ধরনের ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ (unproductive credit) বলে। এগুলো হল ভোগের জন্য ঋণের উদাহরণ। এই ঋণ চাষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কোনো সাহায্য করে না, বরং তার ঋণের ভার বা বোঝা বাড়িয়ে দেয়। তাই এ ধরনের ঋণ চাষি যত কম নেয়, ততই তার পক্ষে মঙ্গল। এই ঋণ অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই অকাম্য ঋণ। আবার, ঋণের মেয়াদ বা সময়কাল অনুসারে কৃষিঋণকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ (short term credit), মাঝারি মেয়াদি ঋণ (medium term credit) এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (long term credit) এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। একবছরের কম সময়ের জন্য ঋণকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ বলে।। এরূপ ঋণের উদ্দেশ্য হল কৃষিকার্যের চলতি ব্যয় মেটানো (যেমন, বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি ক্রয়, শ্রমিককে মজুরি প্রদান প্রভৃতি) এবং পরিবারের ভোগ ব্যয় মেটানো। সাধারণত চাষের সময় এই ঋণ নেওয়া হয় এবং ফসল তোলার পরেই এই ঋণ শোধ করার অঙ্গীকার করা হয়। অন্যদিকে, সাধারণত এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি ঋণকে মাঝারিমেয়াদি ঋণ বলে। যেমন, লাঙ্গল ও বলদ ক্রয়, ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ প্রভৃতির জন্য, এককথায় কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই মাঝারি-মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হয়। আর, জমির স্থায়ী উন্নয়নের জন্য অথবা ভারী কৃষি যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ও বছরের অধিক সময়ের জন্য যে ঋণগ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ বলে। এরূপ ঋণের উদ্দেশ্য হল : জমির স্থায়ী উন্নয়ন ঘটানো, পতিত জমি উদ্ধার, ট্রাক্টর ক্রয়, ভারী নলকূপ খনন প্রভৃতি।

কৃষি ঋণের জামিনের প্রকৃতির অনুসারে কৃষি ঋণকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়, যেমন, জমিবন্ধকি ঋণ, শস্য বন্ধকি বা পশুবন্ধকি ঋণ এবং ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ।

কৃষি ঋণের উৎস অনুসারে কৃষি ঋণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ (institutional credit) এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ (non-institutional credit)। ব্যাংক, সমবায় সমিতি ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিলে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বলে। অন্যদিকে, মহাজন, ব্যবসায়ী, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির কাছ থেকে ঋণ নিলে তাকে অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বলে। একে ব্যক্তিগত ঋণও (Private credit) বলা হয়।

3.8.1 ভারতে গ্রামীণ ঋণের সমস্যাবলি (Problems of Rural Credit in India)

ভারতে গ্রামীণ ঋণের সঙ্গে কিছু সমস্যা জড়িত। সংক্ষেপে এই সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, গ্রামীণ ঋণ বা কৃষিঋণের প্রধান সমস্যা হল এর অপ্রতুলতা। এই ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কৃষিতে নিযুক্ত। এই কৃষকদের আবার বড় অংশ হল ছোটো ও মাঝারি চাষি। এই বিপুল সংখ্যক চাষির কৃষিকার্যের ব্যয় মেটানো এবং জমির উন্নতি ঘটানোর জন্য যে পরিমাণ তহবিলের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অর্থ কৃষকেরা বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ভারতে কৃষি ঋণের আর একটি প্রধান সমস্যা হল এই ঋণি সময়মতো না পাওয়া। কৃষিকার্য মরশুমভিত্তিক। বছরের নির্দিষ্ট কিছু ঋতুতে চাষির ঋণের প্রয়োজন। কিন্তু প্রায়শই চাষি ঠিক সময়ে ঋণ পায়

না। ফলে ঋণের উপযুক্ত ব্যবহারও হয় না। একথা বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে সত্য। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে নানা নিয়মকানুনের কড়াকড়ি থাকে। ফলে অনেক সময়ই চাষি সময়মতো প্রয়োজনীয় নথিপত্র জোগান দিতে পারেনা । আবার, সময়মতো কাগজপত্র সরবরাহ করলেও নানা আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতির জন্য ঋণ মঞ্জুর করতে অনর্থক দেরি হয়। ফলে দেরিতে প্রাপ্ত ঋণের সদ্ব্যবহার ঘটে না।

তৃতীয়ত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে চাষিরা দরিদ্র ও নিরক্ষর। ফলে তারা অসংগঠিত। কৃষি ঋণ পাবার জন্য তারা সংগঠিত ভাবে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনা। ফলে ঋণসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশাসনও ঠিকঠাক অবহিত থাকে না।

চতুর্থত, ভারতের কৃষিকার্য অনেকখানি প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল। ফলে এখানে কৃষিতে ঝুঁকি বেশি। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড় বা সাইক্লোন ইত্যাদির ফলে চাষির আয়ে অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে অনেক ব্যক্তি, এমনকি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানও কৃষি ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। আবার, ফলন ভালো হলে অনেক সময় ফসলের দাম অনেক কমে যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের বিশেষত খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ার দরুন এটা ঘটে থাকে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে জোগান বাড়লে দাম বেশি হারে কমে। ফলে কোনো কৃষিদ্রব্যের ফলন ভালো হলেও ঐ দ্রব্যের দাম কমে গিয়ে চাষির আয় কমে যেতে পারে। তাছাড়া, ফসল ঠিক ওঠার মুখে দাম খুব কম থাকে। অথচ ছাটো ও মাঝারি চাষিকে প্রয়োজনের চাপে ঐ সময়েই বিক্রি করতে হয়। ফসল মজুত করে রাখতে পারলে পরে ফসলের বেশি দাম পাওয়া যায়। ছোটো ও মাঝারি চাষিরা সেই সুবিধা নিতে পারে না। ফসলের বেশি দামের সুবিধা ভোগ করে বড় চাষি ও ব্যবসায়ীরা। এসমস্ত কারণে দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণ দেওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি। ফলে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জোগান কম হয়।

পঞ্চমত, ভারতীয় কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দরিদ্র। তাদের নানা অপূরিত চাহিদা (unfulfilled demand) থাকে। ফলে অনেক সময়েই প্রলুব্ধ হয়ে বা সংসারের চাপে তারা চাষের উন্নতির জন্য নেওয়া ঋণ নানা সাংসারিক কাজে খরচ করে ফেলে। এটি কৃষি ঋণের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতির জন্যও চাষি ঋণ নিয়ে থাকে। এর পিছনে কাজ করে সামাজিক রীতিনীতির চাপ, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকলজ্জার ভয় প্রভৃতি। এসমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় হল অনুৎপাদনশীল ব্যয় (unproductive expenditure)। এই ব্যয়ের ফলে চাষির উৎপাদনশীলতা বা চাষের ফলন বাড়ে না। শুধু চাষির ঋণের বোঝা বা ভার আরো বাড়ে। ভারতে গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে এই অনুৎপাদনশীল ঋণের সমস্যা একটি বড় সমস্যা। এতে শুধু গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা বেড়েই চলে। কারণ এই ধরনের ঋণে চাষির ব্যয়ই শুধু বাড়ে আয় বাড়েনা, ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বাড়ে না।

ষষ্ঠতা, ক্ষুদ্র চাষিরা বেশি ঋণ নেয় গ্রামীণ মহাজন, ব্যবসায়ী, জোতদার, দোকানদার প্রভৃতিদের কাছ থেকে। এগুলি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক সূত্র। এদের সুদের হার বেশ চড়া এবং ঋণ পরিশোধের অন্যান্য শর্তও বেশ কঠোর। কিন্তু এদের ঋণদানের ক্ষেত্রে নিয়মের কড়াকড়ি কম। ঋণের জন্য নথিপত্র বিশেষ দিতে হয় না। খুব কম সময়ের মধ্যেই ঋণ পাওয়া যায়। ছোটো ছোটো কিস্তিতে প্রয়োজন মাফিক ঋণ পাওয়া যায়। এককথায় বলতে গেলে কৃষি ঋণের এই অ-প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রগুলি খুবই কৃষকবান্ধব। (Peasant friendly)। ফলে চাষি এদের কাছে ঋণ নিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে। অনেক সময় এদের কাছে ফসল বন্ধক রেখে চাষি ঋণ নেয়। এক্ষেত্রেও ঋণদাতা প্রায়শই কম দামে চাষির ফসল কিনে নেয়। এভাবে একদিকে ঋণের চড়া সুদ এবং অন্যদিকে ফসলের কম দামের মাধ্যমে চাষি শোষিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের নিয়মের নানা কড়াকড়ির ভয়ে চাষি সেখানে ঋণ নিতে আগ্রহ বোধ করেন না।

তাহলে আমরা দেখছি যে, ভারতে গ্রামীণ ঋণ বা কৃষি ঋণের সঙ্গে নানা সমস্যা জড়িত। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, ঋণের সদ্ব্যবহার করতে না পারার দরুন চাষি ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। মহাজন, জোতদার, ব্যবসায়ী, দোকানদার প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামীণ ঋণদাতা ধীরে ধীরে চাষির জমি গ্রাস করে। ভারতের গ্রামীণ ঋণের সম্পর্কে বলা হয় যে, ফাঁসির দড়ি যেমন ফাঁসির আসামিকে ধরে রাখে, কৃষিঋণও কৃষককে সেইভাবে ধরে রাখে (Credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged)।

এ কথার তাৎপর্য হল, কৃষি ঋণ কৃষকের একটা প্রধান বা প্রয়োজনীয় অবলম্বন হলেও তা ফাঁসির দড়ির মতোই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ মহাজন ইত্যাদিদের কাছে একবার ঋণ নিলে চাষি সহজে আর ঋণের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তারা সহজেই মহাজনদের শোষণের শিকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া, দরিদ্র, নিরক্ষর ও নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতীয় চাষি নানা অনুৎপাদনশীল ঋণও নিয়ে থাকে। এতে তার কোনো আর্থিক সুরাহা হয় না। তার চাষের উৎপাদন বাড়ে না। শুধু ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এক সময় মহাজন বা জোতদারের কাছে তার জমিটুকু বিক্রি করে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। আর ঋণের বোঝা বংশানুক্রমে চলতে থাকে। তাই বলা হয় যে, Indian farmer is born in debt; he lives in debt and dies in debt. পরবর্তী প্রজন্মকেও মহাজন জোতদারের কাছে ক্ষেতমজুর হিসাবে শ্রম বিক্রি করতে হয়।

3.8.2 গ্রামীণ ঋণের সমস্যা দূর করতে সরকারি ব্যবস্থাসমূহ (Government Measures to Solve the Problems of Rural Credit)

গ্রামীণ ঋণ বা কৃষিঋণের সমস্যা দূর করার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সেই ব্যবস্থাগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

1. 1935 সালে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই ব্যাংকে আলাদা কৃষি ঋণ বিভাগ খোলা হয়। কৃষি ঋণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখাশোনা করা, রাজ্য সরকার, রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংককে পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি হল এই বিভাগের প্রধান কাজ। কৃষিঋণ দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক দুটি তহবিল গড়ে তুলেছে। একটি হল জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদি) তহবিল এবং অপরটি হল জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্বসাধন) তহবিল। প্রথমটি থেকে দীর্ঘমেয়াদি এবং দ্বিতীয়টি থেকে স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দেওয়া হয়। প্রতিটি কৃষিঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই রিজার্ভ ব্যাংক অর্থসাহায্য দিতে থাকে। এছাড়া, কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক বা সংক্ষেপে নাবার্ড (NABARD)। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানের এটিই এখন সর্বোচ্চ সংস্থা।

2. 1955 সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া গঠন করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানে এই ব্যাংক একট বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। **প্রথমত,** স্টেট ব্যাংক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলিকে অর্থ স্থানান্তরের সুবিধা দিয়ে থাকে এবং তাদের 0.5% কম সুদে টাকা ধার দেয়। **দ্বিতীয়ত,** জমি বন্ধকি ব্যাংকগুলিকেও স্টেট ব্যাংক নানাভাবে অর্থসাহায্য করে। **তৃতীয়ত,** গ্রাম অধিগ্রহণ প্রকল্প (Village Adoption Scheme) এবং সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে স্টেট ব্যাংক গ্রামের চাষি ও ক্ষুদ্র কারিগরদের সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করছে। **চতুর্থত,** কৃষিক্ষেত্রে অর্থসরবরাহের জন্য স্টেটব্যাংক একটি স্বতন্ত্র কৃষি উন্নয়ন বিভাগ খুলেছে। **পঞ্চমত,** কৃষিপণ্য শোধন ও বিক্রয় করতে স্টেট ব্যাংক সমবায় বিক্রয়সমিতিগুলিকে ঋণ দেয়। **ষষ্ঠত,** ফসল গুদামজাত করতেও স্টেট ব্যাংক অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে।

3. জমির উন্নয়নের জন্য কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন। এজন্য রাজ্যস্তরে জমি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। জমি অথবা কোনো অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে রেখে কৃষকরা এই ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পেতে পারে।

4. সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুসারে তিনস্তর বিশিষ্ট সমবায় ঋণদান কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। সর্বোচ্চ বা রাজ্য স্তরে রয়েছে রাজ্য সমবায় ব্যাংক। তার অধীনে প্রতি জেলায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের অধীনে আছে বহুসংখ্যক প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি। এদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক। আর রাজ্য সমবায় ব্যাংককে ঋণ দিয়ে সাহায্য করে রিজার্ভ ব্যাংক। কৃষি ছাড়া গ্রামীণ ও কুটির শিল্প এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের জন্যও রাজ্য সমাবায় ব্যাংক সাহায্য করে থাকে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহের জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে জমি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব রাজ্যেই একটি করে কেন্দ্রীয় জমি উন্নয়ন ব্যাংক আছে।

5. 1969 সালে 14টি এবং 1980 সালে আরও 6টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। পরর্বতীকালে রাষ্ট্রায়াত্ত ছোটটা ব্যাংকগুলিকে বড় কয়েকটি ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 2022 সালের 1 এপ্রিল স্টেট ব্যাংক সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা ছিল 12 (বারো)। জাতীয়করণের পর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি গ্রামাঞ্চলে শাখাবিস্তারে এবং কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানে যথেষ্ট আগ্রহী হয়েছে।

6. গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠানগত ঋণের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য 1975 সালে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক (Regional Rural Banks বা RRBs) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় কৃষি ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, কৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়াই এই আঞ্চলিক ব্যাংকগুলির উদ্দেশ্য। সমবায় সমিতিগুলির পরিপূরক হিসাবে গ্রামীণ ব্যাংকগুলি কাজ করছে এবং কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

7. কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানকারী আর্থিক সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক বা নাবার্ড (National Bank for Agriculture and Rural Development বা NABARD) প্রতিষ্ঠিত হয়। 1982 সালে রিজার্ভ ব্যাংক এই নাবার্ড প্রতিষ্ঠিত করে এবং কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত ঋণ সরবরাহের দায়িত্ব এই বাংকের উপর অর্পণ করে। এই ব্যাংক গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণদানকারী বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সংক্ষেপে নাবার্ড-এর কাজগুলি হল— (i) কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য এই ব্যাংক পুনঃঅর্থসংস্থান করে থকে। (ii) রাজ্য সমবায় ব্যাংক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক, জমি উন্নয়ন ব্যাংক এবং রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমোদিত আর্থিক সংস্থাকে ঋণদান করে। (iii) সমবায় ঋণদান সমিতির শেয়ার মূলধন কেনার জন্য এই ব্যাংক রাজ্যসরকারগুলিকে ঋণ দেয়। (iv) কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সরকার-স্বীকৃত কোনো সংস্থাকে নাবার্ড অর্থ সাহায্য করতে পারে। (v) গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক এবং অন্যান্য সমবায় ব্যাংকগুলির কাজকর্মের তদারক করে নাবার্ড। (vi) এই ব্যাংক কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা চালায়। (vii) গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে নাবার্ড যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

3.8.3 সরকার গৃহীত ব্যবস্থাদির মূল্যায়ন (An Evaluation of Government Measures)

ভারতে কৃষি ঋণ সরবরাহের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ঋণ সরবরাহের সরকার কর্তৃক

উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হল— (i) রিজার্ভ ব্যাংকে আলাদা কৃষিঋণ বিভাগ খোলা, (ii) ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে অধিগ্রহণ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্থাপন, (iii) তিনস্তর বিশিষ্ট সমবায় ঋণদান কাঠামো গড়ে তোলা, (iv) রাজ্য স্তরে জমি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপন করা, (v) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, (vi) স্টেট ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে কৃষি ঋণের প্রসার ঘটাতে বলা এবং সর্বোপরি, (vi) কৃষি ঋণদানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সুসংহত করার জন্য NABARD-এর প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতে গ্রামীণ ঋণের সমস্যা বিশেষ মেটেনি। ভারতের কৃষি পরিবারপিছু গড় ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আসলে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ঠিকঠাক রূপায়িত হয়নি। যেমন, প্রথমত, কৃষি ঋণ সরবরাহের জন্য সমবায় ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতে সমবায় আন্দোলন অনেকটা অগ্রসর হলেও এর কতকগুলি দুর্বলতা রয়েছে। (i) সমবায় সমিতিগুলির দেওয়া ঋণের মধ্যে অনাদায়ী অংশ ক্রমাগত বাড়ছে। (ii) ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল কাজে না লাগিয়ে অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। (iii) গ্রামের সমবায় সমিতিগুলিতে বড় চাষিরাই প্রাধান্য পায়। গরিব চাষি ও ক্ষেতমুজররা সমবায় সমিতি থেকে বিশেষ লাভবান হয়নি। সমস্ত রাজ্যে সমবায় আন্দোলন সমভাবে প্রসারিত হয়নি। (v) সমবায় সমিতির কাজে দক্ষতার অভাব এবং দুর্নীতি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আশা করা হয়েছিল যে, জাতীয়করণের পর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানের পরিমাণ দারুণভাবে বৃদ্ধি পাবে। সেই আশাও তেমনভাবে পূরণ হয়নি। এখনও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কৃষিঋণদানে আগ্রহ কম। (i) গ্রামাঞ্চলে শাখা খোলার ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আগ্রহ কম। (ii) অনেকক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি পরোক্ষভাবে গ্রামীণ চাষিদের ঋণ নিতে নিরুৎসাহ করেছে। (iii) এখনও অনেক গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোনো শাখা নেই। (iv) বাণিজ্যিক শস্যের চাষে যতটা ঋণ দেওয়া হয়েছে, খাদ্যশস্যের চাষে ততটা ঋণ দেওয়া হয়নি। (v) বাণিজ্যিক ব্যাকংগুলি বড়ো চাষিকেই ঋণ দিয়েছে, ছোটে চাষিকে ঋণ বিশেষ দেয়নি।

তৃতীয়ত, আশা করা হয়েছিল যে, গ্রামীণ ব্যাংকগুলি সমবায় সমিতিগুলির পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে এবং কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানের কাজে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবে কিন্তু এই আশাপূরণ হয়নি। অধিকাংশ গ্রামীণ ব্যাংকই লোকসানে চলছে। তাছাড়া, এদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। সেজন্য আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

চতুর্থত, নাবার্ড-এর ক্ষেত্রে দেশ যাচ্ছে যে, এরও অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ছে।

এ সমস্ত কারণে ভারতের গ্রামীণ ঋণে অ-প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রের (গ্রামীণ মহাজন, জোতদার, ব্যবসায়ী, দোকানদার প্রভৃতি) গুরুত্ব বিশেষ কমেনি। আমাদের সারণি 3. থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1951-52 সালে মোট কৃষি ঋণের প্রায় 93 শতাংশ আসত অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে আসত মাত্র 7 শতাংশ। তারপর 1961-62 সালে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের গুরুত্ব বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 19 শতাংশ। ঐ বছর অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কৃষি ঋণের প্রায় 81 শতাংশ সরবরাহ করেছিল। এভাবে ধীরে ধীরে ভারতের মোট গ্রামীণ ঋণে প্রতিষ্ঠানিক উৎসের গুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের গুরুত্ব কমে থাকে। 1981-82 সালে এই গুরুত্ব ছিল যথাক্রমে 61 শতাংশ ও 39 শতাংশ। কিন্তু তার পরের দশকেও (1991-92) এই আপেক্ষিক গুরুত্ব মোটামুটি একই থাকে অর্থাৎ 61 : 39। কিন্তু তারপর 2002 সালে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের অবদান কমে দাঁড়ায় 57 শতাংশ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের অবদান বেড়ে দাঁড়ায় 43 শতাংশ। সম্প্রতি

(2021) অবশ্য ভারতের মোট কৃষি ঋণে অপ্রতাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের অবদান হল 36 শতাংশ, আর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের বদান হল 64 শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে ভারতের কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রের গুরুত্ব বেড়েছে এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমেছে। তবে অ-প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের গুরত্ব 1981-82 সালের পর থেকে খুব ধীর গতিতে কমেছে। আর গুরুত্ব সামান্য কিছুটা কমলেও বর্তমান গুরুত্ব এখনও যথেষ্ট বেশি। তাছাড়া, অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। এদের কাজকর্ম রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়। স্বভাবতই ধরা যেতে পারে যে, অ-প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রগুলির ঋণদানের প্রকৃত পরিমাণ আমাদের সারণিতে উল্লিখিত পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি।

সারণি 3

ভারতে কৃষিঋণের উৎস (1951 থেকে 2021)

(শতকরা হিসাবে)

বছর	অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস	প্রাতিষ্ঠানিক উৎস	মোট
1951–52	92.7	7.3	100.00
1961–62	81.3	18.7	100.00
1981–82	39.4	60.6	100.00
1991–92	38.6	61.4	100.00
2002	42.9	57.1	100.00
2013	40.7	60.0	100.00
2021	36.0	64.0	100.00

সূত্র : বিভিন্ন সংখ্যার RBEI বুলেটিন এবং NSSO-র 70-তম রাউন্ড।

প্রতিষ্ঠানগত উৎস থেকে ঋণ পেতে গেলে অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কিন্তু মহাজনদের ঋণদান পদ্ধতি খুব সহজ ও সরল। তারাসহজেই কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দিতে পারে। ছোটো চাষির অনেকসময়ই ক্ষুত্র ঋণের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু সেই ঋণ তার তাৎক্ষণিক বা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কোনো সূত্রই চাষির এধরনের ঋণের প্রয়োজন মেটাতে পারেন॥ কিন্তু মহাজন, জোতদার প্রভৃতি অ-প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রগুলি সহজেই চাষির এধরনের ঋণের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এজন্যই গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের কার্যকর বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে মহাজনদের দাপট ও শোষণ আজও চলছে। তারা কৃকেদের কাছ থেকে চড়া সুদ আদায় করে এবং কৃষকদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নানাভাবে প্রতারণা করে। জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ নিতে হয় বলে তারা অনেক সময়ই জমি হারায়। ফলে তাদের ঋণ শোধের ক্ষমতা আরো কমে যায়। এভাবে বিশেষত ছোটো চাষিরা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। আবার, গ্রামাঞ্চলে শ্রমের বাজার, ঋণের বাজার ফসলের বাজার প্রভৃতি পরস্পর সংযুক্ত (interlinked)। ঋণগ্রস্ত চাষিরা কমদামে তাদের

মহাজনের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আবার, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বেশি দামে তাদের কাছ থেকে কিনতে বাধ্য হয়। এভাবে ঋণগ্রস্ত চাষি নানাভাবে মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়। 2021 সালের 1 এপ্রিল জাতীয়করণ করা কিছু ব্যাংকের সংযুক্তি (merger) এবং তার পূর্বে কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারিকরণের ফলে গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে মহাজন, ব্যবসায়ী এবং জোতদারদের দাপট ও শোষণ আরও বাড়বে বলেই মনে হয়। একথা ঠিক যে, মহাজনদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এই আইনগুলি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে মহাজনদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখনও অটুট আছে। মহাজনদের দ্বারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের শোষণ আজও সমানে চলছে।

মহাজনদের হাত থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে রক্ষা করার জন্য সম্প্রতি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভারতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করার কাজটি প্রধানত করে চলেছে নাবার্ড। এরই পাশাপাশি, সম্প্রতি কিছু সংস্থা ও প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতে ক্ষুদ্রও প্রান্তিত চাষি, কারিগর এবং আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণিদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী (Self-help Groups বা SHGs), কিষান ক্রেডিট কার্ড (KCC) প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana বা PMJDY)।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ব্যবস্থায় কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (Non-Government Organisations বা NGOs) এবং নাবার্ড স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে। তারপর নাবার্ড ঐ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যাংকের যোগাযোগ করে দেয়। ব্যাংক তখন ঐ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে ঋণ দেয়। এক্ষেত্রে ক্ষণের দায় গোষ্ঠীর সকল সদস্যের যৌথ দায়। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঋণের লেনদেন বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেষছ। অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনুস-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে এই ক্ষুদ্র ঋণ (microfinance) কার্যক্রম খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প। ভারত সরকার এই প্রকল্প চালু করে 1998-99 সালে। এই ব্যবস্থায় কৃষককে নগদ ঋণ, বিভিন্ন ভরতুকি, পেনশন, ভাতা ইত্যাদি প্রদানের জন্য প্রত্যেক কৃষককে একটি Kisan Credit Card (KCC) এবং ব্যাংকের একটি পাস বই তৈরি করে দেওয়া হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে এই প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্প পরিচালনা করে নাবার্ড। আর প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (PMJDY) প্রকল্পটি চালু হয় 2014 সালে। এর উদ্দেশ্য হল সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে আর্থিক পরিসেবা দেওয়া, তাদের ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা এবং আর্থিক সাহায্য, ঋণ ও বিমার সুযোগ করে দেওয়া। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই যোজনা খুবই দ্রুত প্রসার লাভ করেছে।

3.9 কৃষিপণ্যের বিপণন (Agricultural Marketing)

কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়কে বোঝানো হয়। যে ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য চূড়ান্ত ভোগকারীর কাছে পৌঁছায় তাকেই কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা বলে। এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে কৃষিপণ্যের একত্রীকরণ (assembling), কৃষিপণ্যের শ্রেণিবিন্যাস (Grading), কৃষিদ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ (processing), প্যাকিং (packing) অন্যত্র প্রেরণ (transpartation), ভাণ্ডারজাতকরণ (storing), বণ্টন (distribution) ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, কৃষি বিপণন ব্যবস্থা কথাটি বেশ

ব্যাপক। এক কথায় বলতে গেলে, কৃষি বিপণন ব্যবস্থা হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কৃষিপণ্যের উৎপাদকের সাথে চূড়ান্ত ভোগকারীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

যে- কোনো অর্থনীতিতে, বিশেষত ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে, কৃষি বিপণন ব্যবস্থা একাধিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমত,** কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত হলে কৃষি উৎপাদন বাড়ে। **দ্বিতীয়ত,** উন্নত বিক্রয় ব্যবস্থা কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্‌বৃত্ত (marketable surplus) বাড়াতেও সাহায্য করে। কোনো দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই বিক্রয়যোগ্য উদ্‌বৃত্তের গুরুত্ব অপরিসীম। **তৃতীয়ত,** কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গুদামজাতকরণ। এর দ্বারা কৃষিপণ্যের অপচয় কমানো যায়। **চতুর্থত,** কৃষিপণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় ব্যবস্থা কৃষিজাত দ্রব্যের দামের অস্থিরতা দূর করে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের দামের স্থায়িত্ব রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **পঞ্চমত,** কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত হলে খাদ্যশস্যের সুষম আঞ্চলিক বণ্টন ঘটে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। **ষষ্ঠত,** ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চাষি সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। এদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কৃষি উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম, কিন্তু সবার মিলে মোট কৃষি উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বেশি। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হলে এই ক্ষুত্র ক্ষুত্র অসংখ্য চাষির স্বল্প কৃতিষ উদ্বৃত্তগুলিকে সংগ্রহ করা যায়। আগেই বলেছি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই কৃষি উদ্বৃত্তের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **সপ্তমত,** কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হলে চাষি বেশি উৎপাদনে আগ্রহী হয়, সে ফসলের ন্যায় দাম পায়, তার ফসল বিক্রির খরচ কমে ইত্যাদি। এক কথায়, চাষির আয় বাড়ে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার তৈরি হয়। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এভাবেও দেশের শিল্পায়নে সাহায্য করে।

3.9.1 ভারতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা (Agricultural Marketing System in India)

ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের সাধারণত তিন ধরনের বাজার দেখা যায় : (i) গ্রামের হাট, (ii) খুচরা বাজার ও (iii) পাইকারি বাজার। কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে সপ্তাহে নির্দিষ্ট এক, দুই বা তিনদিন হাট বসে। এই হাটে সাধারণত স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের কেনাবেচা হয়। এছাড়া রয়েছে কৃষিপণ্যের বহুসংখ্যক খুচরা ও পাইকারি বাজার। সব বাজারে বিক্রয়পদ্ধতি একরকম (uniform) নয়। এছাড়া, উৎসব ও পুজোপার্বণ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে মেলা বসে। এই মেলাগুলিতে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে কৃষিপণ্যেরও কেনাবেচা চলে। আবার, গম, ধান প্রভৃতি খাদ্যাশস্যের ক্ষেত্রে অনেক সময় সরকার ঘোষিত দামে সরকারের নিকট বিক্রি করা হয়। সরকার সেই খাদ্যশস্য কিনে গুদামে মজুত করে রাখে এবং সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোগকারীকে বিক্রি করে। বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও এই মজুত খাদ্যশস্য ত্রাণ হিসাবে বিলি করা হয়। এছাড়া, সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমেও কৃষি পণ্যের ক্রয়বিক্রয় করা হয়। আবার কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য সরকার কিছু নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করেছে। সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে এই বাজারগুলিতে কৃষিপণ্যের কেনাবেচা হয়। এছাড়া, কিছু কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু আছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেও কৃষিপণ্যের কেনাবেচা চলে। আমরা এই ব্যবস্থাগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করবো।

1. কৃষিপণ্যের সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা (Co-operative Marketing of Farm Products) : এই ব্যবস্থায় কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের যাবতীয় দায়িত্ব চাষিরা নিজেরাই সমবায়ের ভিত্তিতে বহন করে। তাই একে

সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা বলে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল সদস্য চাষিদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, উৎপন্নফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক সদস্যদের মধ্যে ন্যায্য দামে বিক্রি করা, উন্নত কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে চাষিদের অবহিত করা প্রভৃতি। সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হলে চাষিদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ে, তারা ফসল ব্যবসায়ী বা দালালদের দ্বারা প্রতারিত হয় না, বিক্রয়সমিতি থেকে ঋণ পেলে তাদের বিপন্ন বিক্রয় (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত হয়ে অতি কম দামে ফসল বিক্রি করা) করতে হয়না, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে তারা জানতে পারে, সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ ন্যায্য দামে পেতে পারে ইত্যাদি। সমবায় বিক্রয় ব্যবস্তার এসমস্ত সুবিধা থাকার জন্য ভারতেও এই ব্যবস্থা প্রসারের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে এই ব্যবস্থা তেমন প্রসার লাভ করেনি। আমাদের সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এদের আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম। তাছাড়া সমবায়িক কাজকর্মে তাদের অভিজ্ঞতারও অভাব রয়েছে। সমবায়গুলিকে দক্ষ কর্মীর অভাব এবং তারে মধ্যে সমবায়িক ধ্যানধারণার প্রতি নিষ্ঠা কম। সর্বোপরি, সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির মধ্যে ধনী চাষিদেরই প্রাধান্য রয়েছে। ভারতে সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে এই সমস্ত ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে।

2. নিয়ন্ত্রিত বাজার (Regulated Market) : যে বাজারে ন্যায্য মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলি প্রবর্তন করা হয় এবং ঐ সকল নিয়মাবলির মাধ্যমে বিপণন কার্য সম্পাদিত হয়, সেই বাজারকে নিয়ন্ত্রিত বাজার বলে। এই বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য চাষি, ব্যবসায়ী, পঞ্চায়েত, স্থানীয় সমবায় বিক্রয় সমিতি এবং রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রার্থী নিয়ে বাজার কমিটি গঠন করা হয়। এই বাজার কমিটি নিয়ন্ত্রিত বাজার পরিচালনা করে। বাজার কমিটিগুলির প্রধান কাজ হল : বাজারে কৃষিপণ্য ক্রয়বিক্রয়ের নিয়মাবলি গঠন করা, বিক্রয়ের কাজে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য কমিশনের হার নির্ধারণ করা, স্থানীয় বাজারের কাজকর্মের সীমা নির্দিষ্ট করা, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পণ্য কেনাবেচার অনুমোদন দেওয়া, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনো বিবাদ হলে তা মেটানোর চেষ্টা করা, পণ্যের ওজনের ও মাপের তদারকি করা, চাষি-বিক্রেতাদের জন্য বিশ্রামাগার, জলের বন্দোবস্ত এবং গোরু রাখার জায়গার ব্যবস্থা করা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য মজুত ও শ্রেণিবিন্যাসের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

নিয়ন্ত্রিত বাজারে চাষির ফসল বিক্রির খরচ খুবই কম। সাধারণ বাজারে চাষি নানাভাবে প্রতারিত হয়। নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যবসায়ী, দালাল বা ফড়েদের সেই সুযোগ খুবই কম। বাজার কমিটি এমন কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে চাষির প্রতারিত হবার সম্ভাবনা কমে। সেই পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে হ'ল :

(i) ফসল কেনার সময় ফসলের পরিমাণ, দাম, কমিশন প্রভৃতি উল্লেখ করে চাষিকে রসিদ দিতে হবে।

(ii) পণ্যের মান, ওজন, ছাড় ইত্যাদি বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে তা বাজার কমিটিকে জানাতে হবে।

(iii) বাজার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ওজনদার দিয়ে ফসল ওজন করাতে হবে।

(iv) পণ্যটির দাম মাইক ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এর ফলে বাজারে পণ্যটির প্রচলিত দাম সম্পর্কে চাষি অবহিত হতে পারে।

একথায়, চাষি যাতে প্রতারিত না হয় তার জন্য নিয়ন্ত্রিত বাজারে বাজার কমিটি নজরদার (watchdog) হিসাবে কাজ করেন। ফলে এই বাজারে চাষিদের ঠকানোর সুযোগ ব্যবসায়ী, দালাল বা ফড়েরা বিশেষ পায়না।

ভারতে প্রথম নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হয় 1886 সালে তৎকালীন হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্সি অর্ডার-এর অধীনে .(Karanjia Cotton Market)। এরপর 1897 সালে মহারাষ্ট্রের বেরার-এ খাদ্যশস্য ও তুলোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত বাজার চালু হয়। 2010-11 সালে ভারতে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা ছিল 7,249 (সূত্র : shadhganga > bitstream)। 2018 সালের জানুয়ারি মাসে এই সংখ্যা 8,900-তে পৌঁছায়। এছাড়া, ভারতে রয়েছে 22,000 -এর মতো গ্রামীণ হাট যেগুলি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন বা দিনগুলিতে বসে। এদের প্রায় 15 শতাংশই (অর্থাৎ 5,300 টিক মতো) নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের অধীনে পরিচালিত হয়। তবে এখনও অনেক হাট ও গ্রামীণ বাজার, বিশেষত পার্বত্য ও উপজাতি এলাকার হাটবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজারের আওতার বাইরে। 2022 সালে ভারতে প্রায় 30,000 নিয়ন্ত্রিত কৃষি বাজার প্রয়োজন বলে একটি লোখায় দাবি করা হয় (সূত্র : down to earth.org.in)। যতদিন যাবে, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা আরো বাড়বে।

আমরা আগেই বলেছি যে, নিয়ন্ত্রিত বাজার কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী, দালাল ও ফড়েদের নানা অসাধু কার্যকলাপ দূর করতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি ঘটাতে এই নিয়ন্ত্রিত বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাই ভারতে নিয়ন্ত্রিত বাজারের আরও প্রসার দরকার। ভারতে কৃষি উৎপাদন ও কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। ফলে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সাধারণ বাজারের সংখ্যাও বেড়েছে, সেগুলিতে নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই বাজারগুলির কার্যপদ্ধতির উন্নতি ঘটাতে গেলে এদের জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হবে। তাছাড়া, নিয়ন্ত্রিত বাজার দেশের সর্বত্র সমান প্রসার লাভ করেনি। মূলত পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এই বাজার ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে। সরকারকে এ ব্যাপারেও দৃষ্টি দিতে হবে। নিয়ন্ত্রিত বাজারের উন্নয়নের জন্য কিছু রাজ্যসরকার 'কেন্দ্রীয় বাজার তহবিল' গঠন করেছে। বিশ্বব্যাংক এবং এর সহযোগী সংগঠন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association বা IDA) থেকে কিছু কিছু রাজ্য অর্থ সাহায্য পেয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও এধরনের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

3. গুদামজাতকরণ (Warehousing) : পণ্য সংরক্ষণের স্থান হল গুদাম। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যবর্তী সময়ে পণ্যকে সংরক্ষণ করাকেই বলা হয় গুদামজাতকরণ। কৃষিপণ্য গুদাম জাতকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। ফসল গুদামজাতকরণের নানা সুবিধা আছে। যেমন, এর ফলে ফসলের অপচয় বন্ধ হয়, মজুত করা শস্যের জামিনে চাষিরা ব্যাংক থেকে ঋণ পায়, চাষির দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে, ফসল জমার রসিদের হস্তান্তর দ্বারা সহজে পণ্যের কেনাবেচা করা যায় এবং তার ফলে চাষির ফসল কেনাবেচার খরচ কমে, ফসল গুদামজাতকরণের দ্বারা ঐ ফসলের দামের স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় ইত্যাদি। তাছাড়া, খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাদ্যশস্যের জোগান দেওয়া সম্ভব হয়। গুদামজাত খাদ্যশস্য এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণকার্য সফল করতে সাহায্য করে। ভারত সরকার তাই কৃষিজাত পণ্য গুদামজাত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

1950 সালে গ্রামীণ ব্যাংক অনুসন্ধান কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) কৃষিপণ্যের গুদামজাতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এরপর 1954 সালে সারাভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee) সমগ্র দেশে গুদাম ব্যবস্থা উন্নয়নের কর্মসূচি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। সেই সুপারিশ অনুযায়ী 1956 সালে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামঘর বোর্ড স্থাপন করা হয়। পরের বছর 1957 সালে সারা ভারত গুদামঘর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যেও গুদামঘর কর্পোরেশন

স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া, বহু হিমঘরও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত সংরক্ষণের জন্য। আবার, খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন (Food Corporation of India বা FCI) স্থাপন করা হয়েছে 1965 সালে। বর্তমানে ভারতের ফুড কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন, রাজ্য গুদামঘর কর্পোরেশন এবং সমবায় বিক্রয় সমিতির সম্মিলিত পণ্য মজুত ক্ষমতা বাস্তবিকই বিপুল। এছাড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কিছু রাজ্যে শস্য ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। এসবের ফলে ভারতের কৃষিপণ্যের মজুত ক্ষমতা যথেষ্ট বেড়েছে। এছাড়া, এসবের পাশাপাশি রয়েছে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে নির্মিত ছোটো-বড়ো আকারের বহু বেসরকারি গুদাম।

এসবের ফলে ভারতে শস্য মজুত করার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়েছে। তবে শস্য মজুত করার প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক ক্ষেত্রে অদক্ষ। এদের পরিচালন পদ্ধতিও আমলাতান্ত্রিক ধরনের। এ ছাড়া, শস্য মজুত করার ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতিও আছে। কৃষিপণ্য গুদামজাত করণের সুফলগুলি ভোগ করতে হলে এসমস্ত ত্রুটি সর্বাগ্রে দূর করতে হবে। দক্ষতার অভাবে অনক সময় মজুত করা শস্য নষ্ট হয় এবং তা ফেলে দিতে হয়। তা ছাড়া, অনেক সময় বাজার দামের বেশি দাম দিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ফসল কিনে সরকারি গুদাম পূর্ণ করা হয়। এতে জনগণের করের টাকার অপচয় হয়। সরকারকে এসমস্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই শস্য গুদামজাতকরণের সুফল ভোগ করা যাবে।

4. সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System বা PDS) : কোনো দেশের সরকার যখন খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে সেগুলি কম দামে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে, তাকে সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা বলে। এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হ'ল : দেশের দারিদ্র্য দূর করা, জনসাধারণের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ করা, দরিদ্রদের অপুষ্টি থেকে রক্ষা করা, খাদ্যশস্যের বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার লক্ষ্যে ভারত সরকারও এরূপ গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) চালু রেখেছে। সরকার বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনে এবং লেভি-র মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে মজুত করে। সেই খাদ্যশস্য ন্যায্যমূলের দোকানের মাধ্যমে তা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে।

ভারত সরকারের এই গণবন্টন ব্যবস্থার নানা ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে। সেগুলি হল :

(i) কম সংখ্যক দরিদ্রই এই ব্যবস্থায় উপকৃত হয়েছে।

(ii) দরিদ্ররা অনেক সময়ই ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে ভোগ্যদ্রব্য কিনতে পারেনি।

(iii) ডালশস্য দরিদ্রদের পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস। কিন্তু ডালশস্য বণ্টনের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

(iv) অনেক সময়ই বণ্টিত দ্রব্যসামগ্রীর গুণমান ভালো নয়।

(v) বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে নানা দুর্নীতির ফলে দরিদ্রদের কাছে খুব অল্প পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী পৌঁছেছে।

এইসব ত্রুটির জন্য ভারত সরকার বর্তমানে লক্ষ্যভিত্তিক সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা (Targeted public Distributilon System বা TDPS) চালু করেছে। এই ব্যবস্থায় সবাইকে রেশনের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী না দিয়ে দারিদ্র্য সীমার নীচে (Below Poverty Line বা BPL) নীচে থাকা পরিবারদের ডাল ও গম খুব কম দামে সরবরাহ করা হচ্ছে দারিদ্র্য সীমার উপরে (Above Poverty Line বা APL) থাকা পরিবারদের জন্য বরাদ্দ তুলনায় অনেক কম। এছাড়া, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় (Antyodaya Anna Yojana বা AAY) সমাজের দরিদ্রতমদের নামমাত্র মূল্যে চাল অথবা গম দেওয়া হচ্ছে। লক্ষভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হল

সঠিক দরিদ্রদের শনাক্ত করা। তা ছাড়া এই ব্যবস্থার ফলে সরকারের ভরতুকি ব্যয় খুব বেড়ে গেছে।

5. কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading in Form Pruducts) : কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণন ব্যবস্থার একটি অন্যতম উপাদান হল কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হল দুটি। **প্রথমত,** প্রকৃত চাষিরা যাতে কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম পায় তার ব্যবস্থা করা। **দ্বিতীয়ত,** চূড়ান্ত ভোগকারী যাতে কৃষিপণ্য কম দামে পায় সেটি নিশ্চিত করা। কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কিছু সুফল আছে। যেমন, এর ফলে ফড়ে, দালাল প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর অপসারণ ঘটে। প্রকৃত চাষি ও সরকারের মধ্যে এবং চূড়ান্ত ভোগকারী ও সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এছাড়া, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজি ও ফাটকাবাজি বদ্ধ হবে। সর্বোপরি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে উদ্বৃত্ত শস্য (যাকে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বা marketable surplus বলা হয়) ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হবে। তবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সফল হতে গেলে সরকারের দক্ষ ও সৎ প্রশাসন দরকার। তাছাড়া, সরকারের বিপুল লোকবল ও অর্থবল থাকতে হবে। বিপুল পরিমাণ ফসল মজুত করার ক্ষমতাও সরকারের থাকতে হবে। ভারত সরকারও কিছু কিছু কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করেছে। এই উদ্দেশ্যে 1956 সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation বা STC) গঠিত হয়। খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন (Food Corporation of India বা FCI) গঠিত হয় 1965 সালে। 1969 সালের এপ্রিল মাস থেকে এই কর্পোরেশন খাদ্যশস্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র এজেন্সি হিসাবে কাজ শুরু করে। এটি বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রাণকার্য চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আপৎকালীন মজুত (buffer stock) বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

তবে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে ভারত সরকারের নানা ব্যর্থতাও আছে।

সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

(i) খাদ্যশস্যের বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

(ii) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দ্বারা চাষিকে ফসলের উপযুক্ত দাম দিতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এরজন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ, লোকবল এবং ফসল মজুত ক্ষমতা দরকার, সরকারের তা নেই।

(iii) সরকারি বণ্টন ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। ফলে চূড়ান্ত ভোগকারীর কাছে কমদামে খাদ্যশস্য পৌঁছে দিতেও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যর্থ হয়েছে।

(iv) খাদ্যশস্যের বাণিজ্যে সরকার প্রায়শই লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

(v) নানারকমের প্রশাসনিক দুর্নীতি ঘটেছে। অনেক সময় বাজার দামের বেশি দাম দিয়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনে মজুত করা হয়েছে। অনেক সময় নিম্নমানের খাদ্যশস্যও মজুত করা হয়েছে। পরে সেগুলি ফেলে দিতে হয়েছে।

এসমস্ত ব্যর্থতার কথা বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে ভারত সরকারের সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

6. আগাম কেনাবেচা (Forward trading) : যখন ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের ডেলিভারি পেতে চায় এরূপ ক্রেতারা এবং ওই সময়ে দ্রব্যটি ডেলিভারি দিতে চায় এরূপ বিক্রেতারা বর্তমান দরে ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট দিনে দ্রব্যটি কেনাবেচার চুক্তি করে তখন তাকে আগাম কেনাবেচা বলে। বর্তমান দরে

ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট দিনে মাল কেনাবেচার এই চুক্তিকে আগাম চুক্তি (forward contract) বলে। আগাম কেনাবেচাকে আগাম লেনদেন (forward transactions) বা ভবিষ্যত কেনাবেচাও (future trading) বলা হয়।

ভারতে পাট, তুলো, চিনাবাদাম প্রভৃতি কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এরূপ আগাম কেনাবেচাও হয়ে থাকে। কৃষিপণ্যের আগাম কেনাবেচার ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা হল অতিরিক্ত ফাটকাবাজি। কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ফাটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করতে 1953 সালে আগাম বাজার কমিশন (forward Market Commission) গঠন করা হয়। এই কমিশন বেশ কছু সংখ্যক কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে আগাম চুক্তি নিষিদ্ধ করেছে এবং পাট, তুলো, চিনাবাদাম প্রভৃতি তেরোটি কৃষিদ্রব্যের ক্ষেত্রে চুক্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে।

3.9.2 ভারতে কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of Agricultural Marketing in India)

ভারতে কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি বিদ্যমান। এই ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

(i) গ্রামের চাষিরা দূরের হাটেবাজারে বা শহরে গিয়ে ফসল বিক্রি করতে পারে না। রাস্তাঘাটের অভাব, কৃষকের দারিদ্র্য, যানবাহনের অভাব প্রভৃতি হল এর প্রধান কারণ। ফলে এই চাষিরা গ্রামের ফড়ে বা দালালদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। এতে চাষিরা নানাভাবে প্রতারিত হয়।

(ii) অভাবের তাড়নায় অনেক সময় চাষি ফসল ওঠার অব্যবহিত পরেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তখন ফসলের দাম খুব কম থাকে। একে "বিপন্ন বিক্রয়" (distress sale) বলে।

(iii) গ্রামের বাজারে সাধারণত এক-দু'জন ফসল কেনে। ফলে ক্রেতা হিসাবে তারা একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে। আবার, ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশি হলেও তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নেয়। এভাবেও তারা নিজেদের একচেটিয়া সুবিধা বজায় রাখে। চাষিকে ফসলের কম দাম দিয়ে তাদের শোষণ করে।

(iv) ভারতে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্য প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। নিয়ন্ত্রিত বাজারে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন থাকায় সেখানে চাষিকে ঠকানোর কম। সাধারণ বাজারে ফসল বিক্রির সময় চাষি নানাভাবে প্রতারিত হয়।

(v) অনিয়ন্ত্রিত বাজারে চাষিকে নানাভাবে হয়রানির শিকার, হতে হয়। নানারকম চাঁদা, ওজনের চলতা ইত্যাদির অজুহাতে ফসলের একটা অংশ কেটে নেওয়া হয়। এসব জুলুমবাজির জন্য চাষি বাজারে এসে ফসল বিক্রিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

(vi) ভারতে সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলিও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। এদের আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত। তাছাড়া, সমবায়গুলিতে ধনী চাষিদের প্রাধান্য রয়েছে। ফলে তারাই সমবায় বিক্রয় সমিতির সুবিধাগুলি ভোগ করেছে। ক্ষুদ্র ও আর্থিকভাবে দুর্বল চাষিরা সমবায়ের সুবিধা বিশেষ পায়নি।

(vii) ফসলের উপযুক্ত দাম পেতে গেলে উৎপন্ন ফসলের গুণগতমান অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা (grading) প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফসলের এরূপ শ্রেণিবিন্যাস করা হয়না। অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের গুণগতমানের পার্থক্য এত বেশি যে তাদের দুটি বা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় না। এর ফলেও চাষি ফসলের উপযুক্ত দাম পায়না।

(viii) ভারতে ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা অপ্রতুল। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম বা হিমঘর ভারতে নেই। ফলে চাষিরা ফসল তোলার পরেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফসলের জোগান তার ফলে বাড়ে এবং দাম কমে। চাষি

ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ix) ফসলের দাম সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য চাষির কাছে থাকে না। ফলে গ্রামের মহাজন, ফড়ে এবং দালালরা ফসেলর যে বাজারদাম বলে, চাষি সেই দামেই ফসল বেচতে বাধ্য হয়। এভাবে দাম সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যের অভাবেও চাষি ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়।

3.9.3 কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারি ব্যবস্থা (Government Measures for Improving the Agricultural Marketing System)

ভারতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার নানা ত্রুটি বর্তমান। সেই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য ভারত সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সংক্ষেপে সেই ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ :

1. সারা ভারতে গুদাম নিগমের মাধ্যমে শহর ও মান্ডিতে গুদাম স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ভারতে উল্লেখযোগ্য কৃষিদ্রব্য মজুত সংস্থা হল FCI বা Food Corporation of India, SWCs বা State Warehousing Corporation, NCDC বা National Co-operative Development Corporation এবং CWC বা Central Warehousing Corporation, সমবায় সংস্থা এবং ব্যক্তি মালিকানায় গুদামসমূহ।

2. কৃষিপণ্যের গুণগতমান নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুণগত দিক থেকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ দ্রব্যগুলিকে AGMARK (Agricultural Marketing) চিহ্ন দেওয়া হয়।

3. বাজার মূল্য সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার জন্য বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দাম বেতার ও সংবাদপত্রমারফৎ প্রচার করা হচ্ছে।

4. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করা হচ্ছে। এই সমস্ত বাজারের বিপণন কমিটির কাজ হল দালালির পরিমাণ স্থির করা, সঠিক ওজন এবং মাপ নিশ্চিত করা, দ্রব্য কেনাবেচার ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ থাকলে তা নিষ্পত্তি করা প্রভৃতি।

5. কৃষিপণ্যের বাজারে যাতে ফাটকা কারবার বৃদ্ধি না পায়, তার জন্য আগাম বাজার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে আগাম চুক্তি বাতিল অথবা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

6. কৃষিপণ্যের বিপণনের উন্নতির জন্য সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য বিপণন ও পরিদর্শন ডাইরেক্টরেট স্থাপন করা হয়েছে। এর প্রধান কাজ হল কৃষিপণ্যের বাজার সম্পর্কে সমীক্ষা করা এবং নিয়ন্ত্রিত বাজার তদারকি করা।

7. কৃষিপণ্যের দামের স্থায়িত্ব রক্ষা করার জন্য কৃষি ব্যয় ও মূল্য কমিশন (Commission for Agricultural Costs and Prices বা CACP) গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন প্রতি বছরই প্রতিটি শস্যের জন্য একটি করে ন্যূনতম মূল্য ঘোষণা করে থাকে। সরকার চেষ্টা করে যাতে সেই সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে বাজার মূল্য না নামে। বাজার মূল্য যখন ওই ঘোষিত মূল্যের কম হয় তখন সরকার ওই ঘোষিত মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে শস্য কেনে। একে সহায়ক মূল্য (support price) বলা হয়। চাষির চাষর খরচ যেন পুণের হয়, তাই এই সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য চাষিকে দেওয়া হয়। একে সর্বনিম্ন পরিপোষণ মূল্যও (minimum support price বা MSP) বলা হয়।

8. চায়ের বিপণনের উন্নতির জন্য সরকার চা পর্ষদ (Tea Board) এবং কফির জন্য কফি পর্ষদ (Coffee Board) গঠন করেছে।

9. কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর প্রসারের দায়িত্বে রয়েছে National co-operative Development Corporation বা NCDC। ভারতে তিন স্তরের সমবায় বিক্রয় সমিতি লক্ষ করা যায় : সর্বোচ্চস্তরে রয়েছে রাজ্য বিপণন সমিতি, মধ্যস্তরে রয়েছে জেলাভিত্তিক কেন্দ্রীয় সমবায় বিপণন ফেডারেশন এবং সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে প্রাথমিক বিপণন সমিতি। 2015 সালে সব ধরনের সমবায় বিপণন সমিতির সংখ্যা ছিল 6,095টি। কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এই সমবায় বিপণন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় স্তরে রয়েছে National Agricultural Co-operative Marketing Federation (NAFED)।

10. কৃষিপণ্যের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হয়েছে।

11. চাষিরা যাতে সহজ শর্তে ঋণ পায় তার জন্য প্রাথমিক কৃষিণদান সমিতি (Primary Agricultural Credit Societies বা PACs) স্থাপন করা হয়েছে। আবার, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ফসলি বিক্রিতে সাহায্য করার জন্য কৃষি সেবা সমবায় গঠন করা হয়েছে।

12. কৃষিপণ্যের ক্রয়বিক্রয় দ্রুত ও স্বচ্ছ করতে 2016 সালের 14 এপ্রিল চালু করেছে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা। কর্মসূচিটির নাম National Agricultural Market (e-NAM)। কৃষি পণ্যের বিপণনে এই ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

13. কিছু কিছু রাজ্যে শস্য ব্যাংক কিছু ফসলের ক্ষেত্রে শস্যবিমা এবং কিছু কৃষিপণ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা হয়েছে।

14. দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার পরিবহণের নানা উন্নতি ঘটিয়েছে এবং ঘটিয়ে চলেছে। রেল ও সড়ক পরিবহণের উন্নতি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলেও কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

3.9.4 কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থার মূল্যায়ন (An Evaluation Government Measures towards Agriculture Marketing)

ভারতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হল ঃ ফসল সংরক্ষণ ও মজুত করার জন্য বহুসংখ্যক গুদাম ও হিমঘর স্থাপন করা হয়েছে, কৃষিপণ্যের গুণগতমান নির্ণয় এবং শ্রেণিবিন্যাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কৃষিপণ্যের দামের নিয়মিত ঘোষণা ও প্রচার করা হয়, দেশের বন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বাজার গড়ে তোলা হয়েছে, কৃষিপণ্যের কেনাবেচায় ফাটকা বাজি নিয়ন্ত্রণ করতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, খাদ্যশস্যের দামের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃষিপণ্যের ব্যয় ও মূল্য কমিশন গঠন করা হয়েছে, দেশের বহু অঞ্চলে সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা হয়েছে, কৃষিপণ্যের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, চাষিদের সহজশর্তে ঋণদানের জন্য কৃষি ঋণদান সমিতি গড়ে তোলা হচ্ছে, কৃষিপণ্যের কেনাবেচা দ্রুত ও স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হচ্ছে ইত্যাদি।

কিন্তু এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতের কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। ভারতের কৃষকদের মধ্যে ৪০ শতাংশ বা তার বেশি হল ছোটো ও প্রান্তিক চাষি। এরা সরাসরি পাইকারি বাজারে বা বাজার কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বাজারে তাদের ফসল বিক্রি করতে পারে না। এছাড়া, সমবায় বিক্রয় সমিতির প্রসার দেশের সর্বত্র ঘটেনি। কোনো কোনো রাজ্যে, যেমন, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাটে এই সমবায় সংস্থাগুলি যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। এই রাজ্যগুলিতে সমবায় মারফত উৎপন্ন ফসলের 75 শতাংশ বিক্রি হয়। কিন্তু সমস্ত রাজ্যে সমবায় বিক্রয় সমিতির এরূপ প্রসার ঘটেনি। এছাড়া, এই সমিতিগুলির পরিচালন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। অনেক সমিতির আয়তন ও কাজকর্ম অর্থনৈতিক দিক থেকে অলাভজনক। অনেক সমিতির আর্থিক সঙ্গতিও কম। ফলে এরা বৃহদায়তনের কাজকর্মের সুবিধা ভোগ করতে পারেনা। তাছাড়া, অধিকাংশ সমবায় বিক্রয় সমিতিতে বড় ও ধনী চাষিদেরই প্রাধান্য। এগুলির পরিচালন ব্যবস্থা ধনী চাষিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে এই সমস্ত সমবায়গুলি ধনী চাষিদের স্বার্থই বেশি করে দেখেছে। ছোটো ও দুর্বল চাষিরা সমবায় বিক্রয় সমিতির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়নি।

সরকারের সহায়ক মূল্য ঘোষণার নীতি ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফড়ে ও দালালরা এক্ষেত্রেও নানাভাবে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ভাবে প্রবেশ করে এবং চাষিকে নানাভাবে প্রতারিত করে। এক্ষেত্রে ছোটো চাষিরাই বেশি প্রতারিত হয়। আসলে সহায়ক মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল কেনার ক্ষমতা সরকারের নেই। দালাল ও ফড়েরা সেই সুযোগ নিয়ে চাষিকে প্রতারিত করে।

ফসলের ওজন ও পরিমাপ নিয়ে এখনও নানা ধরনের দুর্নীতি চলে। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম। ফলে অনেক সদস্যই এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। কৃষিপণ্য বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দুটি প্রধান বিষয় হল নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন এবং সমবায় বিপণন সমিতির প্রসার। এই দুটির কোনোটিতেই আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। ফলে ভারতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। এ ব্যাপারে সরকারের আরও তৎপরতা গ্রহণ করা দরকার। তাছাড়া, কৃষিপণ্যের সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করতে হবে। National Agricultural Market (e-NAM) কর্মসূচিকে আরো প্রসারিত করতে হবে। এছাড়া, সমবায় বিক্রয়সমিতির কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তবেই তারা সদস্য চাষিদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারবে। আর, কৃষিপণ্যের বাজার ও দান সম্পর্কে সরকারকে অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালাতে হবে। তার ভিত্তিতে কৃষিপণ্যের বিপণন সম্পর্কে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং তার প্রয়োগ করতে হবে।

3.10 সারাংশ (Summary)

1. ভারতের কৃষিক্ষেত্র : ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। **প্রথমত,** 2020-21 সালে কৃষিসহ প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল 16.4 শতাংশ যা উন্নত দেশগুলির তুলনায় যথেষ্ট বেশি। **দ্বিতীয়ত,** বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী 2019 সালে ভারতে মোট কর্মরত জনসংখ্যার 43 শতাংশ ছিল কৃষিতে নিযুক্ত। **তৃতীয়ত,** ভারতের শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করে কৃষি, যেমন, চটকলের জন্য পাট, বস্ত্র শিল্পের জন্য তুলো, চিনি শিল্পের জন্য আখ প্রভৃতি। চতুর্থত, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কৃষির অবদান অনেকখানি। আমাদের রপ্তানি দ্রব্যের একটা বড় অংশই হল কৃষিজাত দ্রব্য। পঞ্চমত,

ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও কৃষির অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় অংশই কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

2. ভারতীয় কৃষির সমস্যা বা বৈশিষ্ট্য : ভারতীয় কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—

অনেক ক্ষেত্রেই সাবেকি বা প্রাচীন কৃষিপদ্ধতি, প্রকৃতির উপর অতি নির্ভরশীলতা, স্বল্প উৎপাদনশীলতা, ক্ষুদ্র আয়তনের জোত, জমির মালিকানার অসম বণ্টন, কৃষিতে ব্যাপক বেকারত্ব, ভূমি ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নের প্রতিকূল, বাণিজ্যিক ফসলের চাষ তুলনামূলকভাবে কম প্রভৃতি।

3. ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার সমস্যা : ভারতীয় কৃষির প্রথম ও প্রধান সমস্যা হল এর স্বল্প উৎপাদনশীলতা। এর পিছনে সাধারণ কারণগুলি হল— কৃষিতে জনসংখ্যার অত্যাধিক চাপ, খণ্ডীকৃত ও অসংবদ্ধ কৃষি জোত, কৃষকদের শিক্ষার অভাব প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠানগত কারণগুলি হ'ল— জোতের ক্ষুদ্র আয়তন, দুর্বল প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা, প্রজাদের চাষের অধিকার না থাকা প্রভৃতি।

প্রযুক্তিগত কারণগুলি হল— সেকেলে প্রযুক্তি, জলসেচের অভাব প্রভৃতি। কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলে খাদ্য ঘাটতি মেটাতে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। তাছাড়া কৃষকের আয় সীমিত হওয়ার জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারও সীমিত। কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হ'ল— কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ কমাতে অকৃষি ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষিতে প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের চেষ্টা, কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি।

4. ভারতে সবুজ বিপ্লব : 1960-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতীয় কৃষিতে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ ও জলসেচের প্রসার ঘটিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর এক ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এর ফলে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ে। একেই অনেকে **সবুজ বিপ্লব** বা কৃষির নয়া কৌশল বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ একে বীজ-সার-জল কৌশল বলেও আখ্যা দিয়েছেন। তবে সবুজ বিপ্লব গমের ক্ষেত্রে যতটা সফল হয়েছে, ধান, তৈলবীজ, ডাল প্রভৃতির ক্ষেত্রে ততটা সফল হয়নি। নতুন প্রযুক্তির ফলে দেশে খাদ্যশস্যের সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। তবে কর্মসংস্থানের উপর এর প্রভাব নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এছাড়া, নতুন কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে গ্রামাঞ্চলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভারতে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ না করে এধরনের কৃষি প্রযুক্তি গ্রামীণ ভারতে শ্রেণি সংঘর্ষ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে।

5. ভারতে ভূমি সংস্কার : ভূমি সংস্কার বলতে প্রধানত দুটি বিষয়কে বোঝায় ঃ (i) জমির পুনবণ্টন অর্থাৎ জমির মালিকানা স্বত্বের সংস্কার এবং (ii) জমির প্রজাস্বত্ত্বের সংস্কার। স্বাধীনতার পর ভারতে যে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়, তার উপাদানগুলি হল ঃ (i) মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসাণ, (ii) প্রজাস্বত্বের সংস্কার, (iii) জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, (iv) বিক্ষিপ্ত জোতগুলির একত্রীকরণ এবং (v) সমবায় চাষ ব্যবস্থার প্রসার। বাস্তবে অবশ্য ভূমিসংস্কার কর্মসূচির পূর্ণ রূপায়ণ হয়নি।

6. ভারতে গ্রামীণ ঋণ : কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, কৃষকের ভোগব্যয় মেটানো, বীজ, সার, ওষুধ ইত্যাদি ক্রয়, জমির উন্নতি ঘটানো ইত্যাদি নানা কারণে কৃষি ঋণের প্রয়োজন হয়। মেয়াদ অনুসারে কৃষি ঋণকে স্বল্পমেয়াদি, মাঝারি মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। আবার, ঋণের উৎস অনুসারে কৃষি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ভারতে কৃষি ঋণ বা গ্রামীণ ঋণের সমস্যাগুলি

হল : প্রয়োজনের তুলনায় ঋণের জোগান কম, চাষি সময়মতো ঋণ না পাওয়া, কৃষিতে অনেক প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে আগ্রহী নয়, কৃষি ঋণের বড় অংশ অনুৎপাদনশীল ঋণ, অ-প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি-ঋণের সুদের হার খুব বেশি ইত্যাদি। কৃষি ঋণের সমস্যা দূর করার জন্য ভারত সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলি হল ঃ রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক কৃষিঋণের জন্য পৃথক বিভাগ খোলা, ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে জাতীয়করণ করে স্টেট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং এর দ্বারা কৃষি ঋণের প্রসার, রাজ্য স্তরে জমি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপন, ত্রি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ঋণদান কাঠামো গঠন, প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করে গ্রামীণ ঋণ প্রসারের চেষ্টা, 1975 সালে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানকারী সর্বোচ্চ আর্থিক সংস্থা হিসাবে 1982 সালে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক বা নাবার্ড প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। কিন্তু এতসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারতে গ্রামীণ ঋণের সমস্যা বিশেষ মেটেনি। সমবায় সমিতি, নাবার্ড এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির ঋণের অনাদায়ী অংশ ক্রমাগত বাড়ছে। চাষি ঋণের অর্থ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করে ফেলছে। সমস্ত রাজ্যে সমবায় আন্দোলন সমভাবে প্রসারিত হয়নি। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানে তেমনভাবে এগিয়ে আসেনি। এসবের ফলে গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্রে মহাজন, জোতদার প্রভৃতিদের প্রাধান্য এখনও যথেষ্ট বেশি। ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি এদের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি।

7. ভারতে কৃষি পণ্যের বিপণন : ভারতে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। রাস্তাঘাটের অভাব, কৃষকের দারিদ্র্য, যানবাহনের অভাব ইত্যাদি কারণে চাষি গ্রামের ফড়ে বা দালালের কাছে কমদামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলি হল ঃ (i) সারা ভারত গুদাম নিগম স্থাপন, (ii) কৃষিজাত দ্রব্যের গুণগতমান নির্ণয় ও শ্রেণিবিন্যাসের ব্যবস্থা, (iii) বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দাম ঘোষণা, (iv) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বাজার গড়ে তোলা, (v) সমবায় বিক্রয় সমিতির স্থাপন, (vi) কৃষিপণ্যের ব্যয় ও মূল্য কমিশন গঠন, (vii) কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা, (viii) সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা, (ix) কিছু কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন প্রভৃতি।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতে বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হয়নি। আসলে গৃহীত ব্যবস্থাগুলির নানা সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির আর্থিক সামর্থ্য কম, তাদের দক্ষ কর্মীর অভাব, এই সমিতিগুলিতে বড় চাষিদের প্রাধান্য প্রভৃতি। এছাড়া, নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম, সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়, কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ, লোকবল ও দক্ষ প্রশাসকের অভাব প্রভৃতি।

3.11 অনুশীলনী (Exercise)

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer-type Questions)**

১. প্রচ্ছদ বেকার কাকে বলে?

২. ভূমি সংস্কার বলতে কী বোঝায়?

৩. ভারতে সবুজ বিপ্লব কাকে বলে?

৪. ভারতে ভূমি সংস্কারের কার্যক্রমগুলি কী কী?

৫. কোন্ শস্যের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের অবদান সবচেয়ে বেশি?

৬. HYV-র পুরো কথাটি কী?
৭. সবুজ বিপ্লবকে বীজ-সার-জল বিপ্লব বলা হয় কেন?
৮. কাকে সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়?
৯. ভারতীয় কৃষির প্রধান সমস্যা কী?
১০. ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য কাকে বলে?
১১. ভারতে ভূমি সংস্কারের জন্য গৃহীত দুটি ব্যবস্থার উল্লেখ কর।
১২. সবুজ বিপ্লবের তিনটি মূল স্তম্ভ কী কী?
১৩. সময় বা মেয়াদ অনুসারে কৃষিঋণকে ক'ভাগে ভাগ করা হয় ও কী কী?
১৪. উৎস অনুসারে কৃষি ঋণকে ক'ভাগে ভাগ করা হয় ও কী কী?
১৫. ভারতে কৃষিঋণের কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ কর।
১৬. কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?
১৭. নিয়ন্ত্রিত বাজার কাকে বলে?
১৮. আগাম কেনাবেচা কাকে বলে?
১৯. NAFED-এর পুরো নাম কী?
২০. পুরো নাম বল : FCI, PDS, TPDS এবং AAY.
২১. কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কাকে বলে?
২২. APL ও BPL -এর পুরো কথাগুলি কী কী?
২৩. সহায়ক মূল্য কাকে বলে?
২৪. সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা কাকে বলে?
২৫. NABARD-এর পুরো নাম কী?
২৬. আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক এবং NABARD কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
২৭. মরশুমি বেকারত্ব কাকে বলে?
২৮. সবুজ বিপ্লব কোন্ কোন্ রাজ্যে বিশেষভাবে সফল হয়েছে?

■ মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium Answer-type Questions)

১. ভারতীয় কৃষির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
২. ভারতীয় কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার সাধারণ কারণগুলি উল্লেখ করো।
৩. ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদনশীলতা কম হবার পিছনে প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলি কী কী?
৪. ভারতে সবুজ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
৫. কর্মসংস্থানের উপর সবুজ বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করো।
৬. কৃষি উৎপাদনের উপর সবুজ বিপ্লবের ফলাফল বিচার করো।
৭. ভারতে ভূমি সংস্কারের প্রধান কর্মসূচিগুলি উল্লেখ করো।

৮. ভারতে ভূমি সংস্কারের অগ্রগতির মূল্যায়ন করো।
৯. ভারতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থার উল্লেখ করো।
১০. কৃষিঋণ সরবরাহের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থা বর্ণনা করো।
১১. ভারতে গ্রামীণ ঋণের দুটি প্রধান সমস্যার উল্লেখ কর।
১২. কৃষি পণ্যের বিপণন বলতে কী বোঝায়?
১৩. ভারতে কৃষিবিপণের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থার মূল্যায়ন করো।
১৪. কৃষি ঋণের জামিনের প্রকৃতি অনুসারে কৃষিঋণকে ক'ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
১৫. ভারতীয় কৃষিতে স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলাফল বর্ণনা করো।

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long Answer-type Questions)**

১. ভারতীয় কৃষির সমস্যা বা বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
২. ভারতীয় কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণগুলি আলোচনা করো।
৩. ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি বর্ণনা কর।
৪. ভারতের সবুজ বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।
৫. ভারতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বর্ণনা করো।
৬. ভারতে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়ণ করো।
৭. ভারতে গ্রামীণ ঋণের সমস্যা বর্ণনা করো।
৮. গ্রামীণ ঋণের সমস্যা দূর করতে ভারত সরকার গৃহীত ব্যবস্থাদি উল্লেখ করো।
৯. ভারতের কৃষি বিপণন ব্যবস্থা বর্ণনা করো।
১০. কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলি বর্ণনা করো।

3.12 গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : ভারতীয় অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
২. Srakhel, Jaydeb & Seikh Salim (2010) : Economics Principles and Indian Economic Problems, Book Syndicate (P) Ltd. Kolkata.
৩. Puri, V. K. & S. K. Misra (2020) : Indian Economy, Himalaya Publishing House, Mumbai.
৪. Datt, Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : Indian Economy, S. Chand and Company Limited, New Delhi.
৫. সেখ সেলিম (2011) : ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

একক-4 ❑ ক্ষেত্রগত গতিপ্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ - II

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 প্রস্তাবনা

4.3 ভারতের শিল্প ও সেবা ক্ষেত্র

4.4 সংস্কার-পূর্ববর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি

1965-85 সময়কালে ভারতে শিল্প-মন্থরতার কারণসমূহ

4.5 সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি

4.6 ভারতে সরকারি ক্ষেত্র

4.4.1 ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের সাফল্য

4.4.2 ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা

4.4.3 ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের বিলগ্নিকরণ

4.4.4 ভারতে বিলগ্নিকরণের যৌক্তিকতা

4.7 ভারতে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ **(MSME)**

4.7.1 ভারতীয় অর্থনীতিতে **MSME**-র ভূমিকা ও গুরুত্ব

4.7.2 ভারতে **MSME**-র সমস্যাবলি

4.7.3 **MSME**-র সমস্যা দূর করতে সরকারি ব্যবস্থা ও আর মূল্যায়ন

4.8 ভারতে সেবাক্ষেত্র

4.9 সংস্কার পূর্ববর্তীকালে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতি

4.9.1 ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার : নরসিংহম কমিটির প্রতিবেদন

4.9.2 নরসিংহম কমিটির সুপারিশের মূল্যায়ন

4.9.3 সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতি

4.10 বিমার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

4.11 ভারতে বিমা ক্ষেত্রের অগ্রগতি

4.11.1 আর্থিক সংস্কারের পূর্ববর্তী সময়ে ভারতে বীমা ক্ষেত্রের অগ্রগতি

4.11.2 সংস্কার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ **1991** সালের পর ভারতে বিমা ক্ষেত্রের অগ্রগতি

4.12 ভারতের বীমা ক্ষেত্রের সংস্কার : মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ

4.13 সারাংশ

4.14 অনুশীলনী

4.15 গ্রন্থপঞ্জি

4.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে—

- সংস্কার-পূর্ববর্তী ও সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি
- ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা
- ভারতে বিলগ্নিকরণ ও তার যৌক্তিকতা
- ভারতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সমস্যাগুলি এবং তার দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা
- সংস্কার পরবর্তীকালে ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সংস্কার ও অগ্রগতি
- ভারতের বিমা ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক সংস্কার ও অগ্রগতি

4.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের তিনটি মুখ্য বিভাজন বা ভাগ করা হয় : কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং সেবাক্ষেত্র। আগের এককে আমরা ভারতের কৃষিক্ষেত্র নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি। বর্তমান এককে ভারতের শিল্পক্ষেত্র এবং সেবাক্ষেত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু থেকে (1950-51) বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের শিল্পক্ষেত্র কেমন প্রসার লাভ করেছে, তা আমরা বিচার করব। ভারতের শিল্পের উন্নতিতে এক সময় সরকারি ক্ষেত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে অবশ্য সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা অনেকটাই কমেছে। বর্তমান এককে আমরা ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা, এর সাফল্য ও ব্যর্থতা, এই ক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সবই আলোচনা করা হবে। 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি ক্ষেত্র বনাম বেসরকারি ক্ষেত্র নিয়ে নানা বিতর্কও একসময় খুবই জোরদার হয়েছিল। বর্তমান এককে এই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করা হবে। এছাড়া, ভারতের ন্যায় জনবহুল এবং বেকার সমস্যায় পীড়িত দেশে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব খুবই বেশি। ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয়তা, এদের সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানে সরকারি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে। কৃষি ও শিল্পের পর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের তৃতীয় ক্ষেত্রটি হল সেবাক্ষেত্র। এই সেবাক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতের সেবাক্ষেত্রটির গুরুত্বও জাতীয় অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান। আমরা অবশ্য সমগ্র সেবাক্ষেত্র বিবেচনা না করে শুধু ব্যাংকিং এবং বিমাক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব। 1991 সালে সংস্কার নীতি গৃহীত হবার পূর্বে ও পরে ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের কেমন অগ্রগতি ঘটেছে তার একটা তুলনামূলক আলোচনা ও বর্তমান এককে করা হবে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বেসরকারি

মূলধনের, বিশেষত বিদেশি মূলধনের প্রবেশ ঘটেছে উদারীকরণের যুগে। এই বেসরকারি মূলধন প্রবেশের প্রভাব ও বিবেচনা করা হবে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রের ন্যায় ভারতের বিমা ক্ষেত্রেও বেসরকারিকরণ ঘটেছে—দেশি-বিদেশি অনেক বেসরকারি কোম্পানি ভারতের বিমা ব্যবসায় প্রবেশ করেছে। ভারতের জীবন বিমা নিগমের আর জীবন বিমার ক্ষেত্রে একচেটিয়া নেই। তেমনি, সাধারণ বিমার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত মূলধনের প্রবেশ ঘটেছে। ফলে বিমা ক্ষেত্রের কার্যপদ্ধতি, নীতি, গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন এসেছে। এই সকল বিষয় বর্তমান এককে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। ব্যক্তিগত মূলধন আসার ফলে বিমা ক্ষেত্রের দক্ষতা বেড়েছে কিনা তাও বিচার করা হবে।

4.3 ভারতের শিল্প ও সেবা ক্ষেত্র (Industrial Sector and Service Sector of India)

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে নানা কারণে শিল্পের উন্নতি প্রয়োজন। কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ কমাতে, শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের সুযোদ নিতে এবং সর্বোপরি, বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রব্যগত কাঠামোয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বাড়াতে এবং তার দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যের আরো অনিশ্চয়তা দূর করতে হলে শিল্পায়ন প্রয়োজন। পরিকল্পনাকালে (1950-51 থেকে 2016-17) ভারতে শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। ভারতের শিল্প কাঠামোর এখন যথেষ্ট উন্নত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিল্পের মোট উৎপাদন খুবই বেড়েছে। জাতীয় আরে শিল্পের অবদান বেড়েছে। নানা ধরনের শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী এখন দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। আগে যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত, তার অনেকখানি এখন দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। পরিকল্পনা- কালে মূলও ভারী শিল্পের ভিত্তি যথেষ্ট মজবুত হয়েছে। দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোতে অনেকটাই তৈরি হয়েছে।

তবে ভারতের শিল্পায়নের সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই আছে। সাফল্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল : (i) জাতীয় আয়ে শিল্পক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে। (ii) অন্তত 1985 সাল পর্যন্ত সরকারি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। (iii) পরিকাঠামো শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। (iv) শিল্পোৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে। (v) স্থায়ী ভোগদ্রব্যের (durable consumer goods) উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (vi) শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে ইত্যাদি। অবশ্য উন্নতির পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রের কতকগুলি ব্যর্থতাও আছে। উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতাগুলি হল ঃ (i) শিল্পের প্রসারের হারে স্থায়িত্ব আসেনি। কোনো বছর অগ্রগতির হার বেশ সন্তোষজনক; আবার কোনো বছর উন্নতির হার যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। (ii) শিল্পক্ষেত্রে কর্মনিয়োগ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একদমই বাড়েনি। অনেকে তাই ভারতের শিল্পক্ষেত্রের সাম্প্রতিক প্রসারকে নিয়োগহীন প্রসার বা jobless growth বলে অভিহিত করেছেন। (iii) অধিকাংশ সরকারি সংস্থা লোকসান করে চলেছে। ফলে অনেক সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ অথবা বিলগ্নীকরণ ঘটানো হচ্ছে। (iv) অনেক ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ছে। সেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ দেশে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির গুরুত্বই খুবই বেশি। (v) শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রসার শিল্পের উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

এবার ভারতের সেবাক্ষেত্রের সামগ্রিক চিত্রটি দেখা যাক। সেবা ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ, ব্যাংকিং, বিমা প্রভৃতি। আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা সেবাক্ষেত্রের দুটি উপাদান নিয়ে বর্তমান এককে আলোচনা করব। এই দুটি বিষয় হল : ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্র এবং ভারতের বিমা ক্ষেত্র। 1955 সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। নাম দেওয়া হয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ঐ সময়ের অন্যান্য ব্যাংক ছিল বেসরকারি ব্যাংক। 1969 সালে 14 টি এবং 1980 সালে আরো 6 টি বড় বেসরকারি ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। পরে অবশ্য বিভিন্ন সময়ে কিছু ছোটো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া (merger) হয়। দু'একটি ব্যাংকের বেসরকারিকরণও করা হয় (যেমন, IDBI ব্যাংক)। এসবের ফলে 2022 সালের এপ্রিল মাসে স্টেট ব্যাংকসহ ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংককে অপেক্ষাকৃত বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় বারো। জাতীয়করণের পূর্বে ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ব্যাংকগুলি নানা অকাম্য কাজে লিপ্ত থাকতো। এই সমস্ত অসুবিধা ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্যই ভারত সরকার ব্যাংক জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জাতীয়করণের পর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির প্রধান সাফল্য তিনটি :

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের প্রসার, শাখা বিস্তার এবং আমানত সংগ্রহ বৃদ্ধি। তবে ব্যাংক জাতীয়করণের কয়েকটি কুফলও দেখা গেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : মুনাফা হ্রাস, ব্যাংকের গ্রাহক পরিসেবার অবনতি, ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা হ্রাস প্রভৃতি।

এবার ভারতের বিমাক্ষেত্রের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। বিমা প্রধানত দু'রকমের : সাধারণ বিমা ও জীবন বিমা। সাধারণ বিমার মধ্যে রয়েছে অগ্নি বিমা, নৌ বিমা, দুর্ঘটনা বিমা, মোটর বিমা প্রভৃতি। এসমস্ত ক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দেয়। বিনিময়ে বিমাকারীকে বিমা গ্রহীতা প্রিমিয়াম দেয়। জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী কিছু প্রিমিয়ামের প্রতিদানে বিমাগ্রহীতার জীবনের ঝুঁকি বহন করে। স্বাধীনতার আগে থেকেই ভারতে সাধারণবিমা ও জীবন বিমা চালু ছিল। 1956 সালে ভারত সরকার জীবন বিমা কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ভারতের জীবন বিমা নিগম (Life Insuracne Corporation of India বা LICI) গঠন করে। 1991 সাল LICI জীবনবিমার ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। পর্যন্তসালে সাধারণ বিমা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে জাতীয়করণ করে GICI (General Insurance Corporation of India) বা ভারতের সাধারণ বিমা নিগম গঠন করা হয়। 1999 সাল থেকে জীবন বিমার ব্যবসায় বেসরকারি কোম্পানি প্রবেশ করতে থাকে। তেমনি, 2002 সাল থেকে অনেক বেসরকারি সংস্থা ভারতে সাধারণ বিমা ব্যবসার শুরু করে। 2018 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত জীবন বিমা এবং সাধারণ বিমা উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি কোম্পানির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে তেইশ ও সাতাশ।

1993 সালে ভারত সরকার বিমা ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য মালহোত্রা কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ভারত সরকার IRDA বা Insurance Regulatory and Development Authority স্থাপন করে। বর্তমানে বিমা ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে এই সংস্থা। নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে ভারতের বিমা ক্ষেত্রটি বর্তমানে বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। অনেক বেসরকারি সাধারণ বিমা কোম্পানি ভারতে তাদের সাধারণ বিমা ব্যবসার পরিচালনা করেছে। তেমনি, জীবন বিমা ব্যবসাতেও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করেছে। তবে জীবন বিমার ক্ষেত্রে LICI-ই একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা।

4.4 সংস্কার পূর্ববর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি (Industrial Progress of India during the Pre-reform Period)

ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় মোটামুটিভাবে 1985 সাল থেকে। ঐ সময় পর্যন্ত ভারতে 6 টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও 3 টি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত হয় (1950-51 থেকে 1984-85 সাল পর্যন্ত)। সুতরাং ঐ সমস্ত পরিকল্পনা কালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি কেমন হয়েছে তা বিচার করলেই সংস্কার-পূর্ববর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি বোঝা যাবে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে (1951-56) দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল। ফলে ঐ পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিল্পক্ষেত্র এই পরিকল্পনায় কম গুরুত্ব পায়। এই পরিকল্পনায় শিল্পের অগ্রগতির জন্য সরকারি ক্ষেত্রের দায়িত্ব বিশেষ ছিল না। শিল্প প্রসারের প্রধান দায়িত্ব ছিল বেসরকারি উদ্যোগের হাতে। তবুও প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নতি ছিল সন্তোষজনক। সমগ্র পরিকল্পনাকালে শিল্পের গড় বার্ষিক উন্নয়নের হার ছিল 6·5 শতাংশ। বেসরকারি ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে সেগুলি হল তূলাবস্ত্র, চিনি, ভোজ্যতেল প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (1956-61) সরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় মহলানবিশ কৌশল গ্রহণ করা হয়। এই কৌশলের প্রধান কথা হল মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া। সেই অনুযায়ী দুর্গাপুর, ভিলাই এবং রাউরকেল্লায় সরকারি উদ্যোগে ইস্পাত কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি আরো কতকগুলি ভারী শিল্পের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নয়নের হার ছিল বার্ষিক 14.7 শতাংশ। এই পরিকল্পনায় দেশের শিল্পকাঠামোতে বৈচিত্র্য আসে এবং শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে (1961-66) আগের পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্পগুলি সমাপ্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়। সুতরাং, তৃতীয় পরিকল্পনাতেও সরকারি উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মূল ও ভারী শিল্পের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (যেমন, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, জলসেচ প্রভৃতি) শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়। সমগ্র পরিকল্পনাকালে শিল্পের অগ্রগতিতে অবশ্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। সমগ্র পরিকল্পনাকালে শিল্পের উৎপাদন বাড়ে 42 শতাংশ, যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল 70 শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হল অস্বাভাবিক খরা পরিস্থিতির ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং চিন-ভারত যুদ্ধ (1962)।

এই খরা এবং যুদ্ধের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনা যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। পরিবর্তে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1966-69) গৃহীত হয়। এই বছর তিনটিকে ভারতীয় পরিকল্পনার ইতিহাসে **'পরিকল্পনা থেকে ছুটি'** বা Plan Holiday বলে অভিহিত করা হয়। এই সময়কালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতির হার আদৌ সন্তোষজনক নয়। তবে এই পরিকল্পনাগুলি যুদ্ধ ও খরার ফলে তৈরি বিশৃঙ্খলা দূর করতে এবং চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু করার মতো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদান করতে সমর্থ হয়েছিল।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে (1969-74) শিল্পের অগ্রগতির হার সম্পর্কে আশা করা হয়েছিল যে, বার্ষিক 8 থেকে 10 শতাংশ হারে শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল বার্ষিক 3.9 শতাংশ মাত্র। শিল্পক্ষেত্রের এই ব্যর্থতার পিছনে প্রধান কারণগুলি হল কাঁচামালের অভাব। কারিগরি জ্ঞানের অভাব, শক্তি ও তেল সংকট, শ্রম বিরোধ প্রভৃতি।

পঞ্চম পরিকল্পনায় (1974-78) জোর দেওয়া হয় মূল বা প্রধান শিল্প (core industries) এবং রপ্তানি ঘেঁসা সাধারণের ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের উপর। শিল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক 8.1 শতাংশ। কিন্তু এই পরিকল্পনায় শিল্পের অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। বাস্তবে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল 5.7 শতাংশ।

কেন্দ্রে রাজনৈতিক পালাবদলের জন্য পঞ্চম পরিকল্পনা একবছর আগেই শেষ করে দেওয়া হয় এবং 1978 সাল থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনা শুরু হয়। কিন্তু পুনরায় কেন্দ্রে পালাবদলের ফলে সেই পরিকল্পনাও বাতিল হয়। অবশেষে 1980 সালে পি.ভি. নরসিমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে নতুন করে ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-85) শুরু হয়। এই পরিকল্পনায় উদারীকরণের নীতি গৃহীত হয়। কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটিয়ে এবং মূলধনি ও ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করে শিল্পের অগ্রগতির পরিকল্পনা করা হয়। সমগ্র পরিকল্পনাকালে শিল্পের উৎপাদন বাড়ে বার্ষিক 7 শতাংশ হারে যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক 8 শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হয়োর পিছনে প্রধান কারণ হল শক্তি সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অভাব। তবে ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ইলেকট্রনিকস শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি ঘটে।

সংস্কার-পূর্ববর্তী সময়কেল (1950-85) ভারতে শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, এই সময়কালে শিল্পের অগ্রগতির দুটি পর্যায় (phase) রয়েছে। প্রথম পর্যায়টি হল 1950 থেকে 1965 সাল অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত, আর 1965-85 সময়কালটিকে অর্থাৎ তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাসহ চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ের (1950-65) শিল্পোন্নয়নের তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল (i) মূল ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান, (ii) আমদানি ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং (iii) ঘাটতি ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি এবং খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীলতা। আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রণকৌশল হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয় (মহলানবিশ কৌশল)। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও মোটামুটি এই কৌশল বজায় ছিল। এর ফলে 1960 -এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতে মূল ও ভারী শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। তুলনায়, ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়েনি। মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল আমদানি করতে হয়। আবার, কিছু কিছু ভোগ্যদ্রব্য ও আমদানি করতে হয়েছিল। এর ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থার (অর্থাৎ বাণিজ্য ঘাটতির) সৃষ্টি হয়। এই ঘাটতি মেটানোর জন্য ভারতকে বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের 10 শতাংশ এসেছিল বিদেশি সাহায্য থেকে। অন্যদিকে, তৃতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের 23.5 শতাংশ এসেছিল বিদেশি সাহায্য থেকে। দেখা যাচ্ছে যে প্রথম পর্যায়ে (1950-65) বিদেশি সাহায্যের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বেড়েছে।

এছাড়া, প্রথম পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ব্যয়ের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি সংগৃহীত হয়েছিল সরকারি ঋণ ও ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে এই দুই পন্থায় সংগৃহীত হয় মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। ফলে দেশে টাকার জোগান বাড়ে। প্রথম পরিকল্পনার শুরু থেকে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত অর্থের জোগান প্রায় 8 গুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোট উৎপাদন সেই হারে বাড়েনি। ফলে দামস্তর বাড়তে থাকে—দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

প্রথম পর্যায়ে (1950-65) শিল্পোন্নয়নের হার ছিল বেশ উঁচু। 1951-55 সময়কালে শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল গড়ে বার্ষিক 5.7 শতাংশ। 1955-60 এই সময়কালে শিল্পোন্নয়নের হার ছিল গড় বার্ষিক 7.2 শতাংশ এবং

1963-65 তে হার বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে বার্ষিক 9 শতাংশ পৌঁছায়। কিন্তু 1965-70 সময়কালে শিল্পের বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় গড়ে বার্ষিক 3.3 শতাংশ মাত্র। 1970-75 সময়কালে শিল্পের অগ্রগতির হার সামান্য বেড়ে গড়ে বার্ষিক 4.6 শতাংশে পৌঁছায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের (1965-85) একটা বড় অংশ শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল মন্থর। অন্যদিকে, প্রথম পর্যায়ে (1950-65) শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল যথেষ্ট বেশি। সংস্কার-পূর্ববর্তী কালের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে (1965-85) শিল্পের অগ্রগতির এই মন্থরতার পিছনে নানা কারণ কাজ করেছে। সেই কারণগুলি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

4.4.1 1965-85 সময়কালে ভারতে শিল্প : মন্থরতার কারণসমূহ (Causes of Industrial Deceleration in India during 1965-85)

সংস্কার পূর্ববর্তী সময়কালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়টি ছিল 1950-65 সাল পর্যন্ত। এই সময়কালে শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল বেশ সন্তোষজনক। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কালে (1965-85) শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল বেশ মন্থর। এই পর্যায়ের শিল্পোন্নয়নের আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়। সেগুলি হল : (i) আমদানির বিকল্প হিসাবে ভোগদ্রব্য শিল্পের বিকাশ, (ii) বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ এবং (iii) বাজারে চাহিদার অভাব। তবে এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিল্পের অগ্রগতির মন্থরতা। 1965-85 এই দু'দশক ধরে ভারতে শিল্পের অগ্রগতিতে কেন মন্দা দেখা দেয়, সেই বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। শিল্পক্ষেত্রে এই মন্দার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। সেই কারণগুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করতে পারি :

বাহ্যিক কারণ এবং অভ্যন্তরীণ কারণ। বাহ্যিক কারণ বলতে আমরা সেই কারণগুলিকে বোঝাচ্ছি যেগুলির উপর অর্থনীতির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ কারণ বলতে সেই কারণগুলিকে বোঝানো হচ্ছে যেগুলি দেশের সরকার বা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো অথবা যে কারণগুলি দেশের অভ্যন্তরেই উদ্ভূত হয়েছে। আমরা প্রথমে বাহ্যিক কারণগুলি উল্লেখ করছি।

শিল্পে মন্দার পিছনে বাহ্যিক কারণসমূহ :

1. 1962, 1965 এবং 1971 সালে ভারত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে (চিন ও পাকিস্তান) যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে অনুৎপাদনশীল সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের খরচ মেটাতে উৎপাদনশীল ব্যয় কমাতে হয়। ফলে শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

2. 1965 থেকে 1967 এবং পুনরায় 1971 থেকে 1973 এই বছরগুলিতে প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। ভারতের কৃষিকার্য অনেকখানিই আবহাওয়ার অবস্থার উপর নির্ভরশীল। উপর্যুপরি খরার ফলে কৃষি উৎপাদন ভীষণভাবে কমে যায়। এর ফলে একদিকে যেমন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান কমে, অন্যদিকে তেমনি খরার জন্য কৃষকের আয় কমে এবং তার ফলস্বরূপ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও কমে যায়। এভাবে জোগান ও চাহিদা উভয় দিক থেকেই শিল্পক্ষেত্র প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। এর ফলে শিল্পের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

3. শিল্পের উন্নতির জন্য চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো, যেমন— বিদ্যুৎশক্তি, রেল ও সড়ক পরিবহণ, জল সরবরাহ। 1960 -এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিকাঠামো ছিল না। এই পরিকাঠামোর অভাবের জন্যও শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। এর ফলে 1965 সালের পরবর্তী দু'দশকে ভারতের শিল্পের অগ্রগতির হার মন্থর হয়ে আসে।

4. 1973 সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। ঐ বছর OPEC দেশগুলি (Organisation of Petroleum Exporting Countries) ব্যারেল প্রতি তেলের দাম প্রায় দ্বিগুণ করে দেয়। এর ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তাছাড়া, তেলের এই দাম বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর ফলেও ভারতের শিল্পক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তা ছাড়া, আমাদের তেল আমদানির ব্যয় ভীষণভাবে বেড়ে যায় এবং তার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যেও ঘাটতি বিপুল আকার ধারণ করে। এসব কিছু ভারতে শিল্পের অগ্রগতিকে বাধা দেয় বলে অনেকে মনে করেন।

শিল্পে মন্দার অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ

1965-85 সময়কালে ভারতের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার কতকগুলি অভ্যন্তরীণ কারণও অনেকে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে সেই কারণগুলি নিম্নরূপ :

1. অধ্যাপক জগদীশ ভগবতী এবং অধ্যাপিকা পদ্মা দেশাই মনে করেন যে, 1965-85 সময়কালে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির মন্থরতার জন্য তৎকালীন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণই দায়ী। তাঁদের মতে, ঐ সময়ে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল। শিল্প লাইসেন্সিং ব্যবস্থা এবং সরকারি বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, শিল্পের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে শিল্পের অগ্রগতির হার মন্থর হয়েছে বলে ভগবতী ও দেশাই মনে করেন।

2. অধ্যাপক কে. এন. রাজ, অধ্যাপক এ বৈদ্যনাথন এবং অধ্যাপক এস. চক্রবর্তী মনে করেন যে, 1960 -র দশকের মধ্যভাগ থেকে পরবর্তী দুদশক ভারতের কৃষির প্রসারের হার ভালো ছিল না। কৃষির এই ব্যর্থতাই শিল্পের হারকে মন্থর করেছে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন না বাড়ায় কৃষকদের আয় তথা ক্রমক্ষমতা ঐ সময়কালে বাড়েনি। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়েনি। আবার অন্যদিকে, কৃষি উৎপাদন কম হবার ফলে কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রাপ্তব্য কাঁচামালের জোগান কমেছে। এর ফলেও শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

3. শ্রীনিবাসন ও নারায়ণন এবং পট্টনায়ক ও রাও আলাদা আলাদা ভাবে দেখিয়েছেন যে, 1960-এর দশক থেকে ভারতে সরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার হ্রাস পেয়েছে। ভারতের ন্যায় মিশ্র অর্থনীতিতে শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনীতি-বিদগণের মতে, সরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার মন্থর হয়ে আসাই শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার মন্থর হয়ে আসার কারণ। তথ্য দিয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, 1965 সালের পর থেকে ভারতে সরকারি বিনিয়োগ এবং অন্যান্য সরকারি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে 1965-85 সময়কালে ভারতের শিল্পায়নের হার মন্থর হয়েছে।

৪. অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র এবং অর্থনীতিবিদ দীপক নায়ার মনে করেন যে, 1960-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে আয়বণ্টনের বৈষম্য বাড়ে। এর ফলে বাজার সংকুচিত হয় বা বাজারে চাহিদার সমস্যা দেখা দেয়। অধ্যাপক মিত্র এবং অধ্যাপক নায়ার-এর মতে, এই আয় বন্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি এবং তার ফলে বাজার বা চাহিদার সমস্যাই হল শিল্পায়নের গতি মন্থর হয়ে আসার প্রধান কারণ। মতটিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু আয় বণ্টনের বৈষম্য ও ক্রমাগত বেড়েছে। ধনী আরো ধনী হয়েছে এবং দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক

তৃতীয়াংশ ব্যক্তি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এর ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়েনি। আবার, আয় বণ্টনের বৈষম্য সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত করে রেখেছে। প্রধানত ধনীদেরই আয় বেড়েছে এবং তার ফলে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কার পূর্ববর্তী শিল্পায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে টিভি, ফ্রিজ, এসি মেশিন প্রভৃতি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ধনীদের সংখ্যা সীমিত। সুতরাং এই ধরনের বাজার ক্রমশই সংকুচিত হয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। ভারতে আয় বৈষম্য শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। গ্রামাঞ্চলেও আয় বণ্টনের বৈষম্য রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে আয় বণ্টনে বৈষম্যের প্রধান কারণ হল জমির মালিকানা বণ্টনে বৈষম্য। ভারতে ভূমি সংস্কার সফল হয়নি। জমির মালিকানা বন্টনে তাই অসাম্য রয়ে গেছে। গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণ সবাই গরিব। এই জনসাধারণের আয়ের বেশির ভাগই খাদ্যশস্য কিনতে খরচ হয়ে যায়। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সংকুচিত হয়েছে। সেজন্য শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

5. আমাদের শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তিও দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা, বিশেষত শিল্প দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টিতে বাধা দিয়েছে। প্রথম দিকে পরিকল্পনাগুলিতে বিদেশি প্রযুক্তির উপর বেশি নির্ভর করা হয়েছে। বিদেশি প্রযুক্তির প্রধান ত্রুটি হল, এর ফলে প্রসার প্রভাব (Spread effect) দেশের মধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের তেমন প্রসার ঘটেনি। তা ছাড়া, বিদেশি প্রযুক্তি মূলধন নিবিড় (Capital intensive)। এই প্রযুক্তি কর্মসংস্থান তেমন বাড়ে না। তার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের আয় বিশেষ বাড়েনি। তাদের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য অনেক বেড়ে গেছে। এজন্যও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অনেক কম। চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে শিল্পের অগ্রগতির হার মন্থর হয়ে পড়েছে।

আমরা দেখেছি, 1965-85 সময়কালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার পিছনে অনেক কারণ কাজ করেছে, যেমন— পরিকাঠামোর অভাব, অতিরিক্ত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, কৃষির ব্যর্থতা, সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস এবং চাহিদা বা বাজারের অভাব। এদের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অভাবটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তাই দীর্ঘকালে শিল্পে উচ্চ উন্নয়নের হার বজায় রাখতে হলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াতে হবে। আর তার জন্য সাধারণ জনগণের আয় বাড়াতে হবে, তাদের মধ্যে যে ব্যাপক দারিদ্র্য বিদ্যমান তা দূর করতে হবে। তবেই শিল্পের অগ্রগতির হারে স্থায়িত্ব আসবে। ভারতের জনসংখ্যার বড় অংশই গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আয় বৈষম্য দূর করতে হবে। এর জন্য চাই উপযুক্ত ভূমিসংস্কার। এর ফলে একদিকে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বাড়বে এবং অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে আয় বৈষম্য কমবে। পাশাপাশি, গ্রামীণ অর্থনীতিতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রসারিত হবে। ব্যাপক সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রসারিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

4.5 সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি (Industrial Growth in India during the Post-reform Period)

ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় 1985 সালে। ঐ বছরে ঘোষিত শিল্পনীতিতে নানা উদারীকরণের কথা বলা হয়, বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ কমানোর আশ্বাস দেওয়া হয়, বিদেশি মূলধনের প্রবেশের পথ সুগম

করা হয় ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিই আরো পরিপূর্ণ রূপ পায় 1991 সালের শিল্পনীতিতে। 1985 সালটি ছিল ভারতের সপ্তম পরিকল্পনার (1985-90) প্রথম বছর। সুতরাং, সপ্তম পরিকল্পনা থেকে অন্তিম বা দ্বাদশ পরিকল্পনা (2012-17) পর্যন্ত ভারতে শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে সংস্কার পরবর্তীকালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতি কেমন হয়েছে তা অনেকটাই অনুধাবন করা যাবে।

সপ্তম পরিকল্পনায় উদারীকরণের নীতিকে অনুসরণ করার উপর জোর দেওয়া হয়। শিল্পের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ইলেকট্রনিকস শিল্পের (এদের সূর্যোদয় শিল্প বা Sunrise industry বলা হয়) প্রসারের উপরও জোর দেওয়া হয়। এছাড়া, ভোগ্যদ্রব্য ও অন্তর্বর্তী শিল্পের (Intermediate industries) উপরও ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো হয়, সপ্তম পরিকল্পনাকালে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক 8 শতাংশ। বাস্তবে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার (বার্ষিক 8.5 শতাংশ) লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। অনেকে দাবি করেন যে, উদারীকরণের নীতির ফলেই এই সাফল্য এসেছে।

সপ্তম পরিকল্পনার পর ভারতে দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1990-92) রূপায়িত হয়। 1989 সালের ডিসেম্বর থেকে 1991 সালের 21 জুনের মধ্যে ভারতে তিনজন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসেন—ভি. পি. সিংহ, চন্দ্রশেখর এবং নরসিমা রাও। ফলে এই সময়ের মধ্যে তিন-তিনবার পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তন ঘটে এবং তিন-তিনবার নতুন নতুন অষ্টম পরিকল্পনায় খসড়া পাশ হয়। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সপ্তম পরিকল্পনা শেষ হবার (31 মার্চ, 1990) পর দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1990-92) গৃহীত হয়। এই দু'বছর শিল্পের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি বললেই চলে। অবশেষে নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে নতুন অষ্টম পরিকল্পনা 1992-93 সাল থেকে শুরু হয়। 1990-91 এবং 1991-92 এই সাল দুটিকে **'পরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় ছুটি'** বলে অভিহিত করা যায়। (পরিকল্পনা থেকে প্রথম দুটি বা বিরতি ঘটেছিল 1966-69 সালে।) এই দ্বিতীয় ছুটির প্রথম বছরে (1990-91) অবশ্য শিল্পোৎপাদন বাড়ে 8.2 শতাংশ। কিন্তু তার পরের (1991-92) শিল্পের উৎপাদন বাড়ে মাত্র 0.6 শতাংশ অর্থাৎ শিল্পের উৎপাদন বাড়েনি বললেই চলে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের জোগান হ্রাস, পরিকাঠামোর অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির অসুবিধা প্রভৃতিই হল এর প্রধান কারণ।

1991-92 সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পের উৎপাদন না বাড়লেও এই বছরটি ভারতের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বছর 1991 সালের 24 জুলাই নরসিমা রাও সরকার নতুন শিল্পনীতি (New Industrial Policy) ঘোষণা করে। এই শিল্পনীতিতে অনেক অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় এবং সেগুলি বাজার ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। অনেক সরকারি ক্ষেত্রে সরকারের বিনিয়োগ বা অংশ কমানো হয় এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া, শিল্প লাইসেন্স নীতি উদার করা হয় এবং বিদেশি মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রায় সবটাই তুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া, বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত আইনকে উদার করা হয়। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসারের বাধা দূর করা হয়। এই শিল্পনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল সরকারি ক্ষেত্রের সংকোচন এবং বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণ। 1991 সালের নতুন শিল্পনীতিতে মাত্র 8 টি শিল্প সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এরপর 1993, 1998 এবং 2001 সালে তিন দফায় প্রত্যেকবার দুটি করে শিল্প বেসরকারি মূলধনের কাছে খুলে দেওয়া হয়। ফলে সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত শিল্প রইল মাত্র দুটি (পারমাণবিক শক্তি এবং রেলপথ)। 1991 সালের শিল্পনীতির তাই মূলকথা হল উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন (Liberalisation, Privatisation and Globalisation বা সংক্ষেপে LPG)।

নতুন শিল্পনীতি (1991) প্রবর্তনের ঠিক পরের বছরেই শুরু হয় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1992-97)। এই পরিকল্পনায় নতুন শিল্পনীতি অনুযায়ী সরকারি ক্ষেত্র অপেক্ষা বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। অষ্টম পরিকল্পনায় শিল্পের উৎপাদন বাড়ে বার্ষিক 8 শতাংশ হারে। অবশ্য লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক 8.2 শতাংশ। অবশ্য বার্ষিক হারে শিল্পের অগ্রগতির হার যথেষ্ট সন্তোষজনক।

নবম পরিকল্পনায় (1997-2002) শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক 9 শতাংশর সামান্য বেশি। কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাকালে বৃদ্ধির হার ছিল গড় বার্ষিক 5 শতাংশ মাত্র। এই পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্বের পাশাপাশি নানারকম সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির (যেমন, শিল্প, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানীয় জল, শিশুদের পুষ্টি প্রভৃতি) উপর জোর দেওয়া হয়। সুতরাং, শিল্পের অগ্রগতি হার বিবেচনা করলে নবম পরিকল্পনাকে ব্যর্থই বলতে হয়। অবশ্য দশম পরিকল্পনা শিল্পের এই ব্যর্থতা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠে। দশম পকিল্পনায় (2002-07) শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক 8.2 শতাংশ। অবশ্য লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক 10 শতাংশ। এই পরিকল্পনায় রাজ্যস্তরে শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একাদশ পরিকল্পনায় (2007-12) শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল গড়ে বার্ষিক 6.9 শতাংশ। এই হার ছিল লক্ষ্যমাত্রা (10 শতাংশ) অপেক্ষা যথেষ্ট কম। তাছাড়া, এই পরিকল্পনার সময় শিল্পের অগ্রগতির হার ভীষণভাবে ওঠানামা করেছিল। দ্বাদশ পরিকল্পনার সময়েও শিল্পের অগ্রগতির হার সন্তোষজনক ছিল না। সমগ্র পরিকল্পনাকালে (2012-17) শিল্পের বার্ষিক অগ্রগতির হার ছিল গড়ে 6 শতাংশর মতো (লক্ষ্যমাত্রা ছিল 2011-12 সালকে ভিত্তি বছর ধরে 9.6 শতাংশ)।

এরপর ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বদলে এসেছে NITI আয়োগ। এই সংস্থা সরকারের নীতি ভাণ্ডার (policy think tank) হিসাবে কাজ করছে। সরকারের উদারীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 2020 সালের মার্চ মাসে ভারত তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে করোনা মহামারি। করোনার বিস্তার রুখতে ভারত সরকার 2020 সালের মার্চ মাসে একাদিক্রমে 68 দিন লকডাউন ঘোষণা করা হয়। ঐ সময় সারা দেশের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। এছাড়া রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে ঘোষিত হয়েছিল অসংখ্য লকডাউন। এসবের ফলে শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন 2020-21 সালে 9 শতাংশের মতো কমে। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন 7.2 শতাংশ কমে যায়। 2020-21 এবং 2021-22 এই অস্বাভাবিক বছরে শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করাই সমীচীন হবে।

সংস্কার-পরবর্তী কালে শিল্পের অগ্রগতির হার সংস্কার-পূর্ববর্তী কালের চেয়ে বেশি নয়, বরং কিছুটা কম। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সংস্কার-পূর্ববর্তীকালে বন্যা ও খরার পরিস্থিতিতে দেশকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাছাড়া চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এ ধরনের বড় কোনো বিপর্যয়ে সংস্কার-পরবর্তীকালে দেশকে পড়তে হয়নি (2020 সালের করনো মহামারির পূর্বে)। তাও এই যুগের শিল্পের উন্নতির হার আগের সময়কালের উন্নতির হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই বলা যে, সংস্কারের সুফল ভারতের শিল্পক্ষেত্রের উপর তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

4.6 ভারতে সরকারি ক্ষেত্র (Public Sector in India)

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো দেশের যে সংস্থার মালিক সেই দেশের সরকার, সেই সংস্থাকে বলা

হয় সরকারি সংস্থা বা সরকারি উদ্যোগ। আর নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয়, যে সংস্থা বা উদ্যোগের 51 শতাংশের মালিকানা সরকারের। সেই সংস্থাকে বলা হবে সরকারি সংস্থা বা সরকারি উদ্যোগ। যখন কোনো দেশের সরকার সেই দেশের শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তখন তাকে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বলে। সরকারি উদ্যোগের সংস্থাগুলিকে সমষ্টিগতভাবে সরকারি ক্ষেত্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র (public sector) বলে। ব্রিটিশ আমলেও ভারতে কিছু সরকারি ক্ষেত্র ছিল, যেমন—রেলপথ, ডাক ও তার, অস্ত্রনির্মাণ, লবণ কারখানা, কুইনাইন কারখানা প্রভৃতি। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার 1948 সালে প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করে। কোনো দেশের শিল্পের উন্নতিতে সরকারের ভূমিকা কীরূপ হবে, বিদেশি মূলধন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতি সরকারের আচরণ কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে সরকার যে নীতি ঘোষণা করে তাকেই বলে শিল্পনীতি। এক কথায়, শিল্পনীতি হল দেশের মধ্যে শিল্প বা কলকারখানা গড়ে তোলার ব্যাপারে ঐ দেশের সরকারি নীতি। 1948 সালের শিল্পনীতিতে ভারতে মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামো বা মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলকথা হয় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের পাশাপাশি সহাবস্থা। 1948 সালের পর 1956 সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের পরিধি আরো বিস্তৃত করা হয়। সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গড়ে তোলা শিল্পের সংখ্যা 3 (তিন) থেকে বাড়িয়ে করা হয় 17 (সতেরো)। এর মধ্যে ছিল পারমাণবিক শক্তি, রেলপথ, লৌহ-ইস্পাত, ভারী শিল্প ও যন্ত্রপাতি, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ নির্মাণ, জলজাহাজ নির্মাণ, কয়লা ও লিগনাইট, খনিজ তেল, তামা, দস্তা ও ম্যাঙ্গানিজ, টেলিফোন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি। এই 17 টি শিল্পকে A তালিকাভুক্ত (Schedule A) করা হয়। এছাড়া, তালিকা B-তে (Schedule B) ছিল 12 টি শিল্প, যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, মেশিন টুলস, ফার্টিলাইজার, রবার প্রভৃতি।

এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বলা হয় যে, ভবিষ্যতে এই সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন শিল্প ইউনিট কেবলমাত্র সরকারি মালিকানায় গড়ে তোলা হবে। বাকি শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারি মূলধন কলকারখানা স্থাপন করতে পারবে। 1956 সালের পর 1970, 1977 এবং 1980 সালের শিল্পনীতিতে সরকারের এই সূল সুরটি বজায় ছিল। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি সরকারি ক্ষেত্রে গড়ে তোলা হবে। অন্তত 1985 সাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। সরকারি ক্ষেত্রের ভারী ও মূলধন দ্রব্যের শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1980-85) পর্যন্ত ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ভারী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম নির্মাণে সরকারি ক্ষেত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পরিকাঠামো শিল্পের উন্নতিতেও ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের বিশেষ ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত শিল্প সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করে তাদের পরিকাঠামো শিল্প বলে। যেমন — বিদ্যুৎ, পরিবহণ, কয়লা, ইস্পাত, তেল শোধন প্রভৃতি। ভারতের সরকারি ক্ষেত্রে এ সমস্ত শিল্পের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে অবশ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে দেশের রাষ্ট্রীয় বা সরকারি ক্ষেত্র সম্পর্কে। সপ্তম পরিকল্পনা (1985-90) থেকে সরকার উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। 1985 সালের শিল্পনীতিতে সরকারের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পরিচয় মেলে। এই শিল্পনীতিতে বলা যেতে পারে উদারীকরণের দিকে পদক্ষেপ। এই উদারীকরণের ও বেসরকারিকরণের নীতি পূর্ণ রূপ পায় 1991 সালের শিল্পনীতিতে। সরকারি ক্ষেত্রের অধীন সংস্থাগুলিকে একদা (1948) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আধুনিক ভারতের মন্দির (Temples of modern India) বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া গৃহীত হয় 1991 সালের শিল্পনীতিতে।

এরজন্য অবশ্য ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতাই অনেকাংশে দায়ী। পরিকল্পনা কালে (1950-2017) ভারতের শিল্পে সরকারি ক্ষেত্রের যেমন নানা সাফল্য আছে, তেমনি সরকারি ক্ষেত্রের নানা ব্যর্থতাও আছে। সরকারি ক্ষেত্রের এই সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

4.6.1 ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের সাফল্য (Success of Public Sector in India)

স্বাধীন ভারতে অন্তত 1990 সাল পর্যন্ত সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। **প্রথমত,** মূল ও ভারী শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে সরকারি ক্ষেত্র ভারতীয় শিল্পের ভিত্তি মজবুত করছে। **দ্বিতীয়ত,** 2000 সাল পর্যন্ত ভারতের মোট শিল্পোৎপাদনের একটা বড় অংশ সরকারি ক্ষেত্র থেকে আসত। **তৃতীয়ত,** সংগঠিত ক্ষেত্রের মোট কর্মসংস্থানের একটা বড় অংশই সরকারি ক্ষেত্রের অবদান। **চতুর্থত,** পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উন্নতিতেও ভারতের সরকারি ক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আমরা ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের সাফল্যগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করতে পারি :

1. পরিকল্পনাকালে ভারতে শিল্পের যে ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য ঘটেছে তা মূলত সরকারি ক্ষেত্রেরই অবদান। স্বাধীনতার পর ভারতে শিল্প ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সরকারি ক্ষেত্রই ভারতের এই শিল্প কাঠামোর ভিত্তি দৃঢ়তর করেছে।
2. সরকারি ক্ষেত্র নানা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বা মূলধনি দ্রব্যের শিল্পের প্রসার তো ঘটিয়েছেই, উপরন্তু অনেক ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের প্রসারেও সরকারি ক্ষেত্রের অবদান রয়েছে।
3. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের সরকারি ক্ষেত্রটি প্রধান স্থান দখল করে আছে। এরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল, পারমাণবিক শক্তি, রেলপথ, উড়োজাহাজ নির্মাণ, জলজাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি।
4. ভারতের সরকারি ক্ষেত্রে রয়েছে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক, ভারতের জীবনবিমা নিগম, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নানা উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (developement financial institution বা DFIs) যেমন, ভারতের অর্থ কর্পোরেশন, রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনসমূহ প্রভৃতি, ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট প্রভৃতি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য করেছে।
5. সরকারি সংস্থাগুলি একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে এবং অন্যদিকে আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে সাহায্য করেছে।
6. সরকারি ক্ষেত্রে ভারতের শিল্পের আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে সাহায্য করেছে। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলে কিছু সরকারি ইউনিট খোলা হয়েছে। বেসরকারি মূলধন ঐ অঞ্চলে শিল্প ইউনিট স্থাপনে এগিয়ে আসতো না।
7. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প নতুন নতুন সহায়ক শিল্প স্থাপনেও সাহায্য করেছে।
8. অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করতেও সরকারি ক্ষেত্রের অবদান আছে।
9. সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির ডিভিডেন্ড, কর, শুল্ক প্রভৃতির আদায় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে।

10. সর্বোপরি, ভারতের পরিকাঠামো শিল্পের উন্নতিতে সরকারি ক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জলসেচ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, কৃষি বিপণন, কৃষি মূলধন সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের অবদান অনস্বীকার্য। যেমন, জলসেচ প্রসারের ক্ষেত্রে রয়েছে সরকারি ক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প। সড়ক পরিবহণের উন্নতির পিছনে রয়েছে National Highway Authorities of India (NHAI)। জলপরিবহণের ক্ষেত্রে রয়েছে Shipping Corporation of India (SCI)। কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রয়েছে সরকারি ক্ষেত্র Coal India Limited বা CIL-র অবদান। তেল ও গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে রয়েছে সরকারি সংস্থা Oil and Natural Gas Commission বা ONGC-এর অবদান। বিদ্যুৎ উৎপাদনে রয়েছে NTPC বা National Thermal Power Corporation (বা NTPC)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে যে সমস্ত সংস্থার অবদান রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Department of Science and Technology (DST), Department of Atomic Energy (DAE), Department of Space (DoS), Department of Bio-technology (DoB) প্রভৃতি। এগুলি সবই সরকারি সংস্থা। এছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রসারেও সরকারি ক্ষেত্রের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

4.6.2 ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা (Sailure of Public Sector in India)

ভারতে সরকারি ক্ষেত্রে শিল্পের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সরকারি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য অবদানগুলি হল : শিল্পের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, মূল ও ভারী শিল্প স্থাপন, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা, আমদানি-পরিবর্ততার দ্বারা দেশের শিল্প কাঠামোয় বৈচিত্র আনা, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সদর্থক ভূমিকা, শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে সহায়তা, বিভিন্ন সহায়ক শিল্প স্থাপনে সরকারি ক্ষেত্রের অবদান প্রভৃতি। পাশাপাশি ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের নানা ব্যর্থতাও রয়েছে। সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতার দিকগুলি আমরা নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।

1. ভারতের সরকারি উদ্যোগগুলির প্রথম এবং প্রধান সীমাবদ্ধতা হল মুনাফা অর্জনে ব্যর্থতা। অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগই লোকসানে চলছে এবং এই লোকসান কোনো কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।
2. ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের পরিচালন ব্যবস্থা খুবই অদক্ষ। অনেক সরকারি উদ্যোগে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি।
3. চাকরির নিরাপত্তা থাকায় সরকারি ক্ষেত্রে পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে উদ্যম ও অনুপ্রেরণার অভাব দেখা যায়।
4. সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে মূলধন নিয়োগের পরিমাণও খুব বেশি। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে অত্যধিক বেশি সময় লাগে। এর ফলে বছরের পর বছর প্রকল্প ব্যয় বাড়তে থাকে।
5. সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলিকে পরিচালনগত নানা বিধিনিষেধ মানতে হয়। এর ফলেও এদের দক্ষতা কমেছে।
6. অনেক সময় সরকারি উদ্যোগের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কাজ করে। ফলে বিনিয়োজিত মূলধনের উপযুক্ত ব্যবহার হয় না। মূলধন সম্পদের বিপুল অপচয় ঘটে।

7. ভারতে অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হয় না। এর ফলে দ্রব্যের ইউনিট প্রতি ব্যয় বেশি পড়ে এবং উদ্যোগগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা (Competitiveness) কমে।
8. অনেক সরকারি উদ্যোগে আমলাতন্ত্রের প্রভাব খুবই বেশি। অনেক সরকারি শিল্প ভুল ও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের শিকার। ফলে এদের দক্ষতা খুবই কম।
9. লোকসানে চলা উদ্যোগগুলি টিকিয়ে রাখতে সরকারকে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। দেশের জনগণের করের টাকার অপব্যয় হয়। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, বর্তমানে ভারতের সরকারি উদ্যোগগুলির অধিকাংশই অর্থনীতির বোঝাস্বরূপ।
10. সরকারি ক্ষেত্রে গৃহীত অনেক সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সেগুলির অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা কম।

সরকারি ক্ষেত্রের এই সমস্ত ব্যর্থতার জন্য ভারত সরকার সরকারি ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে চলেছে। এই প্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে 1985 সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং নতুন শতাব্দীতে তা বিশেষ গতি লাভ করেছে। সরকারি উদ্যোগগুলির বেসরকারিকরণ ঘটানো হচ্ছে অর্থাৎ সেগুলি শেয়ারের একটা অংশ বা সবটাই ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এর পিছনে সরকারের যুক্তি হল : বেসরকারিকরণের ফলে সরকারি উদ্যোগগুলির দক্ষতা বাড়বে, পরিচালন ব্যয় কমবে, অপচয় ও দুর্নীতি রোধ হবে, উৎপাদনক্ষমতার ব্যবহারের মাত্রা বাড়বে, সরকারি উদ্যোগগুলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমবে, সরকারি শিল্প ইউনিট বিক্রি করে সরকারের রাজস্ব বাড়বে এবং তার ফলে সরকারের বাজেট ঘাটতি কমবে এবং সর্বোপরি, সরকারের আর্থিক ও পরিচালনগত দায়দায়িত্ব কমবে।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বেসরকারিকরণেরও নানা কুফল আছে। বেসরকারিকরণের নীতির প্রধান কুফলগুলি হল : (i) এই নীতি শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী। বেসরকারি উদ্যোগগুলিতে, প্রায়শই শ্রমিক স্বার্থ অবহেলিত হয়।

(ii) বেসরকারিকরণের নীতি অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটায়। কয়েকটি বড় শিল্পগোষ্ঠী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার বা মালিকানা হস্তগত করে।

(iii) বেসরকারি উদ্যোগ জনকল্যাণের বিষয়টি উপেক্ষা করে এবং শুধুমাত্র মুনাফা বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি দেয়।

(iv) বেসরকারি ক্ষেত্র সাধারণত পরিকাঠামো শিল্পের উন্নতিতে এগিয়ে আসে না। কারণ এক্ষেত্রে মুনাফা তুলনামূলকভাবে কম এবং তা পেতে অনেক দেরি হয়। তা ছাড়া, পরিকাঠামো শিল্পে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ সাধারণত বড় হয় এবং প্রতিদান পেতে দীর্ঘসময় লাগে। অথচ, কোনো দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকাঠামোর উন্নতি একান্ত প্রয়োজন।

(v) বেসরকারি ক্ষেত্র মানেই যে দক্ষতা বেশি, তা কিন্তু নয়। ভারতে অনেক বেসরকারি শিল্পও লোকসানে চলছে। সুতরাং, বেসরকারিকরণ দক্ষতার গ্যারান্টি দিতে পারে না।

তাই আমরা বলবো যে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে, বিশেষত মূল ও ভারী শিল্পে এবং কলাকৌশল শিল্পে বেসরকারিকরণ কখনোই কাম্য নয়। তবে উদ্যোগগুলির দক্ষতা বাড়াতে হবে। এ সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সুপারিশ করতে পারি। এগুলি অনুসরণ করলে সরকারি ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়বে।

i) সরকারি উদ্যোগগুলির পরিচালনার জন্য পেশাদার ম্যানেজার নিয়োগ করতে হবে—সরকারি আমলা নয়।

ii) সরকারি ক্ষেত্রের পরিচালকদের অধিক স্বাধীনতা দিতে হবে।

iii) সরকারি উদ্যোগের কাজকর্মে বাইরের সংস্থার হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

iv) সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্কৃতির উন্নতি ঘটাতে হবে। বিভিন্ন উপায়ে এটি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবলম্বনীয় পদ্ধতিগুলি হল : মুনাফার ভাগাভাগি, উৎপাদনশীলতা-সংযুক্ত মজুরি, শ্রমিকদের কারখানা পরিচালনায় অংশগ্রহণ, উদ্যোগের শেয়ার শ্রমিকদের কিনতে সুযোগ দান প্রভৃতি।

v) কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োগ করতে হবে। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। দক্ষতা এবং নিয়মানুবর্তিতার জন্য এটি অতি আবশ্যক।

vi) একটি সর্বনিম্ন নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগের সাফল্য বিচার করতে হবে।

এ সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সরকারি ক্ষেত্রের দক্ষতা বাড়বে। তখন আর সরকারি উদ্যোগের বেসরকারিকরণের প্রয়োজন পড়বে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন, হোটেল ব্যবসা, পর্যটন, বস্ত্র বয়ন, রুটি তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ অপেক্ষা বেসরকারি উদ্যোগই কাম্য। সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ অথবা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ কোনোটিই পুরোপুরি কাম্য নয়।

4.6.3 ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের বিলগ্নিকরণ (Disinvestment of Public Sector in India)

1990-র দশকে ভারত সরকার বিভিন্ন সরকারি শিল্প উদ্যোগের শেয়ার ব্যক্তিগত পুঁজির কাছে বিক্রির কার্যক্রম গ্রহণ করে। একেই বিলগ্নিকরণ কর্মসূচি (disinvestment programme) বলা হয়। ভারতে বেসরকারিকরণের এটাই প্রধান পন্থা বা মাধ্যম হয়ে উঠেছে। 1991 সালের শিল্পনীতিতে বলা হয়, যে সমস্ত সরকারি উদ্যোগ দীর্ঘকাল ধরে রুগ্‌ণ, সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে কিনা, তা নির্ধারিত করতে Board for Industrial and Financial Reconstruction বা BIFR-এর কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হবে। প্রয়োজনে বোর্ড এই শিল্পগুলিকে অন্যশিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। নতুন শিল্পনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে রুগ্‌ণ হয়ে আছে এরূপ শিল্পকে বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে। একে বলা হয় exit policy বা বিদায় নীতি। এই সমস্ত শিল্পের শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে অবসর গ্রহণ করতে বলা হয়। একে বলা হয় সোনালি করমর্দনের নীতি (Policy of golden handshake)।এভাবে সরকারি উদ্যোগের বিলগ্নিকরণের কথা 1991 সালের নতুন শিল্প নীতিতে বলা হয়। সরকারকে বিলগ্নিকরণ সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য বিলগ্নিকরণ কমিশন গঠন করা হয় 1996 সালের আগস্ট মাসে। 1998 সালের 31 মার্চ প্রধান প্রধান যে সমস্ত শিল্প উদ্যোগে বিলগ্নিকরণ করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচের সারণিতে দেওয়া হল। কোম্পানির যত শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাও দেখানো হল।

সারণি 4.1

1991 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ভারতে উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগগুলিতে বিলগ্নিকরণ ও পরিমাণ

ক্রমিক সংখ্যা	কোম্পানির নাম	বিক্রিত শেয়ারের পরিমাণ (শতাংশ)
1.	Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	43.80
2.	Bharat Earthmovers Ltd.	34.19
3.	Bharat Petrolium Corporation Ltd.	33.80
4.	Videsh Sanchar Nigam Ltd.	33.04
5.	Bharat Heavy Electricals Ltd.	32.28
6.	Hindustan Zinc Ltd.	24.08
7.	Indian Petrochemical Corporation	22.98

টীকা : কোম্পানিগুলিকে বিলগ্নিকরণের পরিমাণ অনুযায়ী মানের অধঃক্রমে সাজানো হয়েছে।

সূত্র : Economic Survey, 2019, Government of India.

সম্প্রতি এই বিলগ্নিকরণ কর্মসূচি আরো গতিলাভ করেছে।

বিলগ্নিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারি উদ্যোগগুলির কর্মদক্ষতা বাড়ানো। সংক্ষেপে এই নীতির উদ্দেশ্যগুলি নীচে উল্লেখ করা হল :

(i) সরকারি উদ্যোগে বেসরকারি মূলধন ঢুকিয়ে সেগুলির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন,

(ii) সরকারি উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টি,

(iii) সরকারি উদ্যোগগুলিতে সরকারের ক্ষতির দায় কমানো,

(iv) সরকারি ঋণের ভার লাঘব করা,

(v) রুগ্‌ণ ও বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি উদ্যোগগুলির শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য বিলগ্নিকরণ তহবিল তৈরি করা প্রভৃতি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, 1991-92 সালে ভারতে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে এই বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যে সমস্ত সরকারি উদ্যোগে সরকারের শেয়ার অল্প, প্রথমে সেই সমস্ত উদ্যোগের শেয়ার বিক্রির কথা ভাবা হয়। কিন্তু পরে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মালিকানার কোম্পানিতে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া, সরকারি উদ্যোগের কিছু শেয়ার তাদের কর্মচারীদের নিকটও বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

4.6.4 ভারতে বিলগ্নিকরণের যৌক্তিকতা (Rational for Disinvestment in India)

আমরা ভারতে বিলগ্নিকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করব। সেই আলোচনা থেকেই ভারতে বিলগ্নিকরণ যুক্তিযুক্ত কিনা তা বোঝা যাবে।

বিলগ্নিকরণের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেখানো হয় :

1. সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর্থিক নীতি হিসাবে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এসব দেশেও ধনতন্ত্র তথা বাজার ব্যবস্থা ফিরে আসছে। তা ছাড়া, ধনতন্ত্র তার নানা অভ্যন্তরীণ বিরোধ সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছে। তাই অনেকে যুক্তি দেন যে, ধনতন্ত্রের ন্যায় বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটাতে হবে এবং সরকারি ক্ষেত্রে সংকুচিত করতে হবে।
2. সরকারি উদ্যোগের শেয়ার বিক্রি করে সরকার অতি প্রয়োজনীয় অর্থ পাবে যা দিয়ে অনেক জরুরি ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।
3. ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের পরিচালনা অনেক ক্ষেত্রেই অদক্ষ। অনেক সরকারি উদ্যোগ লোকসানে চলছে। এদের পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক। তা ছাড়া, অনেক সরকারি উদ্যোগের উৎপাদন ক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার হয় না। এছাড়া, এদের কাজকর্মে স্বাধীনতা কম এবং সেজন্য উৎসাহ কম। বেসরকারি ক্ষেত্রে এই সমস্ত অসুবিধা নেই।
4. সরকারি উদ্যোগগুলির কাজকর্ম দুর্নীতিপূর্ণ এবং অপচয়মূলক। সরকারি ক্ষেত্রের বিলগ্নিকরণ এই অপচয় দূর করবে বলে অনেকে দাবি করেন।
5. ভারতে সরকারি ঋণের আয়তন বিপুল আকার ধারণ করেছে। সরকারি উদ্যোগের বিলগ্নিকরণ ঘটিয়ে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে সরকারি ঋণের একাংশ মেটানো যাবে। এতে সরকারের ঋণের ভার কমবে।
6. সরকারি উদ্যোগগুলির কাজকর্মে নানা ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়। বিলগ্নিকরণ বা বেসরকারিকরণ ঘটলে এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমবে। সরকারি ইউনিটগুলি তখন স্বাধীনভাবে কাজ করবে। এতে তাদের দক্ষতা বাড়বে, কেননা বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এদের নমনীয়তা বাড়বে।
7. সরকারি উদ্যোগে বিলগ্নিকরণ ঘটলে তা বিদেশিমূলধন ও প্রযুক্তি আকৃষ্ট করবে বলে অনেকে দাবি করেন।
8. বিলগ্নিকরণের দ্বারা সরকারি কোম্পানিগুলিকে যদি যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে সেই ইউনিটগুলির পরিচালনায় দক্ষ উদ্যোগপতিদের আনা সম্ভব হবে। এগুলির পরিচালনায় পেশাদারিত্ব আসবে। ফলে এই যৌথ উদ্যোগগুলির দক্ষতা বাড়বে।
9. সরকারি উদ্যোগে বিলগ্নিকরণ ঘটলে অনেক ক্ষেত্রে এদের একচেটিয়া অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। এদের তখন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। আর প্রতিযোগিতার ফলে এদের দক্ষতা বাড়বে। দ্রব্যের ইউনিট প্রতি ব্যয় বা গড় ব্যয় কমবে। এতে জনসাধারণ, ভোগকারী এবং বিনিয়োগকারী সকলেরই সুবিধা হবে।
10. বিলগ্নিকরণের ফলে সরকারি উদ্যোগে বাণিজ্যিক ধ্যানধারণার প্রসার ঘটবে। সেগুলি আর সরকারের ছত্রছায়ায় থাকবে না। সেগুলি তখন নিজেদের সম্পদের কাম্য ও সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করবে। আধুনিক ও উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ করবে। ফলে কম ব্যয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হবে।
11. বিলগ্নিকরণের ফলে সরকারি উদ্যোগগুলিতে ভরতুকি কমবে। বিলগ্নিকৃত এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাজারের চাহিদা ও জোগানের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হবে। অনেকে দাবি করেন যে এর ফলে ঐ সমস্ত ইউনিটগুলির সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বাড়বে।

পাশাপাশি বিলগ্নিকরণের বিরুদ্ধেও নানা অভিমত আছে। সেই মতামতগুলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

1. সরকারি ক্ষেত্রের লক্ষ্য হল জনগণের কল্যাণ, আর বেসরকারি ক্ষেত্রের লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত মুনাফা, সুতরাং, সরকারি ক্ষেত্রের বিলগ্নিকরণ বা বেসরকারিকরণের ফলে সামাজিক কল্যাণের হ্রাস ঘটবে।
2. অনেকে আশঙ্কা করেছেন যে, বেসরকারিকরণের ফলে শ্রমিক শোষণ বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা কমবে এবং ফলে শিল্প বিরোধ বাড়বে। এতে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হবে।
3. বেসরকারিকরণের ফলে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটবে এবং অসাম্য বৃদ্ধি পাবে।
4. বেসরকারি ক্ষেত্রেও অনেক উদ্যোগ লোকসানে চলছে। সেগুলি দক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং, বেসরকারিকরণ বা বিলগ্নিকরণের ফলে দক্ষতা বাড়বেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
5. ভারত সরকার অনেক লাভজনক সরকারি সংস্থাতেও বিলগ্নিকরণ ঘটাচ্ছে। এটি আদৌ যুক্তিসম্মত ও ঠিক নয়।
6. ভারত সরকার বিলগ্নিকরণের কোনো নির্দিষ্ট নীতি ও স্বচ্ছ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। সরকার বিভিন্ন উদ্যোগের বিলগ্নিকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের অর্থপ্রাপ্তি কম হয়েছে।
7. বিলগ্নিকরণের ফলে মুষ্টিমেয় কিছু শিল্পগোষ্ঠী নানা উপায়ে সরকারি ক্ষেত্রগুলি হস্তগত করছে। এতে দেশে একচেটিয়া অবস্থার প্রসার ঘটছে।
8. অনেক ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের মূল্য কম ধরা হয়েছে। এর ফলে বড় শিল্পপতিরা অনেক সস্তায় সরকারি উদ্যোগ কিনতে সমর্থ হয়েছে। এটি বড় শিল্পপতিদের জনগণের সম্পদ পাইয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। সরকারি উদ্যোগের মূল্যায়নের নির্দিষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত নীতি ও পদ্ধতি থাকা বাঞ্ছনীয়।
9. অনেকে দেখিয়েছেন যে, কিছু সরকারি উদ্যোগ বিক্রি হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলির বেশি পরিমাণ জমি আছে বলে। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা এই উদ্যোগগুলি কেনার পর এদের জমিতে আবাসন ব্যবসায় খুলবে। ফলে ঐ উদ্যোগগুলির শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে।

আমরা উপসংহারে বলতে পারি যে, সরকারি ক্ষেত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার জন্য উপযুক্ত সমীক্ষা গ্রহণ করা দরকার। এদের দুর্বলতার কারণগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলি দূর করতে হবে। সরকারি ক্ষেত্রের ত্রুটি বা দুর্বলতা দূর করতে বিলগ্নিকরণ বা বেসরকারিকরণ যথার্থ উত্তর নয়। তা ছাড়া, কোনো সরকারি উদ্যোগ বিক্রির আগে সেটি অন্য কোনো লাভজনক সরকারি সংস্থার দ্বারা অধিগ্রহণ (take over) বা অন্তর্ভুক্তিকরণ (merger) ঘটানো যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখা দরকার। এছাড়া, কোনো সরকারি সংস্থার বিলগ্নিকরণের ক্ষেত্রে অন্য সরকারি ইউনিটকে তা কেনার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেন। আবার, শ্রমিকদের সমবায় গড়ে তাদের হাতে সবকারি উদ্যোগটির পরিচালনা ভার দেওয়া যেতে পারে। ভারতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার সুফল পাওয়া গেছে। আবার, অর্থনীতিবিদ হনুমন্ত রাও মনে করেন, ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণের পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিকতা হ্রাস করা দরকার। তিনি মনে করেন যে, এর ফলে অনেক সরকারি উদ্যোগের দক্ষতা বাড়বে এবং তারা মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে। তা ছাড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিসেবা সরকারের অধীনে থাকা উচিত, নতুবা সেগুলি দরিদ্র শ্রেণির ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রেই

শুধু বিলগ্নিকরণ বা বেসরকারিকরণ করা যেতে পারে, সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে নয়। মূল ও ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে এবং মুনাফা অর্জনকারী সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণ কাম্য নয়।

4.7 ভারতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) (Micro, Small and Medium Enterprises or MSME in India)

ভারতে ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে 2006 সালে একটি আইন পাশ হয়। এর নাম হল Micro, Small and Medium Enterprises Development আইন (বা MSMED Act)। এই আইনে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সেই তিনটি শ্রেণি হল : অতি ক্ষুদ্র (Micro), ক্ষুদ্র (Small), এবং মাঝারি (medium) উদ্যোগে। এদের একসাথে সংক্ষেপে MSME বলা হয়। এই শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি হল শিল্প ইউনিটটিতে বিনিয়োগের পরিমাণ। **কারখানা শিল্পোদ্যোগের** ক্ষেত্রে এই তিনটি শ্রেণির ভাগ বা সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

i) প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ 25 লক্ষ টাকা হলে সেই উদ্যোগকে বলা হবে অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ (micro enterprise)।

ii) প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ 2 কোটি টাকা হলে সেই উদ্যোগকে বলা হবে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ (small enterprise)।

iii) প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক 5 কোটি টাকা হলে তাকে মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (medium enterprise) বলা হবে।

সেবা উদ্যোগের (Service enterprise) ক্ষেত্রে সংজ্ঞা পৃথক।

i) যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা হলে তাকে বলা হবে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ।

ii) যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক 2 কোটি টাকা হলে তাকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ বলা হবে।

iii) যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক 5 কোটি টাকা বিনিয়োগ হলে সেটি হবে মাঝারি উদ্যোগ।

এরপর কোভিড অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে 2020 সালের মে মাসে সরকার শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞাকে আরো উদার করে। নতুন সংজ্ঞায় অতি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের সর্বাধিক বিনিয়োগ 1 কোটি টাকা, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ 10 কোটি টাকা এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে 20 কোটি টাকা করা হয়। উদ্দেশ্য হল, বেশি সংখ্যার উদ্যোগকে সরকারি সাহায্যের আওতায় আনা। এছাড়া, নতুন ঘোষণায় কারখানা শিল্পোদ্যোগ এবং সেবা উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়েছে।

4.7.1 ভারতীয় অর্থনীতিতে MSME-র ভূমিকা ও গুরুত্ব (Role and Importance of MSME in Indian Economy)

ভারতীয় অর্থনীতিতে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগের (MSME) শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। 2020 সালের মে মাসের সরকারি হিসাব অনুযায়ী ভারতে অতি ক্ষুদ্র (micro) শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা ছিল 63.05 মিলিয়ন, ক্ষুদ্র (small) শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা ছিল 3.3 লক্ষ এবং মাঝারি (medium) শিল্পের সংখ্যা ছিল প্রায়

5 হাজার। তবে 2020 সালের মার্চ মাসে কোভিড মহামারির শুরু হবার ফলে অনেক অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র ইউনিট বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য সরকারি তথ্য নেই। তবে 2020 সালের 25 মার্চ থেকে 31 মে 2020 পর্যন্ত দীর্ঘ 68 দিন সর্বভারতীয় লকডাউন এবং রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে অসংখ্য লক ডাউনের ফলে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্প যে বন্ধ হয়ে যায়, তা সহজেই অনুমেয়। উপরে উল্লিখিত সংখ্যা ছাড়াও নথিভুক্ত নয় এরূপ 10 লক্ষের বেশি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট বর্তমানে ভারতে রয়েছে। এদের উৎপাদনেও বৈচিত্র্য রয়েছে। সরল ভোগ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নানা রকম জটিল বৈদ্যুতিন দ্রব্যও আজকাল ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি হচ্ছে। 2020 সালের মে মাসের উপরোক্ত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি সবাই মিলে প্রায় 7,500 রকমের দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করে। প্রায় এক হাজারের মতো দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত।

ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শিল্পের অবদান বিবেচনা করব।

1. দেশের মোট শিল্পোৎপাদনে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান

ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদনের 40 শতাংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপন্ন হয়। 1997-98 সালে ক্ষুদ্র শিল্পের মোট উৎপাদন মূল্য ছিল চলতি মাসে 4,65,171 কোটি টাকা। 1990-91থেকে 1997-98 সালের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় 17 শতাংশ। বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। 2006-07 সালে ক্ষুদ্র শিল্পের মোট উৎপাদনের পরিমাণ চলতি দামে প্রায় 12 লক্ষ কোটি টাকা। 2012-13 সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় চলতি দামে 18 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থাৎ মাত্র 6 বছরে উৎপাদন দেড়গুণেরও বেশি বেড়েছে।

2. দেশের মোট কর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান

কর্মসংস্থানের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান ও গুরুত্ব খুবই বেশি। ভারতে কৃষির পরেই প্রধান জীবিকা হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির উৎপাদন পদ্ধতি শ্রম নিবিড়। ফলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটলে অধিক কর্মসংস্থান ঘটে। বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষমতা 4 গুণেরও বেশি। সুতরাং, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দিতে হলে ক্ষুদ্র শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। 1997-98 সালে ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল 167 লক্ষ। 2013-14 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 1,114 লক্ষ। অবশ্য 2020 সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 1,100 লক্ষ। এর পিছনে প্রধান কারণ হল রুগ্ন শিল্পের সমস্যা। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে অনেক ক্ষুদ্র ইউনিট রুগ্ন হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। এর জন্যই ক্ষুদ্র শিল্পে মোট কর্মসংস্থান কিছুটা কমে গেছে।

3. দেশের মোট রপ্তানিতে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান

ভারতের মোট রপ্তানিতে ক্ষুদ্রশিল্পের বড় অবদান আছে। আমাদের মোট রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উৎপাদন করে থাকে। রপ্তানির জন্য ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : তৈরি করা জামাকাপড়, চামড়ার চটি জুতো, হোসিয়ারি দ্রব্য, অলংকার দ্রব্য প্রভৃতি। 1997-98 সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি ছিল 43,946 কোটি টাকা। 2012-13 সালে এই শিল্পের রপ্তানির পরিমাণ ছিল 6,77,318 কোটি টাকার মতো (2001-02 সালের মূল্যস্তরে)। 2018-19 সালে MSME-র

রপ্তানির পরিমাণ ছিল 147.4 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রপ্তানি বৃদ্ধির অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব খুব বেশি। বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার উভয়ই যথেষ্ট বেশি। ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে ব্যাপক বেকারত্ব রয়েছে। এখানে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পক্ষে আর একটি যুক্তি হল সমতার যুক্তি। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন শ্রম নিবিড়। ফলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটলে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আয় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আয় বণ্টনের বৈষম্য কমে। আবার ক্ষুদ্র শিল্প দেশের সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। দেশের অনগ্রসর অঞ্চলেও ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপন করা যায়। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার এভাবে দেশের শিল্পের বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া, ক্ষুদ্র শিল্প স্থানীয় সুপ্ত সম্পদের ব্যবহার ঘটাতেও সাহায্য করে। সুতরাং, নানা দিক থেকেই ভারতের ন্যায় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

4.7.2 ভারতে MSME-র সমস্যাবলি (Problems of MSME in India)

ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (বর্তমানে এদের MSME বা Micro, Small and Medium Enterprises) গুরুত্ব অপরিসীম। নানা কারণে এগুলির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের অনুকূলে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া যেতে পারে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

কর্মসংস্থানের যুক্তি, সমতার যুক্তি, সুপ্ত এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের যুক্তি, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের যুক্তি বা শিল্পের আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের যুক্তি, বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় ও অর্জনর যুক্তি, মূলধন স্বল্পতার যুক্তি, বৃহৎ শিল্পের পরিপূরকতার যুক্তি প্রভৃতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের MSME-গুলি বর্তমানে নানা সমস্যায় ভুগছে। ফলে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রসার ঘটছে না। তাদের উন্নয়ন ও প্রসারের পথে নানা বাধা রয়েছে। ভারতের অতি ক্ষুদ্র,ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি যে সমস্ত বাধা বা সমস্যার সম্মুখীন, সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

1. মূলধনের সমস্যা (Problem of Capital) : ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রধান সমস্যা হল মূলধনের সমস্যা। এদের মূলধনের পরিমাণ স্বল্প। মূলধনের অভাবের জন্য এরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কিনতে পারে না। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এরা সহজে ঋণ পায় না। তাই মূলধনের জন্য এদের ব্যবসায়ীদের কাছে ও নানা অ-প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রের কাছে আবেদন করতে হয়। এতে একদিকে যেমন ঋণের সুদ বেশি পড়ে। অন্যদিকে ঐ ব্যবসায়ী বা ঋণদাতারা কম দামে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য নেয়। এভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকরা দু'দিক থেকে শোষিত হয়। তাদের ঋণের উপর সুদ বেশি দিতে হয় এবং তারা উৎপন্ন দ্রব্যের কম দাম পায়।

2. কাঁচামালের সমস্যা (Problem of raw materials) : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আর একটি সমস্যা হল কাঁচামালের সমস্যা। তারা নিয়মিতভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে না। এর পিছনে প্রধানত কাজ করে মূলধনের সমস্যা। মূলধনের অভাবে এরা একসঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমস্ত কাঁচামাল কিনতে পারে না। বারবার অল্প পরিমাণ কাঁচামাল কিনলে গাড়িভাড়া, মাল তোলা, মাল নামানো, মাল কিনতে যাওয়ার জন্য সময় ও অর্থের ব্যয় সবই বেশি পড়ে। তা ছাড়া, অল্প পরিমাণ কাঁচামাল কিনলে দামের সুবিধা পাওয়া যায় না। এছাড়া,

ফড়ে ও দালালদের কাছ থেকে অনেক সময় বেশি দামে কাঁচামাল কিনতে হয়। বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলি নানা সমস্যায় পড়ে। এসমস্ত কারণে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশ অনেক সময়ই বাধা প্রাপ্ত হয়।

3. পণ্য বিক্রয়ের সমস্যা (Problem of marketing the products) : MSME গুলির, বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্পগুলির আর একটি সমস্যা হল তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সমস্যা। এই শিল্পের মালিকেরা প্রায়শই তাদের পণ্যের জন্য নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য তারা দালাল, ফড়ে ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। এতে তারা দ্রব্যের কম দাম পায়। এছাড়া, ক্ষুদ্র শিল্পদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রায়শই সংগঠিত বাজারের অভাব। বাজার সম্পর্কে তাদের কাছে সঠিক তথ্য থাকে না। তাছাড়া, উৎপন্ন দ্রব্যের নির্দিষ্ট মানেরও অভাব রয়েছে। এসমস্ত সমস্যার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকরা প্রায়শই তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য দাম পায় না।

4. অসম প্রতিযোগিতার সমস্যা (Problem of unequal competition) : ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অনেক সময় বড় শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই প্রতিযোগিতা দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে হাতে পারে, আবার কাঁচামালের জন্যও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রতিযোগিতা অসম প্রতিযোগিতা। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি প্রায়শই বড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। আবার, অনেক সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি যে দ্রব্য উৎপাদন করে, সেই দ্রব্য বিদেশ থেকে অবাধে আমদানি করা হতে পারে। বিদেশি দ্রব্যের দাম কম হলে বা গুণগতমান ভালো হলে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিযোগিতায় মার খায়। উদাহরণস্বরূপ, চিন থেকে আসা নানা ছোট ছোট ইলেকট্রনিক দ্রব্য এবং খেলনার ক্ষেত্রে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এ সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। তারা দেশের বাজার হারাচ্ছে এবং অনেক ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট রুগণ্-হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

5. প্রযুক্তির সমস্যা (Problem of technology) : ভারতের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ইউনিটে চিরাচরিত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। খুব কম শিল্প ইউনিটে উন্নত ও অধুনিক যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়। বিশেষত, কিছু ক্ষুদ্র শিল্প শিল্পী ও কারিগরদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও নিপুণতার উপর নির্ভর করে। এখন, ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপন্ন দ্রব্যেরও উপযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য চাই উপযুক্ত গবেষণা ও শিল্পীদের প্রশিক্ষণ। এগুলির অভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

6. উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহারের সমস্যা (Problem of under-utilisation of production capacity) : ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তাদের উৎপাদন ক্ষমতায় প্রায় অর্ধেকই ব্যবহার করতে পারে না। নানা কারণে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : কাঁচামালের অভাব, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের অভাব, পরিকাঠামোর অভাব প্রভৃতি।

7. রুগ্ণ ইউনিটের সমস্যা (Problem of sick units) : ক্ষুদ্রশিল্পের উপরোক্ত সমস্যাগুলির জন্য এই শিল্পের অনেক ইউনিট দিন দিন রুগ্ণ হয়ে পড়ছে। তাদের পরিসম্পদ অপেক্ষা দায়ের ভার বেশি হয়ে পড়ছে। এই রুগ্ণ-শিল্পগুলির পুনর্বাসন করাও সরকারের একটি বড় সমস্যা।

4.7.3 MSME-র সমস্যা দূর করতে সরকারি ব্যবস্থা ও তার মূল্যায়ন (Government Measures to Remove the Problems of MSME)

ভারতের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি (MSME) নানা সমস্যায় পীড়িত। তার যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : স্বল্প মূলধনের সমস্যা, কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সমস্যা, পুরনো প্রযুক্তির সমস্যা, অসম প্রতিযোগিতার সমস্যা, উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহারের সমস্যা প্রভৃতি। এই সমস্যাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সংক্ষেপে সেই ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ :

1. বিভিন্ন বোর্ড গঠন (Formation of Various Boards) : ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার বিভিন্ন কমিশন ও বোর্ড গঠন করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সর্বভারতীয় তাঁত শিল্প বোর্ড, সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন, সর্বভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড, কেন্দ্রীয় শিল্প বোর্ড প্রভৃতি। এছাড়া চা ও কফি শিল্পের জন্য টি বোর্ড এবং কফি বোর্ড গঠন করা রয়েছে। এইসব বোর্ড সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

2. যন্ত্রপাতি ও অর্ডার সংগ্রহে সাহায্য (Assistance to mobilise machinery and orders) : ক্ষুদ্র শিল্পগুলির যন্ত্রপাতি সংগ্রহে সাহায্য করা বা তাদের অর্ডার জোগানে সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার 1955 সালে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National small Industries Corporation বা NSIC) গঠন করেছে। এছাড়া, ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে (1980-85) জেলাস্তরে জেলা শিল্প কেন্দ্র (District Industries বা DIC) গঠন করা হয়েছে।

3. মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা (Measure to supply capital) : অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিটগুলির মূলধনের সমস্যা দূর করার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদানকারী নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন সমূহ (State Financial Corpration বা SFC_s)। প্রতিটি রাজ্যেই এরূপ অর্থ কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, 1969 ও 1980 সালে দু'দফায় বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। জাতীয় করণের পর ব্যাংকগুলির ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান বেড়েছে। আবার, 1989 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক (Small Industries Development Bank of India বা SIDBI)। এই সংস্থা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণদানকারী সংস্থাগুলির শীর্ষস্থানীয় সংস্থা হিসাবে কাজ করেছে।

4. ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষণ (Protection to small industries) : বড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দূর করতে সরকার বেশ কিছু সংখ্যক দ্রব্যের উৎপাদন শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে। 2020 সালে এই ধরনের দ্রব্যের সংখ্যা ছিল 800-এর বেশি। বড় শিল্পগুলির এইসকল দ্রব্য উৎপাদনের অনুমতি নেই।

5. কারিগরি উন্নয়নে পদ ক্ষেপ (Measures for technical development) : ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য 1945 স্থাপিত হয়েছে Small Industries Development Organisation (SIDO)। এর কাজ হল ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরি উন্নয়নে সাহায্য করা, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং নানা ধরনের পরামর্শ দেওয়া।

6. অন্যান্য ব্যবস্থা (Other measures) : ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সাহায্য করার জন্য আরও কতকগুলিব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান কয়েকটি ব্যবস্থা হল নিম্নরূপ :

i) ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য অল্প সুদে কিস্তির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা,

ii) ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সহজ শর্তে জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা,

iii) সরকার দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যকে অগ্রাধিকার;

iv) ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করতে সহজে অনুমতি,

v) কিছু ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের উপর বিক্রয় করে ছাড়,

vi) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সাহায্য করার জন্য শিল্পতালুক গড়ে তোলা,

vii) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সস্তায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, এবং

viii) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ছোটো যন্ত্রপাতি জোগান দেওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সমস্যা তেমন মেটেনি। একথা ঠিক যে, ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। আগে সরকারের নীতি ছিল পরোক্ষ। আগে মনে করা হত যে, বড় শিল্পের আয়তন বেঁধে দিলে ছোটো শিল্পগুলো আর তাদের প্রতিযোগিতার সামনে পড়বে না। ফলে ছোটোশিল্পগুলি আপনা আপনিই বেড়ে উঠবে। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির বর্তমানে পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সরকার প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সরকারের এই প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের নীতি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান যুক্তি হল কর্মসংস্থানের যুক্তি এবং আয় বৈষম্য হ্রাসের যুক্তি। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পক্ষে আর একটি যুক্তি শিল্পের বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের যুক্তি। সুতরাং, ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, আয় বৈষম্য এবং শিল্পের বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য বা অসমতা দূর করতে হলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার খুবই প্রয়োজন। সুতরাং, ক্ষুদ্র শিল্পকে এই সরকারি সাহায্য দানের নীতি খুবই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই সাহায্য দান সফল করতে হলে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিতে এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। নতুবা এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চাপে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু ভারতে এখন উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের আইন (MRTP Act) তুলে দেওয়া হয়েছে। একচেটিয়া কমিশনের আর অস্তিত্ব নেই। পরিবর্তে এসেছে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (Competition Commission of India বা CCI)। এই কমিশন 2003 সালে গঠিত হয় এবং 2009 সাল থেকে পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে। এই ব্যবস্থায় বৃহৎ শিল্পের আয়তনের উপরে কোনো বিধি নিষেধ নেই; শুধুমাত্র অসুস্থ প্রতিযোগিতা এড়াতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও আইনে নানা ফাঁকফোঁকর রয়ে গেছে। তাছাড়া, বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিকে এদেশে অবাধে ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সরকারি ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এক কথায়, ভারত অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থার দিকে এগোচ্ছে। এতে দুর্বল মার খাবে, সবল আধিপত্য বিস্তার করবে। ভারতে আগামী দিনগুলিতে তাই ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার সম্পর্কে আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

4.8 ভারতে সেবাক্ষেত্র (Service Sector in India)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক ক্ষেত্রের কার্যকলাপ, মাধ্যমিক ক্ষেত্রের কার্যকলাপ এবং সেবা ক্ষেত্রের কার্যকলাপ। সেই অনুযায়ী ঐ দেশের অর্থনীতিটিকে তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক ক্ষেত্র, মাধ্যমিক ক্ষেত্র এবং সেবা ক্ষেত্র। প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিল্প, নির্মাণ কার্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ প্রভৃতি। সেবা ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ প্রভৃতি। আমরা এই বিভাগে ভারতের সেবা ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যাংক ও বিমা ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব।

4.9 সংস্কার-পূর্ববর্তীকালে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতি (Progress of the Indian Banking System during the Pre-reform Period)

ভারতে আর্থিক সংস্কার শুরু হয় মোটামুটি 1985 সাল থেকে। এই সংস্কার প্রক্রিয়া আরো গতি পায় 1991 সালে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণার পর। 1991 সালের পূর্বে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার কেমন অগ্রগতি ঘটেছিল তা সংক্ষেপে আমরা বর্ণনা করব।

ভারতে সংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যাংক ছিল ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান। 1770 সালে স্থাপিত এই ব্যাংক অবশ্য 1829-32 সালের মধ্যে দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাংক হল জেনারেল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এটি স্থাপিত হয় 1786 সালে। কিন্তু এই ব্যাংকও 1791 সালে ফেল করে। দেখা যাচ্ছে, সেই সময়ের অধিকাংশ ব্যাংকই বেশিদিন টেকেনি। ব্যাংক পরিচালনার নানা বিচ্যুতিই হয়তো সেজন্য দায়ী। শুধু বর্তমানের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI) সেই সময় থেকে এখনও সফলভাবে তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তখন অবশ্য এর নাম ছিল অফ ক্যালকাটা যা 1806 সালে স্থাপিত হয়। এই ব্যাংক, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি ব্যাংক মিলে 1921 সালে তৈরি হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এরপর ভারত স্বাধীন হলে 1955 সালে এই ব্যাংকের নামকরণ হয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। দীর্ঘদিন ধরে এই তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক আধা-কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কাজ করেছে। সেই সময়কার কিছু ব্যাংক ছিল রাষ্ট্র-পোষিত ব্যাংক (State association banks)। পরবর্তী কালে সাতটি এরূপ রাষ্ট্র-পোষিত ব্যাংককে স্টেট ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়। এদের বলা হত সহযোগী ব্যাংক। স্টেট ব্যাংক এবং তার সহযোগী ব্যাংকগুলিকে একত্রে বলা হত স্টেট ব্যাংক গ্রুপ। সংস্কার-পরবর্তীকালে অবশ্য স্টেট ব্যাংকের সহযোগী ব্যাংকগুলিকে ক্রমে ক্রমে মূল স্টেট ব্যাংকের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময়কার (1840-1900) অন্যান্য ব্যাংকগুলি ছিল বেসরকারি ব্যাংক বা ব্যক্তিগত মূলধনে গড়ে ওঠা ব্যাংক।

এরপর 1926 সালে গঠিত হয় Hilton Young Commission যার বিচার্য ছিল ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপনের বিষয়টি। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে 1935 সালের 1এপ্রিল বেসরকারি কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক। এটিই ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। স্বাধীনতার পর 1949 সালের। জানুয়ারি এটিকে সরকারি ব্যাংকে পরিণত করা হয়। এই ব্যাংক স্থাপনের উদ্দেশ্য হল দেশে উন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সুষ্ঠু ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং টাকার বাজার ও মূলধনের বাজারকে সুসংগঠিত করা।

এরপর ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বাণিজ্যিক ব্যাংকের জাতীয়করণ। 1969 সালের 14 টি বড় প্রাইভেট ব্যাংক এবং 1980 সালে আরও 6টি ব্যাংকের জাতীয়করণ করা হয়। এই জাতীয়করণের পূর্বে ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। সেই সময়কার ব্যাংক ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

i) মাত্র কয়েকটি ব্যাংক সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত।

ii) বড় শিল্পপতিরা ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত।

iii) ব্যাংকের মালিক এবং পরিচালকরা নানাভাবে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করত।

iv) ব্যাংকগুলি ফাটকা কারবারে ঋণ দিত এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের নানাভাবে সাহায্য করত।

v) গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ দিতে অথবা গ্রামাঞ্চলে শাখা বিস্তারে ব্যাংকগুলি আগ্রহ দেখায়নি।

এই সমস্ত অসুবিধাগুলি এবং ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্যই ভারত সরকার ব্যাংক জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ব্যাংক জাতীয়করণের পিছনে সরকারের যে সমস্ত মুখ্য উদ্দেশ্য কাজ করেছে। সংক্ষেপে সেগুলি হল :

i) ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কেন্দ্রায়ন হ্রাস করা,

ii) ফাটকা ব্যবসায়ে ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা,

iii) ব্যাংকগুলির অসাধু কার্যকলাপ বন্ধ করা,

iv) গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকগুলির শাখা প্রসার,

v) কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে অধিক ঋণদান প্রভৃতি।

অনেকে অবশ্য ব্যাংক জাতীয়করণের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের যুক্তিগুলি ছিল নিম্নরূপ :

a) জাতীয়করণ করা হলে ব্যাংকগুলির কর্মদক্ষতা হ্রাস পাবে।

b) ব্যাংক মালিকদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর টাকা দিতে হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেত।

c) জাতীয়করণ করার ফলে শিল্পক্ষেত্রে ঋণদানের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

d) ব্যাংকগুলি সরকারি মালিকানায় এলে তাদের কাজকর্ম বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হবে প্রভৃতি।

জাতীয়করণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাজকর্মে তিনটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। সেই তিনটি ক্ষেত্র হল : (i) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের প্রসার, (ii) গ্রামাঞ্চলে শাখা বিস্তার এবং (iii) আমানত সংগ্রহ বৃদ্ধি। যেমন, 1969 সালে ব্যাংকগুলি তাঁদের মোট ঋণের 14.6 শতাংশ দিয়েছিল অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে। 1998 সালে মোট ঋণের 42 শতাংশ দেওয়া হয় অগ্রাধিকার ক্ষেত্রকে অর্থাৎ কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ছোট ব্যবসায়ী, স্বনিযুক্ত ব্যক্তি প্রভৃতিকে। ব্যাংকের শাখা বিস্তারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। জাতীয়করণের আগে 63,500 লোকপিছু একটি করে ব্যাংকের শাখা অফিস ছিল। 1998 সালে 15,000 লোকপিছু ব্যাংকের একটি শাখা অফিস খোলা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয়করণের পর ব্যাংকগুলির আমানত

সংগ্রহের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1969 সালের জুন মাসের শেষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানতের পরিমাণ ছিল মোটামুটি 4,650 কোটি টাকা। 1998-98 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 7,71,680 কোটি টাকা অর্থাৎ 30 বছরে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ 165 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, ব্যাংক জাতীয়করণের অবশ্যই কিছু সুফল পাওয়া গেছে।

অবশ্য ব্যাংক জাতীয়করণের পর কয়েকটি ত্রুটিও লক্ষ করা গেছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। **প্রথমত,** ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ করা সত্ত্বেও তাদের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ, যেমন, ফাটকা বাজারে টাকা খাটানো প্রভৃতি বন্ধ করা যায়নি। **দ্বিতীয়ত,** ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা হ্রাস পেয়েছে এবং ব্যাংকের গ্রাহক পরিসেবার অবনতি ঘটেছে। **তৃতীয়ত,** অপব্যয়, দক্ষতাহীনতা, অযোগ্য পরিচালনা, লালফিতের বাঁধন, দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি দোষগুলি অন্যান্য সরকারি সংস্থায় যেমন দেখা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতেও সেই রকম দেখা গেছে।

4.9.1 ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার : নরসিংহম কমিটির প্রতিবেদন (Banking Sector Reforms in India : Report of Narasimham Committee)

আমরা জানি, ভারতে আর্থিক সংস্কার শুরু হয় মোটামুটিভাবে 1985 সাল থেকে এবং তা আরো গতি পায় 1991 সাল থেকে। ঐ বছর ভারত সরকার নতুন শিল্পনীতি এবং নয়া আর্থিকনীতি প্রণয়ন করে। এই নীতির মূলকথা হল : (i) উদারীকরণ অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, (ii) বেসরকারিকরণ অর্থাৎ সরকারি ক্ষেত্রের সংকোচন এবং (iii) বিশ্বায়ন অর্থাৎ দেশীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্তকরণ। এই তিনটি কার্যক্রমকে একসঙ্গে বলা হয় : উদারীকরণ (Liberalisation), বেসরকারিকরণ (Privatisation) এবং বিশ্বায়ন (Globalisation) বা সংক্ষেপে LPG বলা হয়। এই সংস্কার কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারত সরকার ব্যাংকিং ক্ষেত্রেও উপযুক্ত সংস্কারের উদ্যোগে গ্রহণ করে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে 1991 সালে ভারত সরকার এম. নরসিংহম-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ঐ বছর নভেম্বর মাসে তারা রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশগুলি আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

একথা ঠিক যে, ব্যাংক জাতীয়করণের পর ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ব্যাংকগুলির আমানত সংগ্রহের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাংকগুলি গ্রামাঞ্চলে শাখা বিস্তার করেছে। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে তাদের ঋণদানের পরিমাণও বেড়েছে। কিন্তু, পাশাপাশি, জাতীয়করণের পর ব্যাংকগুলির কর্মদক্ষতা হ্রাস পেয়েছে। তাদের মুনাফাও হ্রাস পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নরসিংহম কমিটি গঠিত হয়। সংক্ষেপে এই কমিটির সুপারিশগুলি নিম্নরূপ :

1. ব্যাংকগুলির কাজকর্মে স্বাধীনতা : কমিটির মতে, অত্যধিক কেন্দ্রীয় নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না। এদের কাজকর্মে অযথা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এতে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। কমিটির সুপারিশ হল, ব্যাংকগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং এগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব কম রাখতে হবে।

2. আইনসম্মত তারল্য অনুপাত হ্রাস : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে তাদের আমানতের একটা অংশ সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োগ করতে হয়। একে বলে আইনসম্মত তারল্য অনুপাত। কমিটির মতে, এই আইন সম্মত

তারল্য অনুপাত (Statutory Liquidity Ratio বা SLR) খুব বেশি। এর ফলে ব্যাংকগুলিকে কম সুদে সরকারি ঋণপত্রে অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলির মুনাফা কমে যাচ্ছে। কমিটির সুপারিশ হল যে, SLR কে ঐ সময়ের 38.5 শতাংশ থেকে কমিয়ে সর্বনিম্ন 25 শতাংশে আনতে হবে। এতে ব্যাংকগুলির হাতে বাড়তি নগদ অর্থ আসবে। এই অর্থ তারা কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্যে ঋণ দিয়ে বাড়তি আয় করতে পারবে।

3. নগদ জমার অনুপাত হ্রাস : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে তাদের আমানতের নির্দিষ্ট অংশ নগদ অর্থে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয়। একে বলা হয় নগদ জমার অনুপাত (Cash Reserve Ratio বা CRR)। এটি রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পদ্ধতি। নরসিংহম কমিটির মতে, ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের খোলা বাজারের কার্যকলাপের (Open Market Operation বা OMO) উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, নগদ জমার অনুপাতের উপর নয়। তাই কমিটি নগদ জমার অনুপাত কমানোর সুপারিশ করেছে এবং বলেছে যে, একটি ন্যূনতম নগদ জমা অনুপাতের বেশি নগদ অর্থ যদি ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে রাখে, তাহলে রিজার্ভ ব্যাংককে সেই বাড়তি অর্থের উপর বেশি হারে সুদ ব্যাংকগুলিকে দিতে হবে। সেক্ষেত্রেও ব্যাংকগুলি অধিক আয় করতে সক্ষম হবে।

4. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ হ্রাস : কমিটি লক্ষ করেছে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিকে কম সুদে ঋণ দিতে হয়। এতে ব্যাংকগুলির আয় কম হয়। নরসিংহম কমিটি সুপারিশ করে যে, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ সেই সময়ের 40 শতাংশের হার থেকে কমিয়ে 10 শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে এবং পরবর্তী তিন বছরে একে সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে।

5. বাজারি সুদের হার : নরসিংহম কমিটির সুপারিশ হল যে, ঋণের উপর সুদের হার বাজারের শক্তির দ্বারা অর্থাৎ চাহিদা ও জোগানের শক্তির দ্বারাই নির্ধারিত হতে হবে। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলি যে সুবিধাজনক হারে ঋণ পেত, সেই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বাতিল করতে হবে। কমিটি আরও সুপারিশ করে যে, সুদের হারের কাঠামো সরল করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের যে ব্যাংক রেট, সেটিই হবে বাজারের প্রধান সুদের হার। অন্যান্য সুদের হার এই ব্যাংক রেটের সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকবে।

6. ব্যাংক ব্যবস্থার পরিকাঠামো পরিবর্তন : কমিটি চার স্তর বিশিষ্ট ব্যাংকিং কাঠামো গড়ে তোলার সুপারিশ করে। (i) স্টেট ব্যাংক সহ তিন-চারটি বড় ব্যাংক থাকবে আন্তর্জাতিক স্তরের। (ii) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা কমিয়ে আট থেকে দশের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। (iii) কোনো বিশেষ স্থানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় ব্যাংক গঠন করতে হবে। (iv) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির কাজকর্ম শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

এছাড়া কমিটি আরও সুপারিশ করে যে, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির ব্রাঞ্চ খোলা বা বন্ধের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি নেওয়ার প্রথা তুলে দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাংকের অলাভজনক শাখাগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। আর কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে না, এই মর্মে সরকারকে ঘোষণা করতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে আরও ব্যাংক খোলার দিকে রিজার্ভ ব্যাংককে দৃষ্টি দিতে হবে। বিদেশি ব্যাংকগুলিতে ভারতে অবাধে ব্যবসা করার অনুমতি দিতে হবে। এতে ব্যাংকিং কাজকর্মে প্রতিযোগিতা বাড়বে। কমিটি আরও সুপারিশ করে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির শেয়ার জনসাধারণের কাছে শেয়ার বাজারের মাধ্যমে বিক্রি করতে হবে।

7. অনাদায়ী ঋণের পুনরুদ্ধার : ব্যাংকগুলির দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ঋণ উদ্ধার করার জন্য কমিটি Asset

Reconstruction Fund বা ARF নামক সংস্থা গঠনের সুপারিশ করেছে। ব্যাংকগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিসম্পদ বা কাগজপত্র আছে, সেগুলি এই সংস্থা কম দামে কিনে নেবে এবং ঐ ঋণ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে।

8. দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ : ব্যাংকগুলিকে একদিকে নিয়ন্ত্রণ করে রিজার্ভ ব্যাংক এবং অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের অর্থ মন্ত্রকের অধীন ব্যাংকিং বিভাগ। নরসিংহম কমিটি এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করে কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাংকের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করেছে। কমিটির আরও সুপারিশ হল যে, ব্যাংকগুলির উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বাতিল করতে হবে।

9. অব্যাংক সংস্থা সম্পর্কে সুপারিশ : নরসিংহম কমিটির অন্যান্য কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল ঃ মিউচুয়াল ফান্ডের কাজকর্ম আরও বেশি প্রসারিত করতে হবে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে হবে এবং সেগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এছাড়া, মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মধ্যে যাতে অসম প্রতিযোগিতা না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

4.9.2 নরসিংহম কমিটির সুপারিশের মূল্যায়ণ (An Evaluation of Recommendations of Narasimham Committee)

নরসিংহম কমিটির মূল সুপারিশগুলি ছিল : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে কাজকর্মের স্বাধীনতা, আইনসম্মত নগদ জমার অনুপাত হ্রাস, অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ হ্রাস, বাজারি সুদের হারের প্রবর্তন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা আট থেকে দশের মধ্যে নামিয়ে আনা, বিদেশি ব্যাংকের প্রবেশের সুযোগ, বেসরকারি ব্যাংকের প্রসার ঘটানো, মিউচুয়াল ফান্ড এবং অন্যান্য অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের প্রসার ঘটানো, ব্যাংকগুলির নিয়ন্ত্রণের দ্বৈত ব্যবস্থার বিলোপ এবং কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাংদ্ধ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, চার স্তর বিশিষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি। কমিটির কিছু কিছু সুপারিশ ভারত সরকার রূপায়িত করেছে। যেমন, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাংকগুলির SLR 38.5 শতাংশ থেকে কমিয়ে 25 শতাংশ করা হয়েছে। সুদের হার এখন অনেকখানিই বাজারি শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। অধিগ্রহণ এবং সংযুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা কমানো হচ্ছে। 2022 সালের 1 মে স্টেট ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বারো (12)। সরকার আরো দু'একটি ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের (merger) কথা ভাবছে।

নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলির ভারতের অর্থনীতিতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। একদল মনে করেন যে, এই সুপারিশগুলি কার্যকর হলে ব্যাংক ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়বে। ফলে তারা এই সুপারিশগুলোকে অভিনন্দন জানিয়েছে। অন্যদিকে, আরেক দল মনে করেন যে, কমিটির সুপারিশগুলি IMF (International Monetary Fund)-এর নির্দেশ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়নগুলিও কমিটির সুপারিশগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাদের অবশ্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ভয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা কমার ফলে কর্মী সংকোচনের ভয়। তাদের প্রধান বিরোধিতা তাই বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে। এতে তাদের চাকরির নিরাপত্তা কমবে বলে তারা আশংকা করছে। আমরা নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলির একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের চেষ্টা করতে পারি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের উদারীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখেই নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলি করা হয়েছে। কমিটি সঠিক মন্তব্য করেছে যে, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যাংকগুলির কর্মদক্ষতা নষ্ট করছে। তাদের কাজকর্মে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও করা হচ্ছে। তা ছাড়া, ব্যাংক জাতীয়করণের পর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির দক্ষতা কমেছে। কমিটি তাই সঠিকভাবেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমানোর কথা বলেছে। তা ছাড়া,

ব্যাংকিং ক্ষেত্রের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বেসরকারিকরণের এবং বিদেশি ব্যাংকের প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। তবে নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলি সম্পর্কেও কয়েকটি প্রশ্ন তোলা যায়। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, ভারতের ন্যায় কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে সরকারের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র থাকে। তার উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য সুদসহ নানা আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র আর সহজশর্তে ঋণ পাবে না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সাফল্য কেবলমাত্র মুনাফার ভিত্তিতে কমিটি বিচার করেছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ভারতের বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ব্যাংক সহজ সুদে টাকা ধার দিচ্ছে। এতে ব্যাংকের মুনাফা কমছে বটে, কিন্তু ব্যাংকের এই পদক্ষেপ সমর্থনীয়।

তৃতীয়ত, ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে ব্যাংকের টাকা ফাটকা বাজিতে এবং অন্যান্য অকাম্য কাজে লাগবে। এতে টাকার বাজারে অস্থিরতা দেখা দেবে।

চতুর্থত, কমিটি ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আনার সুপারিশ করেছে। এতে আমানতকারীদের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। বেসরকারি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে পড়লে অসংখ্য ক্ষুদ্র আমানতকারী তাদের সামান্য সঞ্চয়টুকু হারাবে।

আমরা উপসংহারে বলবো যে, অনেক রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকই লাভজনকভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে। আবার বেসরকারি কোনো কোনো ব্যাংকে লোকসানও হচ্ছে। সুতরাং কোনো ব্যাংককে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সেটি লাভজনক সংস্থায় পরিণত হবে, তা নাও হতে পারে। যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে লোকসান হচ্ছে, তাদের লোকসানের কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং তার সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। নিছক বেসরকারিকরণ বোধহয় এই সমস্যার সমাধান নয়। তা ছাড়া, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও অনেক বেসরকারি ব্যাংক ফেল করে। যেমন, 2007 ডিসেম্বর থেকে 2009 ডিসেম্বর পর্যন্ত যে বিশাল মন্দা হয়েছিল, তাতে আমেরিকার অনেক বড় ব্যাংকই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (যাকে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা চলে) নানা আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে তাদের উদ্ধার (bail out) করে। তাই নরসিংহম কমিটির সুপারিশের প্রসঙ্গে আমরা বলবো যে, ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিলোপ নয়—প্রয়োজন হল সরকারি নিয়ন্ত্রণের সরলীকরণ। আর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, ব্যাংকের কাজকর্মে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং ব্যাংকগুলির নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শুধুমাত্র রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে দিতে হবে। কমিটি সঠিকভাবেই বলেছে যে, সরকারের অর্থমন্ত্রকের হাতে যদি ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে ব্যাংকগুলির উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দূর করা যাবে না।

4.9.3 সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতি (Progress of the Banking Sector of India during the Post-reform Period)

ভারতে পুরোদমে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় 1991 সালে নতুন শিল্পনীতি প্রকাশের সাথে সাথে। সুতরাং বর্তমান বিভাগে আমরা 1991 সালের পর ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার কেমন অগ্রগতি ঘটেছে তা আলোচনা করব। এই অগ্রগতি দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে : (a) সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সাফল্য বা অগ্রগতি এবং (b) বেসরকারি ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সাফল্য বা অগ্রগতি। আমরা একে একে এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

(a) সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সাফল্য বা অগ্রগতি : ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাংকগুলিকে বড় ব্যাংকের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে 2022 সালের 1 এপ্রিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় বারো (12) (স্টেট ব্যাংক সহ)।

সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাংকগুলির মধ্যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হল ভারতের বৃহত্তম ব্যাংক। ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাংকগুলির সাফল্যের ক্ষেত্র মূলত তিনটি :

(i) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের প্রসার,

(ii) শাখা বিস্তার, এবং

(iii) আমানত বৃদ্ধি।

বিভিন্ন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া, সাধারণভাবে, বিভিন্নক্ষেত্রে ঋণদানের পরিমাণ বেড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির গ্রামীণ এলাকায় শাখা বিস্তার ঘটেছে। তা ছাড়া, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পে এবং কৃষিতে ঋণদানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অনেক ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প এই সাহায্য না পেলে রুগ্‌ণ হয়ে পড়তো এবং তাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। এতে বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়তো। সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত ক্ষেত্রগুলিতেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ঋণের পরিমাণ বাড়িয়েছে।

তবুও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাজকর্মে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সংস্কারের পূর্ববর্তীকালে অর্থাৎ 1991 সালের পূর্বেও এই ত্রুটিগুলি কমবেশি বিদ্যমান ছিল। এই ত্রুটিগুলির কয়েকটি নরসিংহম কমিটি পূর্বেই তার প্রতিবেদনে (1991) উল্লেখ করেছে। কিন্তু সংস্কারের পরেও সেই ত্রুটিগুলি দূর হয়নি। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটির উল্লেখ করা যায় :

(i) স্বল্প মুনাফার হার : ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মুনাফার হার খুবই কম। এর পিছনে মূল কারণগুলি হল : পরিচালনগত অদক্ষতা, ঋণদানে দুর্নীতি, তহবিলের অপব্যবহার প্রভৃতি।

(ii) অলস পরিসম্পদ : ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংকের অলস পরিসম্পদের (Non-performing Assests বা NPAs) পরিমাণ খুবই বেশি। ফলে এদের মুনাফার হার কম।

(iii) অদক্ষ পরিচালনা : অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা খুব দক্ষ নয়। ঋণ মঞ্জুর করার সময় এরা ঋণের সঠিক যোগ্য ব্যক্তি বা কোম্পানি নির্বাচন করতে পারে না। ফলে ভুল ব্যক্তি বা কোম্পানি ঋণ পেয়ে যায় এবং সেই ঋণ পুনরুদ্ধার করা যায় না। অনেক সময়, ব্যাংকের পরিচালন কর্তৃপক্ষ ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও উদ্যম গ্রহণ করেনি অথবা গ্রহণ করতে চায়নি।

(iv) ফাটকাবাজি : অনেক ব্যাংক শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলে। এটি খুবই ঝুঁকিবহুল কাজ। এতে জনগণের আমানতের অপব্যবহার ঘটে।

(v) ব্যাংকের রুগ্‌ণতা : ভারতের কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক রুগ্‌ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এর পিছনে প্রধান কারণগুলি হল : বিপুল অনাদায়ী ঋণ, অদ্দ প্রশাসন, রাজনৈতিক চাপে ঋণ মঞ্জুর, ব্যাংক আধিকারিকদের দুর্নীতি প্রভৃতি।

(vi) সীমিত সামাজিক ব্যাংকিং : ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি মূলত সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে ঋণ দিয়েছে। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিকে এরা বিশেষ আর্থিক সাহায্য দেয়নি।

(vii) দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ : ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক এই দুয়েরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নরসিংহম কমিটির মতে, এই ব্যবস্থার ফলে ব্যাংকগুলির উপর প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ খুবই বেশি।

1991 সালে নরসিংহম কমিটি ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করার জন্য কিছু সংস্কারের সুপারিশ করেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির দুর্বলতা কিছুটা কমবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সাম্প্রতিক খতিয়ান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্যাংকগুলির দক্ষতার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

(b) বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাংকগুলির সাফল্য বা অগ্রগতি : আমরা জানি, 1991 সালে ভারতে নতুন শিল্পনীতি ও নতুন আর্থিক নীতি ঘোষিত হয়। ঐ সময় থেকে ভারতে সংস্কারের যুগ শুরু। এই সংস্কার-পরবর্তী যুগে ভারতে বেসরকারি ব্যাংকিং ক্ষেত্রের অগ্রগতি ও সাফল্য আমরা বিচার করব। 1991 সালের সংস্কার কর্মসূচিতে ভারত সরকার উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করে। ফলে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারি ব্যাংকের এবং বিদেশি ব্যাংকের প্রবেশ ঘটে। 2022 সালের 1 জানুয়ারি ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যাংকের সংখ্যা ছিল একুশ (21)। এদের মধ্যে 11 টি ছিল পুরনো বেসরকারি ব্যাংক এবং 10টি ছিল নতুন বেসরকারি ব্যাংক। প্রধান কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের উদাহরণ হল : HDFC ব্যাংক, ICICI ব্যাংক, Axis ব্যাংক, বন্ধন ব্যাংক, কর্ণাটক ব্যাংক, জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাংক, কারুর বৈশ্য ব্যাংক, IDBI ব্যাংক, নৈনিতাল ব্যাংক প্রভৃতি। রেভিনিউর বিচারে HDFC Bank হল ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংক। বিদেশি যে সমস্ত ব্যাংক ভারতে কাজ করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : Citi Bank, HSBC Bank, Standard Chartered Bank, American Express Bank, Bank of Tokyo প্রভৃতি।

এখন আমরা বিভিন্ন মাপকাঠিতে বেসরকারি ব্যাংকগুলির সংস্কার-পরবর্তী যুগে দক্ষতা বিচার করা। বিভিন্ন মাপকাঠিতে এই ব্যাংকগুলির দক্ষতা পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে। প্রধান কয়েকটি মাপকাঠি হল : ব্যাংকের শাখা প্রতি ব্যবসার পরিমাণ, শাখা প্রতি মুনাফার পরিমাণ, কর্মচারীপিছু ব্যবসার পরিমাণ, কর্মচারীদের মাথাপিছু মুনাফার পরিমাণ প্রভৃতি। সব মাপকাঠিতেই দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি ব্যাংকগুলির তুলনায় বেসরকারি ব্যাংকগুলির দক্ষতা বেশি (সূত্র : Shodhganga.ac.in)। ভারতের কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকগুলি মুনাফা অর্জন করেছে। তা ছাড়া, বেসরকারি ব্যাংকগুলির গ্রাহক পরিসেবার মানও সরকারি ব্যাংকগুলির তুলনায় ভালো। সংস্কার-পরবর্তী যুগে সরকার ও বেসরকারি ব্যাংকগুলি সমান পরিসর ও সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকগুলিই পরিচালনায় বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে। আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় তারা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তুলনায় অনেক সদর্থকভাবে সাড়া দিয়েছে এবং বাজারের সুবিধা তারা বেশি কাজে লাগাতে পেরেছে। তবে এটা ঠিক যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে কিছু সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। ক্ষুদ্র শিল্প এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে তাদের কম সুদে ঋণ দিতে হয়। তবুও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে কম মুনাফা বা লোকসানের প্রধান কারণ হল রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। এর জন্যই অনেক সরকারি ব্যাংকের মন্দ ঋণের (bad debt) পরিমাণ বেশি। ফলে এই ব্যাংকগুলির দায়, অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ এবং অলস পরিসম্পদের পরিমাণ বেশি। বেসরকারি ব্যাংকগুলি এধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। ফলে তাদের এধরনের দায় কম। তাদের পরিচালনগত শৃঙ্খলার জন্য ব্যাংক আধিকারিকদের মধ্যে দুর্নীতি সুযোগ কম। ফলে তারা যোগ্য ব্যক্তিকেই ঋণ মঞ্জুর করে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে ঋণমঞ্জুরের ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতি শোনা

যায়। অনেক বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির (scam) সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত অনেক ব্যাংকেরই নাম জড়িয়ে আছে। আগামী দিনগুলিতে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে আরো অনেক বেসরকারি ব্যাংক প্রবেশ করবে। এদের সঙ্গে সরকারি ব্যাংকগুলিকে প্রতিযোগিতা করতে হলে এদের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমাতে হবে এবং এদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

4.10 বিমার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (Definition and Types of Insurance)

বিমা একটি চুক্তি। এক্ষেত্রে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। বিমা প্রধানত দু'প্রকারের : সাধারণ বিমা এবং জীবন বিমা। সাধারণ বিমার মধ্যে রয়েছে অগ্নি বিমা, নৌ-বিমা, দুর্ঘটনা বিমা প্রভৃতি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বিমাকারী কোম্পানি বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দেয়। এই ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বিমাগ্রহীতা প্রিমিয়াম প্রদান করে বিমাকারী কোম্পানিকে। জীবন বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারী কোম্পানি কিছু প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার জীবনের ঝুঁকি বহন করে। বিমা গ্রহীতার যদি বিমার সময়কালের মধ্যে মৃত্যু ঘটে, তাহলে বিমাকারী কোম্পানি ঐ বিমাগ্রহীতার নির্বাচিত ব্যক্তিকে চুক্তিমতো অর্থ প্রদান করে। আর বিমাকারী বিমার সময়কালে জীবিত থাকলে বিমার মেয়াদ শেষে ঐ বিমাকারী বিমার চুক্তিমতো অর্থ ও কিছু লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এই দু'ধরনের বিমা ছাড়াও আর এক ধরনের বিমা কোনো কোনো দেশে লক্ষ করা যায়। সেটি হল সামাজিক নিরাপত্তা বিমা। এক্ষেত্রে শ্রমিকের মৃত্যু, দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতা ঘটলে শ্রমিককে নিয়োগ কারী অথবা সরকার অথবা উভয়েই অর্থ সাহায্য করে থাকে।

4.11 ভারতে বিমা ক্ষেত্রের অগ্রগতি (Progress of Insurance Sector in India)

ভারতে তিন ধরনের বিমা দেখতে পাওয়া যায় : (i) জীবন বিমা, (ii) সাধারণ বিমা এবং (iii) সামাজিক নিরাপত্তা। আমরা ভারতে এই তিন ধরনের বিমার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করব। এই অগ্রগতি আমরা দুটি কালপর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করব : (a) আর্থিক সংস্কারের (1991) পূর্ববর্তী সময়ে ভারতে বিমা ক্ষেত্রের প্রসার বা অগ্রগতি এবং (b) আর্থিক সংস্কারের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ 1991 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে বিমা ক্ষেত্রের প্রসার বা অগ্রগতি।

4.11.1 আর্থিক সংস্কারের পূর্ববর্তী সময়ে ভারতে বিমা ক্ষেত্রের অগ্রগতি (Progress of Insurance Sector in India during the Pre-reform Period)

জীবন বিমা (Life Insurance) : জীবন বিমা ভারতে বহু আগে থেকেই প্রচলিত। তবে রীতিমাফিক জীবন বিমা ভারতে শুরু হয় 1818 সালে যখন কলকাতায় ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি স্থাপিত হয়। এটি ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। এরপর আরও কিছু বিদেশি কোম্পানি গড়ে ওঠে। এগুলিরও অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। এরা প্রধানত ভারতে কর্মরত ইউরোপীয়দের জীবন বিমা করত। প্রথম ভারতীয় জীবন বিমা কোম্পানি স্থাপিত হয় 1870 সালে যখন বোম্বাই মিউচুয়াল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি স্থাপিত হয়। এরপর বিংশ শতাব্দীর শুরুর বছরগুলিতে অনেক জীবন বিমা কোম্পানি স্থাপিত হয়।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, ভারতে প্রথামাফিক জীবন বিমা ব্যবসা শুরু হয় 1818 সালে। কিন্তু জীবন বিমা কোম্পানিগুলির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এগুলিকে সঠিক পথে চালনার জন্য দীর্ঘদিন কোনো আইনকানুন ছিল না। অবশেষে 1912 সালে Indian Life Assurance Companies Act পাশ হয়। ভারতে জীবন বিমা সম্পর্কে এটিই ছিল প্রথম আইন। এরপর 1928 সালে Indain Insurance Companies Act নামে আরও একটি আইন পাশ হয়। অবশেষে 1938 সালে বিভিন্ন আইনকে সুসংবদ্ধ করে Insurance Act, 1938 পাশ হয়। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের বিমা ক্ষেত্রে এটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিমাগ্রহীতার স্বার্থ রক্ষা করা।

স্বাধীনতার পর 1965 সালে ভারত সরকার তৎকালীন 245টি বেসরকারি জীবন বিমা কোম্পানির রাষ্ট্রায়ত্ত করে এবং প্রতিষ্ঠা করে ভারতের জীবন বিমা নিগম (Life Insurance of India বা, সংক্ষেপে LICI)। 1991 সালে সংস্কার শুরুর পূর্বে জীবন বিমা ব্যবসায় LICI-ই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ঐ সময় পর্যন্ত LICI-র ছিল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া (State monopoly)। জনসাধারণের মধ্যে জীবন বিমার প্রচার এবং ন্যায্য ব্যয়ে বিমাগ্রহীতাদের জীবন বিমার ব্যবস্থা করাই হল LICI-র মুখ্য উদ্দেশ্য। বিমার প্রিমিয়াম মারফত সংগৃহীত অর্থ LICI অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। এছাড়া, বিমাগ্রহীতারা LICI-এর নিকট থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পেতে পারে। বাড়ি তৈরিতে অর্থসাহায্য করার জন্য 1989 সালে LIC Housing Finance নামে একটি শাখা খোলা হয়েছে। আবার, শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ঐ বছরেই অর্থাৎ 1989 সালে LIC Mutual Fund গঠন করা হয়েছে। LICI তার সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করার সময় দুটি নীতি গঠন করে : (i) বিনিয়োজিত অর্থের সুরক্ষার জন্য এর বড় অংশ সরকারি ঋণপত্র কিনতে ব্যয় করা এবং ফাটকা কারবারে বিনিয়োগ না করা, (ii) সংগৃহীত অর্থ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা এবং এর দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা।

সাধারণ বিমা (General insurance) : ভারতে রীতিমাফিক সাধারণ বিমা বা নন্-লাইফ বিমা শুরু হয় 1850 সালে যখন ব্রিটিশরা কলকাতায় Trition Insurance Company Ltd. প্রতিষ্ঠিত করে। এটিই ভারতে প্রথম সাধারণ বিমা কোম্পানি। ঐ সময়ে প্রধানত জাহাজে দ্রব্যসামগ্রী পাঠানোর ক্ষেত্রে জাহাজডুবির ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেতে বিমা করা হত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বিমা কোম্পানি গড়ে ওঠে 1907 সালে যখন Indian Marcantile Insurance Ltd. প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে সুস্থ এবং ন্যায্য ব্যবসা নিশ্চিত করতে General Insurance Council গঠিত হয় 1973 সালে।

জীবন বিমার ন্যায় সাধারণ বিমাকেও সরকারের অধীনে আনা হয় 1972 ফলে। ঐ বছর সাধারণ বিমা প্রদানকারী কোম্পানিগুলিকে জাতীয়করণ করে গঠিত হয় General Insurance Corporation of India (GICI)। তখন এর ছিল চারটি অধীনস্থ কোম্পানি। সেগুলি হল :

(i) National Insuracne Company Ltd.

(ii) New India Assurance Company Ltd.

(iii) Oriental Fire and General Insurance Company Ltd,

(iv) United India Insurance Company Ltd.

সাধারণ বিমা ব্যবসার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং নীতি প্রণয়নের ভার দেওয়া হয় GICI-কে। GICI স্থাপনের সময় এর আদায়ীকৃত মূলধনের (paid up capital) সবটাই ভারত সরকারের দেওয়া এবং এর অধীনস্থ চারটি কোম্পানির মূলধনের সবটাই GICI-এর দেওয়া।

সামাজিক নিরাপত্তা বিমা (Social Security insurance) : ভারতে সামাজিক নিরাপত্তা বিমা চালু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। আর্থিক সংস্কারের (1991) পূর্বে ভারত সরকার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ এবং আর্থিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং তহবিল গঠন করেছে। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য সেই সমস্ত আইন এবং তহবিলের নাম উল্লেখ করছি। বন্ধনীর মধ্যে আইনগুলি পাশের বছর এবং তহবিল স্থাপনের বছর উল্লেখ করা হল :

i) ক্ষতিপূরণ আইন (1929),

ii) প্রসূতি কল্যাণ আইন (1929),

iii) কর্মচারী রাজ্য বিমা আইন (1948),

iv) প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্য নিধি আইন (1952),

v) মৃত্যুত্রাণ তহবিল (1964),

vi) গ্রাচুইটি (বা অবসরকালীন আনুতোষিক) আইন (1972) এবং

vii) কর্মচারী আমানত বিমা সংযুক্তি প্রকল্প (1976)।

4.11.2 সংস্কার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ 1991 সালের পর ভারতে বিমাক্ষেত্রের অগ্রগতি (Progress of Insurance Sector in India during the Post-reform Period *i.e.* after 1991)

1991সালের পর ভারতে জীবন বিমার অগ্রগতি : 1999 সাল পর্যন্ত জীবন বিমা ব্যবসায়ে ভারতের জীবন বিমা নিগম (Life Insurance Corporation of India বা LICI) একচেটিয়া অবস্থা ভোগ করে। 1991 সালে ভারত সরকার উদারীকরণের নীতিগ্রহণ করে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে নানা সংস্কারের প্রবর্তন করে। বিমাক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়টি পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে 1993 সালের এপ্রিল মাদ্রেস মালহোত্রা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি 1994 সালের জানুয়ারি মাসে তার রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে 1999 সাল থেকে LICI-এর একচেটিয়া অবস্থার অবসান ঘটানো হয় এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে এই জীবন বিমা ব্যবসায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। 2018 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এরূপ বেসরকারি জীবন বিমা কোম্পানির সংখ্যা ছিল 23 (সূত্র : India Brand Equity Foundation বা IBEF)। বর্তমানে ভারতের জীবন বিমা ক্ষেত্রে ব্যবসাকারী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কোম্পানি হল :

A. সরকারি জীবন বিমা ক্ষেত্র : Life Insurance Corporation of India (LICI)।

B. উল্লেখযোগ্য বেসরকারি জীবনবিমা কোম্পানি।

1. Allianz Bajaj Life Insurance Company Ltd.
2. AMP Life Insurance Company Ltd.
3. Aviva Life Insurance Company Ltd.
4. Birla Sun Life Insurance Company Ltd.
5. HDFC Life Insurance Company Ltd.
6. ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd.
7. ING Vysya Life Insurance Company Ltd.

8. Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd.
9. Max New York Life Insurance Company Ltd.
10. Met Life Insurance Company Ltd.
11. SBI Life Insurance Company Ltd.
12. Tata AIG Life Insurance Company Ltd. প্রভৃতি।

দেখা যাচ্ছে, সংস্কার পরবর্তী সময় কালে ভারতের জীবন বিমা ব্যবসায় অনেক বেসরকারি কোম্পানি প্রবেশ করেছে। এর ফলে ভারতের জীবন বিমা ক্ষেত্রটি বেশ প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। এই নতুন প্রতিযোগিতার যুগে অবশ্য LICI-এর ব্যবসার পরিমাণ কমেনি। বেসরকারি জীবন বিমা কোম্পানিগুলিও লাভজনকভাবে তাদের ব্যবসা চালাচ্ছে। এর পিছনে প্রধান কারণ হল জনসাধারণের মধ্যে জীবন বিমা সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি। আর জীবন বিমা ক্ষেত্রটিতে প্রতিযোগিতা বাড়ার ফলে আশা করা যায় যে, এর ফলে জীবন বিমা পরিসেবা দানকারী কোম্পানিগুলির (LICI-সহ) দক্ষতা বাড়বে, প্রিমিয়ামের হার কমবে বা প্রতিদানের হার বাড়বে এবং এসবের ফলে বিমাকারীরাই উপকৃত হবে।

1991 সালের পর ভারতে সাধারণ বিমার অগ্রগতি : সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হবার পর সাধারণ বিমার ক্ষেত্রেও GICI-এর একচেটিয়া রইলো না। 1994 সালে মালহোত্রা কমিটি তার রিপোর্ট জমা দেয়। ঐ কমিটির সুপারিশ অনুসারে, 2000 সালের নভেম্বর মাস থেকে GICI-কে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পুনঃবিমাকারী (re-insurance) সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এটি তার অধীনস্থ চারটি সংস্থার আর নিয়ন্ত্রক সংস্থাও রইলো না। অধীনস্থ চারটি সংস্থাকে স্বাধীনভাবে সাধারণ বিমা ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এগুলিও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে আর দুটি সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থা হল Employees State Insurance Corporation এবং Agricultural Insurance Corporation.

পাশাপাশি, মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ মেনে 2002 সাল থেকে সাধারণ বিমা ক্ষেত্রে বেসরকারি মূলধন প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে অনেক বেসরকারি কোম্পানি ভারতে সাধারণ বিমা ব্যবসা শুরু করেছে। 2018 সালের এপ্রিল মাসে এরূপ বেসরকারি সাধারণ বিমা কোম্পানির সংখ্যা ছিল সাতাশ (27)। ভারতে ব্যবসাকারী প্রধান কয়েকটি বেসরকারি সাধারণ বিমা কোম্পানি হল ঃ

1. Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd.
2. HDFC-Chubb General Insurance Company Ltd.
3. ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
4. IIFCO Tokyo General Insurance Company Ltd.
5. Reliance General Insurance Company Ltd.
6. Royal Sundaram Alliance Insurance Company Ltd.

(বর্তমানে Royal Sundaram General Insurance Company Ltd.)

7. Tata AIG General Insurance Company Ltd. প্রভৃতি।

সুতরাং, ভারতের সাধারণ বিমার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থাগুলির একচেটিয়া অধিকার আর নেই। 2010 সালের পর থেকে ভারতের সাধারণ বিমা ক্ষেত্রটি যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে।

1991 সালের পর সামাজিক নিরাপত্তা বিমার ক্ষেত্রে অগ্রগতি : ভারতে আর্থিক সংস্কার শুরু হওয়া (1991) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা দুটি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের উল্লেখ করতে পারি।

i) কর্মচারী পেনশন প্রকল্প, 1995 : এই প্রকল্প অনুযায়ী কোনো কর্মচারীর কার্যকাল 33 বছর পূর্ণ হলে তাকে মূল বেতনের 50 শতাংশ পেনশন হিসাবে দেওয়া হয়। পেনশন প্রাপক হিসাবে কর্মচারীর মৃত্যু হলে পারিবারিক পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ii) প্রদানমূলক (Contributory) পেনশন প্রকল্প, 2004 : সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রকল্প প্রযোজ্য। অবসরের সময় যখন কোনো কর্মী ঐ প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন সঞ্চিত টাকার 40 শতাংশ দিয়ে জীবন বিমা কোম্পানির অ্যানুইটি কিনতে হবে। বাকি 60 শতাংশ কর্মচারী স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারবে।

4.12 ভারতের বিমা ক্ষেত্রের সংস্কার : মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ (Reforms in the Insurance Sector of India : Recommendations of Malhotra Committee)

1991 সালের ভারতে সংস্কার কর্মসূচি চালু হলে তার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকার বিমা ক্ষেত্রেও সংস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে সরকার 1993 সালে মালহোত্রা কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি 1994 সালের জানুয়ারি মাসে তার প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে বিমা ক্ষেত্রের সংস্কার সম্পর্কে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলি করা হয় :

i) বিমা ক্ষেত্রে একচেটিয়া অবস্থার বিলোপ ঘটাতে হবে। বেসরকারি বিমা কোম্পানিকে ব্যবসায় সুযোগ দিয়ে বিমা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আনতে হবে।

ii) LICI ও GICI-এর মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

iii) GICI-এর অধীনস্থ চারটি কোম্পানিকে স্বতন্ত্র কোম্পানিতে পরিণত করতে হবে।

iv) বিদেশি বিমা কোম্পানিকে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দিতে হবে। এজন্য তাদের ভারতীয় কোম্পানি গঠন করতে হবে অথবা ভারতের কোনো অংশীদারের সাথে যৌথভাবে কোম্পানি গঠন করতে হবে।

v) LICI এবং GICI পর্যদশাসিত সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

vi) বিমা ক্ষেত্রের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠন করতে হবে।

এই সুপারিশগুলির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয় :

1. GICI-এর অধীনস্থ চারটি সংস্থাকে 2000 সালে স্বাধীন কোম্পানি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

2. বিমা ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য 1999 সালে Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act পাশ হয়।

3. জীবন বিমার ক্ষেত্রে LICI-এর একচেটিয়ার অবসান ঘটানো হয়। বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিকে জীবন বিমার ক্ষেত্রে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

4. সাধারণ বিমার ক্ষেত্রেও বেসরকারি বিমা কোম্পানিকে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

5. IRDA Act, 1999 পাশ হবার পর বিধিবদ্ধ স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসাবে IRDA স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থার কাজ হল বিমা শিল্পে নিযুক্ত সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিমা গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা করা।

4.13 সারাংশ (Summary)

1. সংস্কার-পূর্ববর্তী কালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি : ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় মোটামুটি 1985 সালে। সুতরাং, সংস্কার-পূর্ববর্তী সময়কাল বলতে আমরা 1950-85 সময়কে বোঝাচ্ছি। এই সময়কালটি আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম পরিকল্পনা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা (1950-65) পর্যন্ত ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্যায়। এই সময়ের শিল্পের উন্নতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল : (i) মূল ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ, (ii) আমদানি ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং (iii) ঘাটতি ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি এবং খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীলতা। দ্বিতীয় পর্যায়ের (1965-85) শিল্পোন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার মন্থর হয়ে যাওয়া।

2. 1965-85 সময়কালে ভারতে শিল্প-মন্থরতার কারণসমূহ : 1965-85 সময়কালে ভারতে শিল্পের মন্থরতার বাহ্যিক কারণগুলি হল : প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি, উপর্যুপরি কয়েক বছর খরার দরুন কৃষি উৎপাদন হ্রাস, পরিকাঠামোর অভাব, 1973 সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রভৃতি। এই সময়ে শিল্পের মন্দার অভ্যন্তরীণ কারণগুলি হল : আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, কৃষির ব্যর্থতা, সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস, আয় বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদার হ্রাস প্রভৃতি।

3. সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি : ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় 1985 সালে। ঐ বছরটি হল ভারতের সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম বছর। সপ্তম পরিকল্পনাকালে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষির হার (8.5 শতাংশ) ছিল যথেষ্ট সন্তোষজনক। এরপর অবশ্য রাজনৈতিক পালাবদলের দরুন দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1990-92) গৃহীত হয়। এই দুবছর মিলে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হার সন্তোষজনক ছিল না। এরপর 1991 সালে ভারত সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এর পরের বছরই অষ্টম পরিকল্পনা (1992-97) শুরু হয়। এই পরিকল্পনায় শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল বার্ষিক 8 শতাংশ যা যথেষ্ট সন্তোষজনক। কিন্তু নবম পরিকল্পনা কালে (1997-2002) শিল্পের বৃদ্ধির হার বার্ষিক 5 শতাংশে নেমে আসে। অবশ্য দশম পরিকল্পনা (2002-07) শিল্পের এই ব্যর্থতা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠে। এই পরিকল্পনায় শিল্পের বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক 8.2 শতাংশ। একাদশ পরিকল্পনায় (2007-12) শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল বার্ষিক 6.7 শতাংশ। এই হার ছিল লক্ষ্যমাত্রা (10 শতাংশ) অপেক্ষা যথেষ্ট কম। দ্বাদশ পরিকল্পনার সময়ও (20012-17) শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল বার্ষিক 6 শতাংশের মতো, যা আদৌ সন্তোষজনক নয়। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতের শিল্পের অগ্রগতির হার চমকপ্রদ কিছু ছিল না। আর করোনা মহামারির সময় (মার্চ 2020 থেকে 2022) ভারতীয় অর্থনীতির নানা বিশৃঙ্খলার দরুন শিল্পের উৎপাদন কমে যায়। করোনার প্রথম বছরটিতে শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল (-) 9 শতাংশ। সব মিলিয়ে বলা যায় যে, সংস্কার পরবর্তীকালে শিল্পের অগ্রগতির হার সংস্কার-পূর্ববর্তী কালের চেয়ে বেশি নয়, বরং কিছুটা কম।

4. ভারতে সরকারি ক্ষেত্র : ভারতীয় অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। **প্রথমত,** সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বড় অংশই সরকারি ক্ষেত্রের অবদান। **দ্বিতীয়ত,** মোট শিল্পোৎপাদনেরও একটি বড় অংশ সরকারি ক্ষেত্র থেকে আসে। **তৃতীয়ত,** ভারতের মূলধন গঠনেও সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা রয়েছে। **চতুর্থত,** পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নতিতেও সরকারি ক্ষেত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। **পঞ্চমত,** মূল ও ভারী শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে সরকারি ক্ষেত্র ভারতে শিল্পের ভিত্তি মজবুত করেছে।

5. ভারতে সরকারি ক্ষেত্রে সাফল্য : ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি হল : মূল ও ভারী শিল্প স্থাপন, শিল্পের ভিত্তিস্থাপন, রপ্তানি প্রসার ও আমদানি পরিবর্ততায় সহায়তা, সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান, শিল্পের আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, সহায়ক শিল্প স্থাপনে সাহায্য প্রভৃতি।

6. ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা : ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতাগুলি হল : মুনাফা অর্জনে ব্যর্থতা, পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে উদ্যম ও অনুপ্রেরণার অভাব, সরকারি শিল্প ইউনিট পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ, অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শ্রমিক নিয়োগ, সরকারি উদ্যোগগুলিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি।

7. ভারতে বিলগ্নিকরণ : সরকারি শিল্প উদ্যোগের শেয়ার ব্যক্তিগত মূলধনের কাছে বিক্রি করাকে বলে বিলগ্নিকরণ। ভারত সরকার 1990-এর দশক থেকে বিলগ্নিকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এটিই ভারতে বেসরকারিকরণের প্রধান পন্থা। বিলগ্নিকরণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল : সরকারি উদ্যোগগুলির দক্ষতা বাড়ানো, শিল্পে নতুন পরিসম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি। বিলগ্নিকরণের পক্ষে যুক্তিগুলি হল : প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি, অনুৎপাদনশীল সরকারি ব্যয় হ্রাস, বিদেশি মূলধন ও প্রযুক্তির আগমন, সরকারের ঋণের বোঝা হ্রাস প্রভৃতি। বিলগ্নিকরণের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি হল ঃ সমাজকল্যাণের প্রতি অবহেলা, একচেটিয়া ক্ষমতার প্রসার, বেকারি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি, সরকারি উদ্যোগের মূল্যায়নের নির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাব প্রভৃতি।

8. ভারতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) : দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে MSME-র সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

i) অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ যেখানে প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ 25 লক্ষ টাকা ;

ii) ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ যেখানে প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগে সর্বোচ্চ 5 কোটি টাকা ;

iii) মাঝারি শিল্পোদ্যোগ যেখানে প্লান্ট ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগে সর্বোচ্চ 10 কোটি টাকা ;

সেবা উদ্যোগের ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা যথাক্রমে 10 লক্ষ, 2 কোটি এবং 5 কোটি টাকা।

9. ভারতীয় অর্থনীতিতে MSME-র ভূমিকা ও গুরুত্ব : প্রথমত, দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের 40 শতাংস MSME-তে উৎপন্ন হয়। **দ্বিতীয়ত,** দেশের মোট কর্মসংস্থানে MSME-র গুরুত্ব খুব বেশি। **তৃতীয়ত,** দেশের মোট রপ্তানিতেও MSME-র অংশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

10. ভারতে MSME-র সমস্যাবলি : ভারতে MSME-র প্রধান সমস্যাগুলি হল : মূলধনের সমস্যা, কাঁচামালের সমস্যা, পণ্য বিক্রয়ের সমস্যা, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার সমস্যা, প্রযুক্তির সমস্যা, উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহারের সমস্যা, রুগ্‌ণ ইউনিটের সমস্যা প্রভৃতি।

11. MSME-র সমস্যা দূর করতে সরকারি ব্যবস্থা : MSME-র সমস্যা দূর করতে ভারত সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলি হল : বিভিন্ন বোর্ড গঠন, যন্ত্রপাতি ও অর্ডার সংগ্রহে সাহায্য, মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষণ, কারিগরি উন্নয়নে সাহায্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

12. সংস্কার-পূর্ববর্তীকালে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতি : ভারতে সংগঠিত ব্যাংক ব্যবস্থা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে। সেই সময় অধিকাংশ ব্যাংকই বেশিদিন টেকেনি। শুধুমাত্র বর্তমানের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে যাচ্ছে। 1955 সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে এর নাম দেওয়া হয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। সেই সময়ের অন্যান্য ব্যাংক ছিল বেসরকারি ব্যাংক। ইতিমধ্যে 1935 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক যা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। 1969 সালে 14 টি বড় প্রাইভেট ব্যাংক এবং 1980 সালে আরও 6টি ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। এই জাতীয়করণের পূর্বে ভারতে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ব্যাংকগুলি নানা অসাধু কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল।

13. ভারতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার : নরসিংহম কমিটির প্রতিবেদন : ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থাটিকে সুগঠিত করার জন্য ভারত সরকার নরসিংহম কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সুপারিশগুলি হল : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাজকর্মে স্বাধীনতা প্রদান, আইনসম্মত নগদ জমার অনুপাত হ্রাস, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ হ্রাস, বাজারি শক্তির দ্বারা সুদের হার নির্ধারণ প্রভৃতি। এই সুপারিশগুলি ভারতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তুলে দিলে হবে না। তবে সরকারি নিয়ন্ত্রণের জটিলতা কমাতে হবে এবং ব্যাংকগুলির কাজকর্মে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দূর করতে হবে।

14. সংস্কার-পরবর্তী কালে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার অগ্রগতি : সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ব্যবস্থার সাফল্য মূলত তিনটি : অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের প্রসার, শাখা প্রসার এবং আমানত বৃদ্ধি। পাশাপাশি, ব্যাংকগুলির কাজে নানা ত্রুটি রয়ে গেছে। সেই ত্রুটিগুলি হল : স্বল্প মুনাফার হার, বিপুল পরিমাণ অলস পরিসম্পদ, অদক্ষ পরিচালনা, নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ প্রদান, শেয়ারে ফাটকা খেলা সীমিত সামাজিক ব্যাংকিং প্রভৃতি। পাশাপাশি, বেসরকারি ব্যাংকগুলির দক্ষতা ও কৃতিত্ব সরকারি ব্যাংকগুলির তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

15. ভারতে বিমা ক্ষেত্রের অগ্রগতি : স্বাধীনতার আগে থেকেই ভারতে সাধারণ বিমা ও জীবনবিমা প্রচলিত ছিল। 1956 সালে ভারত সরকার জীবন বিমা কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ভারতের জীবন বিমা নিগমে (Life Insurance Corporation of India বা LICI) গঠন করে। তেমনি, 1972 সালে সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ভারতের সাধারণ বিমা নিগম (General Insurance Corporation of India বা GICI) গঠন করে। তখন এর অধীনস্থ চারটি সংস্থাও ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। এছাড়া ভারতে নানা সামাজিক নিরাপত্তা বিমাও চালু আছে। মালহোত্রা কমিটির (1993) সুপারিশ অনুসারে 1999 সাল থেকে জীবন বিমার ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানিকে অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে LICI-র জীবন বিমার ক্ষেত্রে একচেটিয়ার অবসান ঘটে। অবশ্য জীবন বিমার ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি। সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে GICI-কে পুনঃবিমাকারী সংস্থায় পরিণত করা হয়। এর অধীনস্থ চারটি সংস্থাকে স্বাধীনভাবে সাধারণ বিমা ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়। তাছাড়া, মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ মেনে 2002 সাল থেকে সাধারণ বিমার ক্ষেত্রেও বেসরকারি কোম্পানিকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ভারতের বিমা ক্ষেত্রটি এখন যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক।

16. ভারতের বিমা ক্ষেত্রের সংস্কার : মালহোত্রা কমিটির রিপোর্ট (1994) অনুসারে ভারত বিমাক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্কার প্রবর্তন করেছে সেগুলি হল : i) জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি কোম্পানিকে ব্যবসার অনুমতি, ii) GICI-এর অধীনস্থ চারটি কোম্পানিকে স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসাবে গঠন, iii) বিদেশি বিমা কোম্পানিকে কিছু শর্তসাপেক্ষে ভারতে বিমা ব্যবসা করার অনুমতি, iv) বিমা ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority) স্থাপন প্রভৃতি।

৪.১৪ অনুশীলনী (Exercise)

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer-type Questions)**

১. ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার কখন শুরু হয়।
২. ভারতের নতুন শিল্পনীতি কোন্ সালে ঘোষিত হয়?
৩. LPG-র পুরো কথাটি কী?
৪. ভারতের সংস্কার নীতির মূলকথা কী?
৫. BIFR-এর পুরো নাম কী?
৬. কোন্ শিল্পকে সূর্যোদয় শিল্প বলা হয়?
৭. MRTP Act-এর পুরো নাম কী?
৮. বিলগ্নিকরণ কাকে বলে?
৯. 'পরিকল্পনা থেকে ছুটি' বলতে কী বোঝো?
১০. মহলানবিশ কৌশলের মূলকথা কী?
১১. 'পরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় ছুটি'র সময়কাল কী?
১২. সরকারি উদ্যোগ কাকে বলে?
১৩. ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের দুটি সাফল্য উল্লেখ করো।
১৪. ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের দুটি ব্যর্থতা উল্লেখ করো।
১৫. ONGC এবং NTPC-র পুরো নাম বল।
১৬. NHAI এবং CSIR-এর পুরো নাম কী?
১৭. MSME-র পুরো কথাটি কী?
১৮. MSME-র দুটি সমস্যা উল্লেখ করো।
১৯. পুরো কথাটি লেখ : NSIC, SFCs এবং DIC.
২০. নরসিংহম কমিটির সমীক্ষার বিষয় কী ছিল?
২১. নরসিংহম কমিটির রিপোর্ট কখন প্রকাশিত হয়?
২২. IMF-এর পুরো নাম কী?
২৩. ভারতের বৃহত্তম সরকারি ব্যাংক কোন্‌টি?
২৪. বিমা কাকে বলে?

২৫. জীবন বিমা কী?
২৬. সাধারণ বিমা কাকে বলে?
২৭. LICI ও GICI-এর পুরো নাম বল।
২৮. ভারতে ব্যবসাকারী দুটি বেসরকারি জীবন বিমা কোম্পানির নাম বল।
২৯. ভারতে সাধারণ বিমা ক্ষেত্রে দুটি বেসরকারি কোম্পানির নাম বল।
৩০. IRDA-এর পুরো নাম কী?

■ **মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium Answer-type Questions)**

১. ভারতে 1965-85 সময়কালে শিল্পে মন্থরতার দুটি কারণ উল্লেখ করো।
২. ভারতের সরকারি শিল্প ক্ষেত্রের প্রধান দুটি ব্যর্থতা উল্লেখ করো।
৩. ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের দুটি প্রধান সাফল্য বর্ণনা করো।
৪. ভারতে বিলগ্নিকরণে পক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
৫. ভারতে বিলগ্নিকরণেণ বিপক্ষে দুটি প্রধান যুক্তি বর্ণনা করো।
৬. ভারতীয় অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব বিচার করো।
৭. MSME-র সংজ্ঞা দাও।
৮. ভারতে MSME-র কয়েকটি সমস্যা উল্লেখ কর।
৯. MSME-র সমস্যা দূর করতে ভারত সরকার অবলম্বিত কয়েকটি ব্যবস্থা বর্ণনা কর।
১০. ভারতে 1965-85 সময়কালে শিল্পে মন্দার কয়েকটি কারণ উলেল্ক কর।
১১. ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা বিচার কর।
১২. জাতীয়করণের পূর্বে ভারতের ব্যাংক ব্যবস্থার কয়েকটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।
১৩. ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ কর।
১৪. নরসিংহম কমিটি সুপারিশগুলির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন কর।
১৫. বিমার সংজ্ঞা দাও। ভারতে কয় প্রকারের বিমা দেখতে পাওয়া যায়?
১৬. GICI-এর একদা অধীনস্থ চারটি সংস্থার নাম বল।
১৭. ভারতের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কয়েকটি আইনের উল্লেখ কর।
১৮. ভারতে বিলগ্নিকরণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long Answer-type Questions)**

১. সংস্কার-পূর্ববর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করো।
২. 1965-85 সময়কালে ভারতে শিল্প মন্থরতার কারণগুলি বর্ণনা করো।
৩. সংস্কার-পরবর্তীকালে ভারতে শিল্পের অগ্রগতি বিচার করো।
৪. ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করো।
৫. ভারতে বিলগ্নিকরণের যৌক্তিকতা বিচার করো।

৬. ভারতীয় অর্থনীতিতে MSME-র সমস্যাগুলি বর্ণনা করো।
৭. MSME-র সমস্যাগুলি দূর করতে ভারত সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি বর্ণনা করো।
৮. সংস্কার পূর্ববর্তীকালে ভারতের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের অগ্রগতি বিচার করো।
৯. ভারতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে নরসিংহম কমিটির প্রতিবেদন বর্ণনা করো।
১০. সংস্কার পরবর্তীকালে ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার অগ্রগতি বিশ্লেষণ করো।
১১. সংস্কার-পরবর্তীযুগে ভারতে বিমা ক্ষেত্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা করো।
১২. ভারতে বিমা ক্ষেত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে মালহোত্রা কমিটির সুপারিশগুলি বর্ণনা করো।

4.15 গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. সরখেল, জয়দেব এন্ড সেখ সেলিম (2019) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
২. .....(2022) : ভারতীয় অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
৩. Bhagwati, J and P. Desai (1970) : India : Industrialisation, Oxford University Press, Delhi.
৪. Jalan, Bimal (2019) : Resurgent India : Politics, Economics and Governance, Harper Collins Publishers, India.
৫. Sarkhel, Jaydeb & Seikh Salim (2010) : Economic Principles and Indian Economic Problems, Book Syndicate (P) Ltd., Kolkata.
৬. সেখ সেলিম (2011) : ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

একক-5 ❑ ক্ষেত্রগত গতিপ্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ – III

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 প্রস্তাবনা

5.3 ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ

5.3.1 ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে পরিবর্তন

5.3.2 ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন

5.3.3 ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন

5.4 ভারতের সাম্প্রতিক লেনদেন ব্যালান্স

5.5 ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির কারণসমূহ

5.6 ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করতে সরকারি ব্যবস্থাসমূহ

5.7 রপ্তানি প্রসারের জন্য সরকারি ব্যবস্থাসমূহ

5.8 আমদানি-পরিবর্ততা—সুফল ও কুফল

5.9 রপ্তানি প্রসার বনাম আমদানি-পরিবর্ততা

5.10 ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি

5.11 সারাংশ

5.12 অনুশীলনী

5.13 গ্রন্থপঞ্জি

5.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে—

- ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির কারণ তার প্রতিকার
- রপ্তানি প্রসারের জন্য ভারত সরকার গৃহীত ব্যবস্থাদি
- রপ্তানি প্রসার ও আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতির মধ্যে কোন্‌টি ভালো
- বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতের সাম্প্রতিক নীতি

5.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে সেকথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, ভারতের বৈদেশি বাণিজ্যের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটেছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের গঠনে পরিবর্তন এসেছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই এককে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। অনেক স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যেরও একটি সমস্যা হল লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির সমস্যা। এই লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির কারণ ও তার প্রতিকার নিয়েও বর্তমান এককে বিশ্লেষণ করা হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে একটি পুরোনো কিন্তু প্রাণমন্ত বিতর্ক হল আমদানি নিয়ন্ত্রণ বনাম রপ্তানি প্রসারে নীতি। অর্থাৎ ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত কোনো দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করতে আমদানি নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া উচিত, নাকি রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত? এই বিষয়টিও বর্তমান এককে আলোচিত হবে। এছাড়া, ভারতে সম্প্রতি উদারীকরণ ও আর্থিক সংস্কারের প্রক্রিয়া চলছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিকে কীরূপ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তাও এই এককে আলোচনা করা হয়েছে।

5.3 ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ (Recent Changes in India's Foreign Trade)

ভারতে পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় 1950-51 সালে এবং তা শেষ হয় 2016-17 সালে। এই দীর্ঘ পরিকল্পনার যুগে এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে নানাধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তনগুলিতে মোটামুটিভাবে তিনটি দিক থেকে আলোচনা করা যায়। সেগুলি হল ঃ (ক) বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে পরিবর্তন, (খ) বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন এবং (গ) বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন।

আমরা এই পরিবর্তনগুলি নিয়ে একে একে একে আলোচনা করব।

5.3.1 ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে পরিবর্তন (Changes in the Volume of Foreign Trade of India)

1950–51 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও মূল্যে বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে। এটিই ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সময়কালে আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। 1950–51 সালে ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের (অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানি মিলিয়ে) পরিমাণ ছিল 1,250 কোটি টাকা। 1998–99 সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় 1,76,099 কোটি টাকা। অর্থাৎ 1950 থেকে 1999 এই মোটামুটি 50 বছরে টাকার অঙ্কে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ 250 গুণেরও বেশি বেড়েছে। এর মধ্যে রপ্তানি বেড়েছে 230 গুণ, আর আমদানি

বেড়েছে 270 গুণ। আর 1950-51 থেকে 2014–15 সালের মধ্যে ভারতের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় 298 গুণের মতো। এর মধ্যে রপ্তানি বেড়েছে 245 গুণ এবং অমদানি বেড়েছে 352 গুণ। অর্থাৎ রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হারে বেড়েছে। এর ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণও বেড়েছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে এই বৃদ্ধি দেশটির অর্থনীতির বৈচিত্র্যই প্রকাশ করছে। তাছাড়া, এটি অর্থনীতির উচ্চতর উন্নতির স্তরও নির্দেশ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়বে তা বলাই যায়। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। 1950-51 সালে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল 2.1 শতাংশ। 2008 সালে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ কমে দাঁড়ায় 1.6 শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়লেও সমগ্র বিশ্বের মোট বাণিজ্যে ভারতের অংশ কমেছে। এর অর্থ হল, বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ যে হারে বেড়েছে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সেই হারে বাড়েনি। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে কিছু দেশ যতটা সফল হয়েছে, ভারত ততটা সফল হয়নি। তাই বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ কমেছে যদি ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ বেশ দ্রুত হারেই বেড়েছে।

আর একটি কথাও বলার আছে। 2000 সালের পর থেকে ভারতের জাতীয় আয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের অংশ বাড়েনি, তা মোটামুটি একই আছে। 1985-86 সালে ভারতের জাতীয় আয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবদান ছিল 12 শতাংশের মতো। 1995-96 সালে এই অবদান বেড়ে দাঁড়ায় 21 শতাংশ। কিন্তু তারপর, ভারতের জাতীয় আয়ে বৈদেশিক অবদান 20 শতাংশের মতো রয়ে গেছে।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, পরিকল্পনাকালে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি উভয়েই বেড়েছে বটে, কিন্তু রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হারে বেড়েছে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য থেকে যে পরিমাণ আয় হয়েছে, সে রপ্তানি আয়ের দ্বারা আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়। ফলে ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা গেছে এবং সময়ের সাথে সাথে ঘাটতির পরিমাণও বেড়ে চলেছে। এই ঘাটতি দূর করতে গেলে একদিকে যেমন আমদানি কমাতে হবে, অন্যদিকে রপ্তানি বাড়াতে হবে। কিন্তু আমদানি দ্রব্যের মধ্যে যদি থাকে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, তাহলে আমদানি বিশেষ কমানো যায় না। সেক্ষেত্রে ভারতকে রপ্তানি বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে। 2015–20 সময়কালে বিশ্বের রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের অংশ ছিল 2 শতাংশেরও কম। সুতরাং ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ (sapce) আছে।

5.3.2 ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন (Changes in the Composition of India's Foreign Trade)

কোনো দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন বলতে ঐ দেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ও আমদানি দ্রব্যের তালিকা ও তার গুরুত্বকে বোঝায়। সুতরাং কোনো দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন বলতে ঐ দেশের আমদানি ও রপ্তানি কাঠামোয় পরিবর্তনকে বোঝায়। পরিকল্পনা কালে ভারতের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্য উভয়েরই কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা প্রথমে ভারতের রপ্তানি কাঠামোয় পরিবর্তন আলোচনা করব এবং তারপর আমদানি কাঠামোয় পরিবর্তন আলোচনা করব।

ভারতের রপ্তানি কাঠামোয় পরিবর্তন

1950-51 সালে ভারত মাত্র 50 টির মতো দ্রব্য রপ্তানি করত। কিন্তু বর্তমানে ভারত 3,000 টিরও বেশি দ্রব্য রপ্তানি করে। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায় : চিরাচরিত দ্রব্য এবং সাম্প্রতিক দ্রব্য। চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যগুলি হল চাল, পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র, মশলা, কাঁচা চামড়া প্রভৃতি। সাম্প্রতিক রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল রাসায়িনক দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, অলংকার ইত্যাদি নানারকম হস্ত নির্মিত দ্রব্য, তৈরি পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি। বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদের রপ্তানি সম্প্রতি খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। হস্তশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মণিমুক্তো ও দামি পাথর বসানো অলংকার। এই ধরনের অলংকার, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, তৈরি পোশাক পরিচ্ছদ, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য এবং রাসায়নিক দ্রব্য এই পাঁচটি পণ্য থেকে রপ্তানি আয় ভারতে মোট রপ্তানি আয়ের অর্ধেকেরও বেশি। আমরা বলতে পারি যে, ভারতের রপ্তানি কাঠামোর পরিবর্তন ভারতের শিল্পায়নকেই নির্দেশ করে। রপ্তানি বহুমুখী হয়েছে এবং রপ্তানিতে গতির সঞ্চার হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের রপ্তানি কাঠামোতে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল নিম্নরূপ :

(i) 1990-এর দশকের আগে ভারতের রপ্তানি কাঠামোতে চিরাচরিত পণ্যের (চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য মশলা প্রভৃতি) যে প্রাধান্য ছিল, তা অনেকটাই কমে গেছে।

(ii) ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রাসায়নিক দ্রব্য, অলংকার ও অন্যান্য হস্তনির্মিত দ্রব্য প্রভৃতি অ-চিরাচরিত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়ের বড় অংশ আসে।

(iii) নতুন শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রাসায়নিক পণ্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলি ভারতের শিল্পের উন্নতিকেই নির্দেশ করে।

আমদানি কাঠামোর পরিবর্তন : ভারতের প্রধান আমদানি দ্রব্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (i) ভোগ্য দ্রব্য, (ii) কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী দ্রব্য এবং (iii) মূলধন দ্রব্য। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের প্রধান আমদানি দ্রব্য হল পেট্রোলিয়াম (P), তেল (O) এবং লুব্রিক্যান্ট (L)। এদের একসঙ্গে POL বলা হয়। এছাড়া, ভারতের মূলধনি দ্রব্যের আমদানির মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক ও অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরিবহণের সাজসরঞ্জাম, ধাতব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এছাড়া, কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ার ফলে ভারতের সারের আমদানিও বেড়েছে। ভারত সম্প্রতি ভোজ্য তেল ও আমদানি করছে। তাছাড়া ভারতের আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে নানাধরনের ধাতু। এগুলির মধ্যে প্রধান হল লোহা ও ইস্পাত। অন্যান্য ধাতু আমদানির মধ্যে রয়েছে তামা, দস্তা, টিন প্রভৃতি। এছাড়া, ভারত হিরে, মুক্তো ও দামি পাথর বসানো অলংকার বিদেশে রপ্তানি করে। কিন্তু এই অলংকার তৈরির জন্য হিরে, মুক্তো ও দামি পাথর বিদেশ থেকে ভারতকে আমদানি করতে হয়। তাছাড়া, ভারত নানা রাসায়নিক দ্রব্যও আমদানি করে থাকে।

ভারতের আমদানি কাঠামোর নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি উল্লেখযোগ্য।

1. পূর্বে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের। এর অর্থ হল, ভারত প্রধানত কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি করত এবং শিল্পজাত দ্রব্য অমাদানি করত। বর্তমানে আমদানির রপ্তানি কাঠামোয় সেই ঔপনিবেশিকতা অনেকখানি অনুপস্থিত।

2. ভারতের আমদানি দ্রব্যের তালিকায় প্রধান পাঁচটি দ্রব্য হল : POL, মূলধন দ্রব্য, হিরে, মুক্তো ও দামি পাথর, রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতু। মোট আমদানি ব্যয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এই পাঁচটি দ্রব্যের খাতে ব্যয়িত হয়।

3. ভারতের বর্তমান আমদানি কাঠামো মূলধন দ্রব্য এবং মধ্যবর্তী দ্রব্যের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এগুলি উন্নয়নমূলক আমদানি। এটি ভারতের শিল্পায়নেকেই নির্দেশ করে।

4. ভারত এখন শিল্পজাত শেষ স্তরের দ্রব্য (final product) বিশেষ আমদানি করে না। বরং, শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে এমন দ্রব্যই বেশি আমদানি করে। এটিও ভারতের শিল্পের উন্নতির বৈচিত্র্য প্রকাশ করে।

৫.৩.৩ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন (Changes in the Direction of Foreign Trade of India)

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন আলোচনা করার জন্য আমরা ভারতের সাথে বাণিজ্যকারী দেশগুলিকে 5টি ভাগে ভাগ করছি :

1. OECD (Organisation for Economic Development and Co-operation) দেশগুলি। এর মধ্যে রয়েছে European Union (EU)-এর দেশগুলি, উত্তর আমেরিকা এবং অন্যান্য OECD দেশগুলি, যেমন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানি, বেলজিয়াম প্রভৃতি।

2. OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) দেশগুলি। এর সদস্য হল মধ্য এশিয়ার তেল রপ্তানিকারী দেশগুলি, যেমন, ইরান, ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব প্রভৃতি।

3. পূর্ব ইউরোপ। এখানে পূর্ব ইউরোপ বলতে আমরা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বোঝাচ্ছি।

4. এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলি, এবং

5. অন্যান্য।

1980-81 সাল থেকে এই দেশ গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে কীরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা ামরা এখন আলোচনা কর। প্রথমে আমরা ভারতের আমদানি বাণিজ্যে দেশগত পরিবর্তন বিবেচনা করব (সারণি 5.1) এবং তারপর ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে দেশগত পরিবর্তন বিবেচনা করব (সারণি 5.2)।

সারণি 5.1

ভারতের আমদানি বাণিজ্যে দেশগত পরিবর্তন

দেশ গোষ্ঠী	আমদানির অংশ (শতকরা)			
	1980–81	1997–98	2014–15	2018–19
1. OECD গোষ্ঠী	45.8	50.8	26.9	28.2
2. OPEC গোষ্ঠী	27.8	23.1	30.6	23.4
3. পূর্ব ইউরোপ গোষ্ঠী	10.3	2.7	1.7	1.8
4. উন্নয়নশীল দেশ গোষ্ঠী	15.7	23.2	39.0	43.4
5. অন্যান্য	0.4	0.2	1.8	3.2
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0

সূত্র : Report on Currency and Finance, RBI (বিভিন্ন সংখ্যা)

ভারতের আমদানির ক্ষেত্রে দেশগত পরিবর্তন : সারণি 5.1 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1980-81 OECD দেশগুলি থেকে আমদানির অংশ ছিল যথেষ্ট বেশি (45.8 শতাংশ)। 1997-98 সালে তা আরো বাড়ে (50.8 শতাংশ)। কিন্তু এই শতাব্দীর শুরু থেকে এই অংশ ক্রমাগত কমতে থাকে। 2014-15 সালে তা কমে দাঁড়ায় 26.9 শতাংশ। অবশ্য 2018-19 সালে আমদানির অংশ কিছুটা বেড়ে 28.2 শতাংশে পৌঁছায়। OPEC দেশগুলির সাথে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এই দেশগুলির অংশ ওঠানামা করেছে। আমদানির অংশ কখনও বেড়েছে, আবার কখনও কমেছে (সারণি 5.1 দ্রষ্টব্য)। পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলির ভারতের আমদানিতে অংশ ক্রমাগত কমেছে। বর্তমানে এই অংশ 2 শতাংশেরও কম। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল এই দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পতন এবং সেই পতনের সময়কালে নানাধরনের বিশৃঙ্খলা। সারণি থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের আমদানি বাণিজ্য ক্রমাগত বেড়েছে। 1980-81 সালে এই সমস্ত দেশ থেকে এসেছিল ভারতের মোট আমদানির 15.7 শতাংশ। 1997-98 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 23.2 শতাংশ। 2014-15 সালে আরো বেড়ে হয় 39.0 শতাংশ। আর 2018-19 সালে ভারতের আমদানি বাণিজ্যে উন্নয়ণশীল দেশগুলির আশা ছিল 43.4 শতাংশ।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন

আমরা 5.2নং সারণিতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন দেখিয়েছি এই সারণিতে আমরা 1980-81 সাল থেকে 2018-19 সাল পর্যন্ত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দিক পরিবর্তন দেখিয়েছি। আমদানির ন্যায় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরন দেখতে পাচ্ছি। 1980-81 থেকে 1997-98 সালের মধ্যে OECD দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানির অংশ 46.6 শতাংশ থেকে বেড়ে 55.7 শতাংশ হয়েছিল। তারপর 2014-15 তা কমে দাঁড়ায় 35.2 শতাংশ। অবশ্য 2018-19 সালে এই আবার কিছুটা বাড়ে (38.8 শতাংশ)। OPC দেশগুলির সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা অংশ কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে অর্থাৎ অস্থিতিশীল বাণিজ্য। আমরা আমদানির ক্ষেত্রেও একই ছবি পেয়েছি। পূর্ব ইউরোপ গোষ্ঠীর সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যে অমরা

সারণি 5.2

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন

দেশ গোষ্ঠী	রপ্তানির অংশ (শতকরা)			
	1980–81	1997–98	2014–15	2018–19
1. OECD গোষ্ঠী	46.6	55.7	35.2	38.8
2. OPEC গোষ্ঠী	11.3	10.0	18.1	14.8
3. পূর্ব ইউরোপ গোষ্ঠী	22.3	3.5	1.1	1.0
4. উন্নয়নশীল দেশ গোষ্ঠী	18.9	29.7	43.9	44.4
5. অন্যান্য	0.9	1.1	1.7	1.0
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0

সূত্র : op.cit.

আমদানির ন্যায় একই চিত্র পাচ্ছি। ঐ দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ভারতের রপ্তানির অংশ অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। 2018-19 ঐ দেশগুলির ভারতের রপ্তানির অংশ ছিল 1.0 শতাংশ মাত্র। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য দৃঢ়ভাবে বেড়েছে। 1980-81 সালে ভারত মোট রপ্তানির 18.9 শতাংশ এই দেশগুলিতে পাঠিয়েছিল। 1997-98 সালে তা বেড়ে হয় 29.7 শতাংশ। আর 2014-15 থেকে 2018-19 সময়কালে এই অংশ ছিল 44 শতাংশের মতো।

5.4 ভারতের সাম্প্রতিক লেনদেন ব্যালান্স (Balance of Payments of India)

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় 1951 সালে এবং শেষ হয় 2017 সালে। এই দীর্ঘ 66 বছরের মধ্যে দু-একটি বছর বাদ দিলে ভাতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি থেকেছে। প্রথম পরিকল্পনায় (1951-56) লেনদেন ব্যলান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল অবশ্য সামান্য। ঐ পরিকল্পনায় চলতি খাতে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল 41 কোটি টাকা কিন্তু দ্বিতীয় পকিল্পনার সময় (1956-61) রপ্তানি আয় বিশেষ বাড়েনি, অথচ আমদানি ব্যয় খুবই বৃদ্ধি পায়। এই পরিকল্পনায় মহলানবিশ কৌশল অনুসরণ করে মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। ফলে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ মূলধন দ্রব্য আমদানি করতে হয়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই পরিকল্পনায় চলতি খাতে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল 1,725 কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে (1961-66) ভারত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আবার, ঐ সময়ে কয়েক বছর দেশের প্রচন্ড খরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে কৃষির ফলন খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসবের ফলে রাপ্তানি বিশেষ বাড়েনি। অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, মূলধনি দ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে হয়েছে। এসবের ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় 1,951 কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনার পর নানা আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও চাপের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনা ঠিক সময়ে শুরু করা যায়নি। পরিবর্তে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1966-69) গ্রহণ করা হয়ে থাকে ভারতের পরিকল্পনার ইতিহাসে 'পরিকল্পনা থেকে ছুটি' (Plan holiday) বলে অভিহিত করা হয়। এই তিন বছরে চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল 2,010 কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনার (1969-74) অন্যতম সাক্ষ্য ছিল স্বয়ম্ভরতা অর্জন। সেজন্য আমদানি-পরিবর্ততা নীতির উপর জোর দেওয়া হয়। এই নীতির মূলকথা হল আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্য দেশের মধ্যে তৈরি করা। তাছাড়া, পরিকল্পনার প্রথম দু-বছর আবহাওয়ার অবস্থা ভালো থাকায় শস্যের উৎপাদন ভালো হয় এবং খাদ্য আমদানি কম করতে হয়। এসবের ফলে আবদানি ব্যয় ততটা বাড়েনি। পাশাপাশি, রপ্তানি প্রসারের জন্যও নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসবের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি খাতে হয় 100 কোটি টাকা। ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে সেই প্রথম উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনার সময়েও (1974-79) প্রথম বছর (1974-75) বাদ দিলে অন্যান্য বছরগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি খাতে উদ্‌বৃত্ত ছিল। শুধু প্রথম বছরের চলতি খাতে ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে সমগ্র পরিকল্পনা কালে চলতি খাতে উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ ছিল 3,082 কোটি টাকা। এই উদ্‌বৃত্তের পিছনে কারণ হল অদৃশ্য খাতে আয়বৃদ্ধি। এই আয়বৃদ্ধির পিছনে আবার কারণগুলি হল বেআইনি লেনদেনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ,

পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশে প্রযুক্তি রপ্তানি, অনাবাসী ভারতীয়দের ভারতে অর্থ প্রেরণ এবং বিশেষ কন্ট্রাক্ট থেকে আয় বৃদ্ধি। এসবের ফলে পঞ্চম পরিকল্পনায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি খাতে উদ্‌বৃত্ত তৈরি হয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার (1980-85) সময়কালে চিত্রটি আবার পূর্বের ঘাটতির অবস্থায় ফিরে আসে। এই পরিকল্পনায় দৃশ্য বাণিজ্যের ব্যালান্সে ঘাটতি ছিল 30,456 কোটি টাকা। তবে অন্যান্য সমস্ত পরিকল্পনার মতোই অদৃশ্য বাণিজ্য ব্যালান্সে উদ্‌বৃত্ত ছিল। ঐ উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ ছিল 19,072 কোটি টাকা। ফলে চলতি ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় (30,456-19,072) কোটি টাকা বা 11,384 কোটি টাকা। এই বিপুল ঘাটতি মেটানোর জন্য ভারতকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে ঋণ নিতে হয়।

সপ্তম পরিকল্পনার (1985-90) সময় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। ঐ পরিকল্পনায় দৃশ্য বাণিজ্যে (visible trade) ঘাটতির পরিমাণ ছিল 54,204 কোটি টাকল, আর অদৃশ্য বাণিজ্যে (invisible trade) উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ ছিল 31,157 কোটি টাকা। ফলে চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল 41,047 কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার সময় থেকেই উদার আমদানি নীতি গৃহীত হয়। ফলে আমদানি ব্যয় বিপুলভাবে বাড়ে। তাই রপ্তানি যথেষ্ট বাড়লেও আমদানি তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়ে। ফলে এই পরিকল্পনায় লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে ঘাটতি বিশাল আকার ধারণ করে। সপ্তম পরিকল্পনার পর দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1990-92) গৃহীত হয়। সেক্ষেত্রেও ঐ দু-বছরে চলতি যাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল 19,606 কোটি টাকা।

অষ্টম পরিকল্পনাকালে (1992-97) লেনদেন ব্যালান্সে ঘাযতির পরিমাণ বিপুল আকার ধারণ করে। ঐ পরিকল্পনায় ঘাটতির পরিমাণ ছিল 62,914 কোটি টাকা অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত ঘাটতির পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। এর প্রধান কারণ হল উদার আমদানি নীতি এবং তার ফলে আমদানির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। 1991 সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে যাতে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের উপর খুবই জোর দেওয়া হয়। এর ফলে আমদানি ব্যয় বাড়ে এবং ফল স্বরূপ ও লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বাড়ে। নবম পরিকল্পনাতেও (1997-2002) আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির পিছনে একই বিষয়গুলি কাজ করেছে। এই পরিকল্পনার কালে লেদেন ব্যালান্সে চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল 53,175 কোটি টাকা।

দশম পরিকল্পনা (2002-07) এবং একাদশ পরিকল্পনাকালে (2007-12) উদারীকরণ নীতির ফলে আমদানির পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, রপ্তানি সেই হারে বাড়েনি। ফলে ঐ দুই পরিকল্পনাকালেও লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দেয়। দ্বাদশ পরিলক'নার (2012-17) সময়েও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির চিত্র একই রকমের। 2007-08 সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা ঘটে। এর অভিঘাত বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। এই মন্দার ফলে একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনার সময় রপ্তানি বিশেষ বাড়েনি। অথচ নানা কারণে আমদানি বেড়েছে। এই একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনার কালে ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে ঘাটতি থেকে গেছে।

ভারতের লেদেন ব্যালান্স সম্পর্কিত এই আলোচনার ক্ষেত্রে দু-একটি কথা উল্লেখের দাবি রাখে। **প্রথমত,** আমরা জানি যে, দৃশ্য বাণিজ্য ব্যালান্স = দৃশ্য রপ্তানি আয় – দৃশ্য আমদানি ব্যয়। ভারতে এই দৃশ্য বাণিজ্য ব্যালান্সে সর্বদাই ঘাটতি থেকে গেছে। **দ্বিতীয়ত,** সদৃশ্য বাণিজ্য ব্যালান্স = অদৃশ্য দ্রব্য বা সেবাকার্য হতে রপ্তানি আয়– অদৃশ্য দ্রব্য বা সেবাকার্য জনিত আমদানি ব্যয়। ভারতে এই অদৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য আমদানির যে

ব্যালান্স, সেই ব্যালান্সে সমস্ত পরিকল্পনাতেই উদ্‌বৃত্ত হয়েছে। অদৃশ্য বাণিজ্য এই উদ্‌বৃত্ত থাকার ফলে দৃশ্য বাণিজ্যের ঘাটতি অকেটা কমে গেছে। পরিকল্পনার যে সমস্ত বছরের চলতি খাতে উদ্‌বৃত্ত দেখা গেছে, তা এই অদৃশ্য বাণিজ্যের উদ্‌বৃত্তের জোরেই ঘটেছে। অর্থাৎ দৃশ্য বাণিজ্যের ঘাটতির চেয়ে অদৃশ্য বাণিজ্যের উদ্‌বৃত্ত কোনো কোনো বছর বেশি হয়েছে। ফলে সেই বছরগুলিতে ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে উদ্‌বৃত্ত দেখা গেছে। **তৃতীয়ত,** ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের এই ঘাটতি সপ্তম পরিকল্পনা (1985-90) থেকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1985 সাল হল ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণের যাত্রা শুরুর বছর। তাই ভারতে লেনদেন ব্যালান্সে ক্রমবর্ধমান ঘাটতির পিছনে উদারীকরণের নীতিকে অনেকে অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করেন।

5.5 ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির কারণসমূহ (Couses of Deficit in the Balance of Payments of India)

চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি বছর বাদ দিলে ভারতের সমগ্র পরিকল্পনাকালে (1951-2017) লেনদেন ব্যালান্সে চলতি খাতে ঘাটতি দেখা গেছে। এই ঘাটতির পিছনে নানা কারণ কাজ করেছে। আমরা এখানে ভারতের লেনদেন ঘাটতির প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করব।

1. সবুজ বিপ্লবের পর ভারত খাদ্যে অনেকটাই স্বয়ম্ভর হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের ঠিক পরে পরেই ভারত তীব্র খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে ভারতকে তখন বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। এমনকি 1990-এর দশকে এবং তার পরেও ভারতকে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়লেও জনসমস্যা বৃদ্ধির দরুন খাদ্যের এই ঘাটতি ভারতে রয়ে গেছে।

2. দেশ বিভাগের পর ভালো পাট উৎপাদনকারী জমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ভাগে পড়েছে। ফলে ভালো জাতের কাঁচা পাট ভারতকে আমদানি করতে হয়েছে। তাছাড়া শিল্পের জন্য অন্যান্য কাঁচা মাল, যেমন, কাঁচা তুলো, চামড়া প্রভৃতিও ভারতকে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছে।

3. সাম্প্রতিক বছরগুলিকে পেট্রোল এবং পেট্রোল-সংশ্লিষ্ট জ্বালানির দাম যথেষ্ট বেড়েছে। এর ফলে ভারতের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

4. 1991 সালের পর ভারত উদারনীতি গ্রহণ করে। আমদানির উপর বিধিনিষেধ অধিকাংশই তুলে নেওয়া হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (Foreign Exchange Regulation Act বা FERA) তুলে দিয়ে সম্পর্কে একটি উদার আইন নিয়ে এ সম্পর্কে হয়েছে। এর নাম হল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (Foreign Exchange Management Act বা EEMA)। এ সমস্ত উদারনীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের আমদানি সম্প্রতি বিশেষত 2000 সালের পর, ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। ফলে আমদানি ব্যয় বেড়েছে এবং তা লেনদেন ঘাটতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে ঘাটতির পিছনে এই উদার আমদানি নীতিকেই অনেকে দায়ী করেন।

5. ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে নিরবচ্ছিন্নভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেই চলেছে। এর ফলে একদিকে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় বাড়ার ফলে ভারতের রপ্তানি কমেছে এবং অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে জিসিপত্রের দাম বাড়ার ফলে বিদেশ থেকে বেশি দ্রব্যসামগ্রী এসেছে অর্থাৎ আমদানি বেড়েছে দুয়ের সম্মিলিত প্রভাবে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে।

6. ভারত সরকারের বিদেশি ঋণ এবং সুদ প্রদানের ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে। সেজন্য অদৃশ্য পাওনা থেকে উদ্‌বৃত্ত আশানুরূপ বাড়েনি। এর ফলেও লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

7, উদারীকরণের যুগে বিদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে লোকের পরিচিতি বাড়ছে। ফলে তাদের ভোগ প্রবণতা, বিশেষত বিদেশি দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ, বাড়ছে। এভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এই চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করার মতো উদ্‌বৃত্ত বিশেষ থাকছে না। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

8. ভারতের শিল্পায়নের প্রয়োজনে এবং সেবা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ভারতকে প্রচুর পরিমাণ মূলধনি দ্রব্য ও যন্ত্রাপতি আমদানি করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির এটিও অন্যতম কারণ।

9. বিগত বছরগুলিতে প্রধান বিদেশি মুদ্রাগুলির তুলনায়, বিশেষত মার্কিন ডলারের তুলনায়, ভারতীয় মুদ্রার অর্থাৎ রুপি-র মূল্য হ্রাস পেয়েছে। ফলে ভারতের আমদানি মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিও ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির একটি প্রধান কারণ।

10. ভারতের অধিকাংশ আমদানি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। ফলে আমদানির দাম বাড়লেও চহিদা সেই অনুপাতে কমেনি। ফলে আমদানি ব্যয় বেড়েছে এবং তার জন্য লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বেড়েছে।

সুতরাং, ভারতে লেনদেন ঘাটতির পিছনে অনেক কারণ আছে। তবে এসমস্ত কারণের মধ্যে সাম্প্রতিক উদারনীতিকেই ভারতের লেনদেন ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

5.6 ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করতে সরকারি ব্যবস্থাসমূহ (Government Masurs to Remove the Deficut in the Balance of Payments of India)

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনা বছরগুলি বাদ দিলে ভারতে সমগ্র পরিকল্পনাকালে (1951-2017) লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে ঘাটতি দেখা দেয়। অবস্থা চরম বিপর্যয়ের আকার নেয় 1991 সালে। ঐ বছর সে মাসে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ 2,600 কোটি টাকায় নেমে আসে। এর দ্বারা সেই সময় মাত্র দু-সপ্তাহের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব ছিল। এই অবস্থা বা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ভারত সরকার কিছু আপৎকালীন বা জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমরা এগুলিকে স্বল্পকালীন ব্যবস্থা বলতে পারি। এছাড়া ভারতের চলতি খাতে ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু দীর্ঘকালীন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। আমরা উভয়প্রকার ব্যবস্থা নিয়ে একে একে আলোচনা করব।

জরুরি বা স্বল্পকালীন ব্যবস্থাসমূহ (Emergency or Short Term Measures)

(i) বিদেশিদের পাওনা মেটানোর জন্য ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক 46.9 টন সেনা বন্ধক রেখে 40 কোটি ডলার ধার করে।

(ii) 1991 সালের জুলাই মাসে দু'দফায় টাকার বৈদেশিক মূল্য প্রায় 20 শতাংশ হ্রাস করা হয়। একে বলা হয় দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন (devaluation)। এর ফলে দেশটির অমাদানি কমে ও রপ্তানি বাড়ে এবং সাধারণত দেশটির লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি কমে।

(iii) ঐ সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (International Monetary Fund বা IMF) থেকে ভারত 22 কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করে।

(iv) ভারতের স্টেট ব্যাংক 20 কোটি ডলার মূল্যের সোমা বিদেশে বিক্রি করে। চুক্তি ছিল যে, স্টেট ব্যাংক ইচ্ছা করে পরে এই সোনা কিনে নিতে পারবে।

এই সমস্ত আপৎকালীন বা সম্বল্পকালীন ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও ভারত সরকার লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি মেটাতে কিছু দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আমরা এই দীর্ঘকালীন ব্যবস্থাগুলি এখন আলোচনা করব।

দীর্ঘকালীন ব্যবস্থাসমূহ (Long term measurs)

1. ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে দামস্তর ক্রমাগত বাড়ার ফলে একদিকে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে এবং তার ফলে রপ্তানি কমেছে। অন্যদিকে, দেশীয় বাজারে দামস্তর বাড়ার ফলে আমদানি বেড়েছে। দুয়ের সম্মিলিত ফলে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বেড়েছে। এক্ষেত্রে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বেড়েছে। এক্ষেত্রে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির অন্যতম কারণ হল অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি। সরকার তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নাা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষত বাজেট ঘাটতি কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সরকারি ব্যয়ে শৃঙ্খলা আনা হচ্ছে।

2. ভারত সরকার নতুন আর্থিক নীতি ও শিল্পনীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতিতে সরকারি ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হয়েছে। সরকারি ক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রি করে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। আশা করা হয়েছে যে, এতে সরকারের আয় বাড়বে। অনেকে অবশ্য লেনদেন ঘাটতি বৃদ্ধির জন্য সরকারের উদারনীতিকেই দায়ী করেছেন।

3. রপ্তানি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 1993-94 সালে লেনদেন ব্যালান্সের চলতি যাতে টাকাকে পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য করা হয়েছে।

4. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (Foreign Exchange Regulation Act বা FERA) সংশোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোনো ভারতীয় কোম্পানিতে 51 শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে পারবে। নতুন আইনের নাম হল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (Foreign Exchange Management Act বা FEMA)।

5. খাদ্যাস্য এবং কৃষিজাত কাঁচামালের আমদানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

6. তেল আমদানি কমিয়ে আমদানি ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে তেলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

7. রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশে সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সেগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(i) প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা : রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকারি নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

(ii) রপ্তানির বৈচিত্র্যসাধন ও নতুন বাজারের আবিষ্কার এবং

(iii) রপ্তানিকারীদের সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহদান।

এভাবে সরকার একদিকে রপ্তানি প্রসারের উপর জোর দিয়েছে, অন্যদিকে আমদানির উপর বিধিনিষেধও

তুলে দিচ্ছে। 1950-85 সময়কালে ভারতে যে শিল্পায়নের কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল তাকে বলা হয় অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল (inward looking approach)। এর মূল কথা হল, দেশীয় শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করে শিল্পায়ন ঘটানো। সেজন্য ঐ সময়কালে আমদানি নিয়ন্তরণ করা হয়েছিল এবং আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়েছিল। শিল্পায়ন তথা বৈদেশিক বাণিজ্যিক সম্পর্কে এই নীতিকে বলা হয় আমদানি পরিবর্তন নীতি (Policy of import substitution)। 1985 সালের পর ভারত সরকার শিল্পায়নের তথা উন্নয়নের যে কৌশল গ্রহণ করেছে তাকে বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশল (Outward looking approach) বলা হয়। এই কৌশলের মূল কথা হল একদিকে রপ্তানি প্রসারের উপর জোর দেওয়া এবং অন্যদিকে আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া। নতুন এই নীতিতে কিন্তু ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি কমেনি, বরং তা বেড়েই চলেছে। আসলে এই উদারীকরণের নীতির ফলে আমদানি বিপুল পরিমাণে বেড়েছে কিন্তু রপ্তানি তেমন বাড়েনি। ফলে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বেড়েছে।

5.7 রপ্তানি প্রসারের জন্য সরকারি ব্যবস্থাসমূহ (Government Measures to Promote Exports)

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি। এই ঘাটতি দূর করতে হলে একদিকে যেমন আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি রপানির প্রসার ঘটাতে হবে। ভারত সরকার রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যে নয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সেই ব্যবস্থাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (A) প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা, (B) রপ্তানির বৈচিত্র্যসাধন ও নতুন বাজারের আবিষ্কার, (C) রপ্তানিকারীদের সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহদান এবং (D) ব্যবস্থা। আমরা এগুলি সম্পর্কে পর পর সংক্ষেপে আলোচনা করব।

A প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা : রপ্তানি প্রসারের জন্য ভারত সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাগত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(i) রপ্তানি প্রসার পর্ষদ (Export Promotion Council) স্থাপন। 2022 সালের মে মাসে এরূপ পর্ষদের সংখ্যা ছিল চোদ্দো (14)। সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের রপ্তানি প্রসারের উপায় ও নীতি নির্ধারণ করাই এই পর্ষদগুলির কাজ।

(ii) চা, কফি, রবার, মশলা ও তামাক এই পাঁচটি দ্রব্যের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনে পৃথক পৃথক বোর্ড গঠন করা হয়েছে। 2022 সালের মে মাসে এরূপ বিধিবদ্ধ বোর্ডের সংখ্যা ছিল পাঁচ (5)। এই বোর্ডগুলি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন, উন্নয়ন ও রপ্তানির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

(iii) 1964 সালে রপ্তানি ঋণ ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন (Export Credit and Guarantee Corporation বা ECGC) স্থাপন। এই কর্পোরেশন রপ্তানিকারীদের ঋণদান করে এবং রপ্তানি ঝুঁকির বিমার ব্যবস্থা করে।

(iv) মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের রপ্তানি প্রসারে সাহায্য করার জন্য বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা (Trade Development Authority বা TDA) স্থাপন।

(v) রপ্তানি দ্রব্যের গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য Indian Standard Instutute (ISI) এবং এবং পরে আরো শক্তিশালী Burean of India Standards (BIS) গঠন।

(vi) বৈদেশিক বাণিজ্যে শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) স্থাপন।

(vi) বিদেশে বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি সংগঠিত করার জন্য Trade Fair Authority of India (TFAI) স্থাপন,

(vii) State Trading Corporation of India (STCI)-র মাধ্যমেও রপ্তানির ব্যবস্থা প্রভৃতি।

B. রপ্তানির বৈচিত্র্যসাধন ও নতুন বাজারের আবিষ্কার : এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হল :

(i) বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন,

(ii) বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ,

(iii) আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী অধিদপ্তর (Directoratee of Exhibition) স্থাপন,

(iv) এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কারিগরি কৌশল রপ্তানির ব্যবস্থা,

(v) রপ্তানির সম্ভাবনা উজ্জ্বল এরূপ দ্রব্যগুলিকে চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

C. রপ্তানিকারীদের সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহদান ঃ এর অধীনে গৃহীত উল্লেখযাগ্য ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) 1992 সালে চলতি খাতে ভারতীয় মুদ্রার পূর্ণ রূপান্তরযোগ্যতা প্রবর্তন। এর ফলে রপ্তানিকারীরা চলতি খাতে রপ্তানির মাধ্যমে যে বিদেশি মুদ্রা উপার্জন করছে তার সবটাই বাজারে প্রচলিত হারে টাকায় রূপান্তরিত করতে পারছে। এতে তারা বেশি টাকা পাচ্ছে, কারণ বাজারে প্রচলিত বিনিময় হার সরকারি হারের চেয়ে বেশি।

(iii) রপ্তানিকারীদের সুলভে ঋণ দানের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকে একটি পৃথক সেল (cell) বা বিভাগ গঠন,

(iii) রেল ও সমুদ্রপথে রপ্তানি দ্রব্য পরিবহণের জন্য সুবিধাজক মাশুল প্রথা প্রবর্তন,

(iv) রপ্তানি থেকে অর্জিত মুনাফায় আয়কর ছাড়ের ব্যবস্থা,

(v) কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি শুল্কের বিলোপ,

(vi) রপ্তানি শিল্পকে লাইসেন্স দানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রভৃতি।

(D) অন্যান্য ব্যবস্থা : রপ্তানি প্রসারের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(i) টাকার অবমূল্যায়ন (devalnation)। 1966 সালের জুন মাসে ডলারের অঙ্কে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়। পুনরায় 1991 সালের জুলাই মাসে দু-দফায় 20 শতাংশের মতো টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া, স্টার্লিং-এর অঙ্কে টাকার মান কয়েকবার কমানো হয়। অবমূল্যায়নের ফলে রপ্তানি বাড়ে ও আমদানি কমে।

(ii) রিজার্ভ ব্যাংকের আর্থিক নীতি ও ভারত সরকারের রাজস্ব নীতির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ।

এসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেও কিন্তু ভারতের রপ্তানি বিশেষ বাড়েনি। ফলে ভারতকে অনেক সময়ই বিদেশি ঋণ ও সাহায্যের উপর, বিশেষত IMF (আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার) এবং বিশ্বব্যাংকের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। লেনদেন ঘাটতি মেটানোর জন্য তাই রপ্তানি প্রসাবের চেষ্টার পাশাপাশি আমদানি নিয়ন্ত্রণের উপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন।

5.8 আমদানি-পরিবর্ততা : সুফল ও কুফল (Import Substitution : Marits and Demerits)

আমদানি-পরিবর্ততার অর্থ হল আমদানি দ্রব্যমাসগ্রীর পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদনের নীতি গ্রহণকরা। যেসব দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করা হত, সেগুলির আমদানি কমিয়ে বা বন্ধ করে ঐগুলির পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই হল আমদানি-পরিবর্ততা। আর আমদানি দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যসামগ্রী যেসব শিল্পে উৎপন্ন হয় সেগুলিকে বলে আমদানি-পরিবর্ত শিল্প।

কোনো দেশ আমদানি-পরিবর্ততার নীতি গ্রহণ করলে দেশটির আমদানি ব্যয় কমবে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সে অনুকূল প্রভাব পড়বে। তাই ভারতেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু থেকেই (1950-51) আমদানি-পরির্ততার নীতি গৃহীত হয়। প্রথমদিকে ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলির পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে মূলধন দ্রব্যেরও পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়া হয়।

আমদানি-পরিবর্ততা নীতির পক্ষে কতগুলি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। **প্রথমত**, আমদানি-পরিবর্ততার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হল শিশুশিল্পের যুক্তি। এই নীতির ফলে দেশের শিশু শিল্পগুলি রক্ষা পায়। উন্নত দেশ থেকে অবাধে আমদানি ঘটলে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পগুলি বিনষ্ট হবে। উন্নত দেশের শিল্পগুলির সঙ্গে ভারতীয় শিশু শিল্পগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। তাই এদের রক্ষা করার জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। একেই বলা হয় **শিশু শিল্পের যুক্তি** (Infant industry argument)। **দ্বিতীয়ত,** আমদানি নিয়ন্ত্রিত হলে বিদেশি মুদ্রার সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। আমদানি অবাধ হলে অকাম্য দ্রব্যের আমদানিতে দুর্লভ বিদেশি মুদ্রার অপচয় হয়। **তৃতীয়ত,** আমদানি-পরিবর্ততার নীতি অনুসরণ করলেন দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটে। শিল্পের উৎপাদনে বৈচিত্র্য আসে। **চতুর্থত,** আমদানি-পরিবর্ততা নীতি দেশকে শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইয়ং সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। **পঞ্চমত,** ভারতের ন্যায় কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে কিছু অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প থাকে। এগুলির বিকাশের জন্য মূলধন দ্রব্য, কাঁচামাল ইত্যাদির প্রয়োজন মেটাতে হলে বিদেশি মুদ্রার উপযুক্ত আকারের তহবিল থাকা প্রয়োজন। আর তার জন্য চাই আমদানি নিয়ন্ত্রণ। **ষষ্ঠত,** বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করলে বিদেশের আয় ও নিয়োগ বাড়ে। দেও এর দ্বারা উপকৃত হয় না। আমদানি দ্রব্য ব্যবহার না করে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করলে দেশের উৎপাদন ও আয় বাড়ে। **সপ্তমত,** বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করলে তা দেশের পক্ষে প্রায়শই শুভ হয় না। বিদেশি প্রযুক্তি মূলধন নিবিড়। এই প্রযুক্ত ব্যবহারের ফলে দেশের কর্মসংস্থান কমে যায়। দেশের লোকেদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমে। বাজার সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে শিল্পের উন্নতি ব্যহত হয়। দেশীয় প্রযুক্তির দ্বারা দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করলে বিদেশি প্রযুক্তির এই কুফল এড়ানো যায়।

ভারতে এই আমদানি-পরিবর্ততা নীতি 1950 থেকে 1980 সাল পর্যন্ত চলে। একে বলা হয় অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল (Inward looking approach)। দেশীয় শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করে শিল্পায়ন ঘটানোই হল এর মূল কথা। এই আমদানি-পরিবর্ততা নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতে অনেক শিল্প দ্রব্যেরই উৎপাদন বেড়েছে। ভারতের আমদানি বাণিজ্যের গঠনেও পরিবর্তন এসেছে। কিছু দ্রব্যের উৎপাদনে

ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এসকল দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে সেলাই কল, বাইসাইকেল, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি এবং এদের সংখ্যা হল তিনশোরও বেশি।

ভারত আমদানি পরিবর্ততার নীতি অনুসরণ করার (1950-80) ফলে যে সমস্ত শিল্প বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে সেগুলি হল লৌহ ও ইস্পাত, রেলওয়ে ওয়াগন, নিউজপ্রিন্ট, কাগজ ও কাগজবোর্ড, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি। এই নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের শিল্প কাঠামোয় বৈচিত্র্যে এসেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সাধারণ শিল্প দ্রব্য ভারতে আর আমদানি করা হয় না। এখন ভারতের মোট আমদানির বেশিরভাগ দ্রব্যই হল কাঁচামাল, মূলধনি দ্রব্য এবং মধ্যবর্তী দ্রব্য (Intermediate goods)। এই মধ্যবর্তী দ্রব্যের মধ্যে একটি বিশেষ উদাহরণ হল খনিজ তেল। তেল শোধন করার ক্ষমতা কম বলে ভারতকে অশোধিত তেল রপ্তানি করে শোধিত তেল আমদানি করতে হয়। আমদানি-পরিবর্ততা নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের রপ্তানির গঠনেও পরিবর্তন এসেছে। আগে আমদানি করা হত এম অনেক জিনিস এখন রপ্তানি করা হচ্ছে। এটিকে আমদানি-পরিবর্ততার নীতির অনুসরণের ফল বলে ভাবা যেতে পারে।

তবে আমদানি-পরিবর্ততা নীতির কয়েকটি দুর্বলতাও আছে। **প্রথমত,** আমদানি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দেশীয় শিল্পপতিদের সংরক্ষণ দিলে তারা নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে সচেষ্ট হয় না। ফলে শিশু শিল্প চিরকালই শিশুই থেকে যায়। এতে দেশের সম্পদের অপচয় ঘটে।

দ্বিতীয়ত, আমদানি নিয়ন্ত্রণ করলে দেশীয় ভোক্তাদের বেশি দামে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য ভোগ করতে হয়। ফলে ক্রেতারা বঞ্চিত হয়, তাদের উপযোগ বা তৃপ্তি কমে।

তৃতীয়ত, আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু থাকলে বিদেশের উন্নত যন্ত্রাপতি ও কারিগরি জ্ঞান দেশের মধ্যে আসে না। ফলে দেশের শিল্পের দক্ষতা বাড়ে না।

চতুর্থত, আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে বাজারে নানা একচেটিয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা ক্রেতারা নানাভাবে শোষিত হয়।

পঞ্চমত, আমদানি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি চালু করতে হয়। এতে আমলা তান্ত্রিক প্রাধান্য ও নানা দুর্নীতি বাড়ে।

ষষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রে আমদানি-পরিবর্ততার নামে ভারতে বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, এগুলির উৎপাদন না বাড়ালেও ক্ষতি ছিল না। কেননা এগুলি সমাজের অভিজাত শ্রেণিরই চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এ ধরনের শিল্প গড়ে ওঠায় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর খুবই সামান্যই প্রভাব পড়েছে।

সপ্তমত, অনেক ক্ষেত্রে আমদানি-পরিবর্ততার নামে ভারতে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছে। সাবান, টুথপেস্ট, নরম পানীয়, প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতি দ্রব্যের ক্ষেত্রে এরূপ সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। এরফলে ভারতকে রয়ালটি বাবদ বিদেশি কোম্পানিগুলিকে অনেক অর্থ দিতে হচ্ছে। এই প্রকারের অমাদানি-পরিবর্ততা দেশের লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে না।

আমদানি-পরিবর্ততা নীতির এসমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও এর কোনো বিকল্প নেই। তাই এই নীতির বর্জন করা ঠিক নয়। তবে নির্বিচারে আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্য তৈরি করা ঠিক নয়। যেগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক সেই দ্রব্যগুলিই দেশে উৎপাদন করা প্রয়োজন। আবিদ হোসেন কমিটি বলেছিল, ভারতের প্রয়োজন শুধু

আমদানি-পরিবর্ততা নয়, বরং প্রয়োজন সুদক্ষ আমদানি-পরিবর্ততা। এর দ্বারা ভারতের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। কিন্তু 1980-র দশকের শুরু থেকে ভারত আমদানি-নিয়ন্ত্রণের বদলে আমদানি উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করে। একই সঙ্গে রপ্তানি প্রসারের উপরেও জোর দেওয়া হয়। একে বলা হয় বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশল (Outward looking strategy)। নতুন এই কৌশলে ভারতের রপ্তানি যে হারে বেড়েছে, আমদানি তার চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে। ফলে ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বেড়েই চলেছে।

5.9 রপ্তানি প্রসার বনাম আমদানি পরিবর্ততা (Export Promotion Versus Import Substitution)

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের একটি প্রধান সমস্যা হল লেনদেন ব্যালান্সে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি। রপ্তানি প্রসার নীতি এই সমস্যার সমাধান করতে চায় রপ্তানি বাড়িয়ে। এর ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি কমবে। অন্যদিকে, আমদানি-পরিবর্ততার নীতি লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির সমস্যার সমাধান করতে চায় আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্য দেশের মধ্যে তৈরি করে। এর ফলে আমদানি ব্যয় কমবে এবং লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি দূর হবে। প্রশ্ন হল, ভারতের পক্ষে কোন্ নীতির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আমরা উভয় নীতিরই ভালোমন্দ দিকগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। রপ্তানি প্রসার নীতির অসুবিধা এবং আমদানি-পরিবর্ততা নীতির সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

(i) রপ্তানি প্রসার নীতিতে রপ্তানি বাড়ানোর জন্য ভোগ কমানোর কথা বলা হয়। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে সাধারণ মানুষের ভোগের স্তর এমনিতেই নিম্ন। তা আরও কমানো কষ্টকর। আমদানি-পরিবর্ততা নীতিতে ভোগ কমানোর কথা বলা হয় না। সেক্ষেত্রে বিদেশি দ্রব্যের বদলে দেশের মধ্যে দ্রব্য তৈরি কার নেওয়ার কথা বলা হয়।

(ii) রপ্তানি প্রসার নীতিতে সরকারকে দক্ষ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হয়। নতুবা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়বে এবং তা বিশ্ববাজারে বিক্রি করা সম্ভব হবে না। আমদানি-পরিবর্ততার ক্ষেত্রে দেশে উৎপন্ন দ্রব্য দেশেই বিক্রি করা হয় বলে এধরনের সমস্যা নেই।

(iii) ভারত মূলত প্রাথমিক দ্রব্য রপ্তানি করে। এগুলির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। ফলে এ সকল দ্রব্যের জোগান বাড়লে আয় বাড়ে না, বরং অনেক সময় দাম বেশি হারে কমে রপ্তানি আয় কমে যায়। আমদানি পরিবর্ততার ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা নেই।

(iv) ভারতের ন্যায় স্বলোন্নত দেশের রপ্তানি দ্রব্যের মান আন্তর্জাতিক স্তরের নয়। ফলে উন্নতদেশগুলির দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিশ্ববাজারে নিজের দ্রব্য বিক্রি করা কঠিন। কিন্তু আমদানি-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নির্ভর করা হয়।

(v) রপ্তানি প্রসার ঘটাতে বিদেশের বাজারে নানারকম প্রচার চালাতে হয় যেগুলি খুবই ব্যয়সাধ্য। আমদানি-পরিবর্ততা নীতির ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই। পাশাপাশি, আমদানি-পরিবর্ততা নীতির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) আমদানি নিয়ন্ত্রণ করলে দেশীয় উৎপাদকেরা দ্রব্যের মান বাড়ানোর চেষ্টা করে না। ফলে ক্রেতারা বেশি দাম দিয়ে অপেক্ষাকৃত খোরাপ জিনিস পায়।

(ii) বিদেশি প্রতিযোগিতার ভয় থাক না বলে দেশীয় ফার্মগুলি দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করে না। ফলে তারা শিশুশিল্পই রয়ে যায়।

(iii) অনেক ক্ষেত্রে আমদানি পরিবর্ততার নীতি বিলাস দ্রব্য ও ধনীদের ব্যবহারের জন্য নানা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে। এতে সম্পদের অপব্যবহার ঘটে। রপ্তানি প্রসারের নীতির ক্ষেত্রে এধরনের অসুবিধা নেই।

(iv) আমদানি-পরিবর্ততার নামে প্রায়শই বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতাকে স্থাপন করা হয়। ফলে রয়ালটি ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থ এই সমস্ত সংস্থাকে প্রদান করতে হয়। রপ্তানি প্রসার নীতির ক্ষেত্রে এটি ঘটে না।

(v) আমদানি-পরিবর্ততা নীতি গ্রহণ করলে দেশীয় শিল্পক্ষেত্রে অদক্ষ একচেটিয়ার উদ্ভব হয়। এরা দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করে না। কিন্তু রপ্তানি প্রসার নীতিতে দক্ষতা বাড়িয়েই বিশ্ব বাজারে দ্রব্য বিক্রির চেষ্টা করতে হয়।

সুতরাং, উভয় নীতিরই কিছু দোষগুণ আছে। আমদানি-পরিবর্ততা নীতির বড় যুক্তি হল দেশের শিশুশিল্প রক্ষার যুক্তি ও কর্মনিয়োগের যুক্তি। কিন্তু এর বড় অসুবিধা হল দেশে অদক্ষ একচেটিয়ার উদ্ভব এবং দেশের ক্রেতাদের শোষণ। রপ্তানি প্রসার রীতিতে এই অসুবিধা নেই। কিন্তু সেখানে দ্রব্য বিক্রির জন্য বিদেশের বাজার খুঁজতে হয়। তাছাড়া, নীতিটি ব্যয়সাধ্যও বটে। এছাড়া, এই নীতিতে দেশের ভোগব্যয় কমাতে হয় যা ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে কষ্টকর। তাই ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে আমদানি-পরিবর্ততা নীতিই তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে যে সমস্ত দ্রব্যের সংযোগ প্রভাব বেশি সেগুলিরই আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের মধ্যে উৎপাদন করা প্রয়োজন। নির্বিচারে সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় নয়।

5.10 ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি (Recent Foreign Trade Policy of India)

1991 সালে ভারত উদারীকরণের নীতি গ্রহণকরে। আমদানির উপর বিধিনিষেধ ক্রমাগত তুলে নেওয়া হতে থাকে। পাশাপাশি রপ্তানি প্রসারের উপরও জোর দেওয়া হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া জোর গতি পায় বর্তমান শতাব্দীর শুরু বছরগুলি থেকে। 2004 সাল থেকে 2020 সাল পর্যন্ত তিনটি বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করে— (i) 2004-09 সালের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি, (ii) 2009-14 সালের বাণিজ্য নীতি এবং (iii) 2015-20 সালের বাণিজ্য নীতি। আমরা বর্তমান বিভাগে এই তিনটি বাণিজ্য নীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করব।

2004–09 সালের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি

2004-09 সালের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির মূল উপাদানগুলি হল :

(i) যে সমস্ত ক্ষেত্রের রপ্তানি ও নিয়োগ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, সেগুলির চিহ্নিতকরণ;

(ii) রপ্তানি প্রসার কর্মসূচি ঘোষণা,

(iii) সেবাকার্যের রপ্তানি কর্মসূচি,

(iv) রপ্তানি প্রসারকারী মূলধনি দ্রব্যের শুল্কবিহীন আমদানি,

(v) মুক্ত বাণিজ্য ও মজুত অঞ্চল গঠন,

(vi) পুরোনো মূলধনি দ্রব্য আমদানির ব্যবস্থা,

(vii) জৈব কলাকৌশল পার্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুবিধা দান প্রভৃতি।

2009–14 সালের বাণিজ্য নীতি

2009–14 সালের বাণিজ্য নীতিতেও আগের বাণিজ্য নীতির ন্যায় রপ্তানি প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বাণিজ্য নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(i) বিদেশের নতুন বাজারে সঙ্গে সংযোগ স্থাপন,

(ii) বিশেষ রপ্তানি শিল্প ইউনিটকে উৎসাহপ্রদান বৃদ্ধি,

(iii) আমদানি শুল্ক শিথিলকরণ,

(iv) রপ্তানিমুখী ইউনিটকে বিভিন্ন ছাড়,

(v) পচনশীল কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এক জানালা ব্যবস্থা,

(vi) কিছু রপ্তানিমুখী ইউনিট এবং Software Technology Park বা STP-র ক্ষেত্রে 100 শতাংশ আয়কর ছাড়,

(vii) রপ্তানিকারী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডলার ঋণের আশ্বাস প্রদান প্রভৃতি।

2015–20 সালের বাণিজ্য নীতি

ভারত সরকার এই বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করে 2015 সালের 1 এপ্রিল। এই নীতির প্রধান vision বা লক্ষ্য ছিল 2020 সালের মধ্যে বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের অংশ 2 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 3.5 শতাংশে নিয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য এই বাণিজ্য নীতিতে নতুন কিছু কর্মসূচি ও নীতির সুপারিশ করা হয় এবং বাপ্তানিকারী ফার্মগুলিকে নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়। এই বাণিজ্য নীতির একটি প্রধান পরিবর্তন হল রপ্তানি প্রসারের জন্য আগের উৎসাহদানের নীতিগুলিকে মাত্র দুটির অধীনে নিয়ে আসা। একটি হল : Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) এবং অপরটি হল : Services Exports from India Scheme (SEIS)। প্রথমটি দ্রব্যসামগ্রীর জন্য এবং দ্বিতীয়টি সেবাকার্যের জন্য।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াতে 2015-20 সালের বাণিজ্য নীতিতে আরো কিছু ব্যবস্থা ঘোষনা করা হয়। সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হল : (i) 8E2 এলাকার শিল্প ইউনিটগুলিতেও MEIS এবং SEIS-এর সুবিধা বিস্তৃত করা, (ii) প্রতিরক্ষা, ওষুধ এবং পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যে কর ছাড়ের সময়সীমা বৃদ্ধি, (iii) ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণের উপরে সুন্দর ক্ষেত্রে অর্থসাহায্য, (iv) রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিটকে নানা উৎসাহ (incentive) প্রদান।

তবে পাঁচ বছরে বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের অংশ 2 শতাংশ থেকে 3.5 শতাংশে পৌঁছাবে বলে যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল, তা ছিল অতি আশাবাদী এবং অবাস্তব। 2019 সালে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতে অংশ ছিল 1.71 শতাংশ। অবশ্য সেবাকার্যের ক্ষেত্রে এই অংশ ছিল 3.5 শতাংশ। যা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছিল (সূত্র ঃ www.statista.com)।

5.11 সারাংশ (Summary)

1. ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনগুলি তিনটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে : (i) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে পরিবর্তন, (ii) বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন এবং (iii) বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশগত পরিবর্তন। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে গেলে উল্লেখযোগ্য হল ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে বিপুল বৃদ্ধি। 1950-51 থেকে 2014-15 সালের মধ্যে ভারতের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় 298 গুণের মতো। এর মধ্যে রপ্তানি বেড়েছে 245 গুণ এবং আমদানি বেড়েছে 352 গুণ। অর্থাৎ রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হারে বেড়েছে। এর ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণও বেড়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন বলতে রপ্তানি ও আমদানি কাঠামোয় পরিবর্তনকে বোঝায়। 1950-51 সালে ভারত 50টির মতো দ্রব্য রপ্তানি করত। কিন্তু বর্তমানে ভারত 3,000টিরও বেশি দ্রব্য রপ্তানি করে। আগে ভারতের রপ্তানি কাঠামোতে চিরাচরিত পণ্যের, যেমন, চা, কফি, মশলা, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতির প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে তা অনেকটাই কমে গেছে। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এবং রাসায়িনক দ্রব্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তেমনি, আগে ভারত প্রধানত কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করত এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করত। অর্থাৎ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের। বর্তমানে তা নেই। ভারতের বর্তমান আমদানি কাঠামোয় মূলধনি দ্রব্য এবং মধ্যবর্তী দ্রব্যের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যেণ দেশগত পরিবর্তন সম্পর্কে বলা যায় যে, আমদানি ও রপ্তানি উভয়ক্ষেত্রেই OECD গোষ্ঠীর সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলেও শতকরা অংশ হিসাবে তা কমেছে। OPEC দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে। আর পূর্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

2. ভারতের লেনদেন ব্যালান্স : বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ক্রমশই বেড়েছে। কেবলমাত্র চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় লেনদেন ব্যালান্সে উদ্‌বৃত্ত দেখা গিয়েছিল।

3. ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির কারণসমূহ : ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির প্রধান কারণগুলি হল : খাদ্যশস্যের আমদানি, কাঁচাপাট, কাঁচা তুলো প্রভৃতি আমদানি, পেট্রোল আমদানির ব্যয়, উদার আমদানি নীতি গ্রহণের ফলে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদানের ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়ার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির হার হ্রাস প্রভৃতি।

4. ভারতের লেনদেন ব্যলান্সে ঘাটতি দূর করতে সরকারি ব্যবস্থাসমূহ : লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করতে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (i) বিদেশি মূলধনের আমদানির

উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছে। (ii) রপ্তানি প্রসারের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (iii) কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানি কমানোর জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। (iv) তেল আমদানি কমানোর জন্য তেলের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

5. রপ্তানি প্রসারের জন্য সরকারি ব্যবস্থাসমূহ : রপ্তানি প্রসারের জন্য ভারত সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (i) রপ্তানি প্রসারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, (ii) রপ্তানি বৈচিত্র্যসাধন ও নতুন বাজারের আবিষ্কার এবং (iii) রপ্তানিকারীদের নানা সুযোগসুবিধা ও উৎসাহ প্রদান।

6. আমদানি পরবির্ততা : সুফল ও কুফল : আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করার নীতি গ্রহণ করাকে বলে আমদানি পরিবর্ততা। ঐসব দ্রব্যসাগ্রী যেসব শিল্পে উৎপন্ন হয় সেগুলিকে বলে আমদানি-পরিবর্ত শিল্প। আমদানি-পরিবর্ততা নীতির সুফলগুলি হল— (i) এই নীতির ফলে দেশীয় শিশু শিল্পগুলি রক্ষা পায়। (ii) এই নীতির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। (iii) দেশীয় শিষল্পর প্রসার ঘটে, এবং শিল্পের উৎপাদনে বৈচিত্র্য আসে। (iv) বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমে। পাশাপাশি, আমদানি-পরিবর্ততা নীতির কুফলগুলি হল ঃ (i) দেশি শিল্পপতিদের বিদেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় না বলে তারা দক্ষতা বাড়াতে সচেষ্ট হয় না। (ii) দেশেণ লোকেদের বেশি দামে অপেক্ষাকৃত খারাপ মানের জিনিস ভোগ করতে হয়। (iii) বিদেশের উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি দেশে আসে না। (iv) আমদানি-পরিবর্ততার নামে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাথে সহযোগিতা স্থাপিত হয়। এতে একদিকে অনেক অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে এবং অন্যদিকে রয়ালটি বাবদ বহু অর্থ বিদেশে চলে গেছে।

7. রপ্তানি প্রসার বনাম আমদানি পরিবর্ততা : রপ্তানি প্রসার নীতির অসুবিধাগুলি হল— ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে ভোগ আরও কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানো কষ্টকর; রপ্তানি প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ পরিকাঠামো গড়ে তোলার সমস্যা, রপ্তানি দ্রব্যের চাসহদায় অস্থিতিস্থাপকতার সমস্যা, বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করে দ্রব্য বিক্রির সমস্যা ইত্যাদি। অন্যদিকে, আমদানি-পরিবর্ততা নীতির অসুবিধাগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির তাগিদ নষ্ট হওয়া, ভোগকারীর বেশি দামে কম মানের দ্রব্যের ব্যাপ্তি, অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে উৎসাহ বৃদ্ধি প্রভৃতি। তবে আমদানি-পরিবর্ততা নীতির বড় যুক্তি হল নিয়োগ বৃদ্ধির যুক্তি। অন্যদিকে, রপ্তানি প্রসারের জন্য বিদেশের বাজার খুঁজতে হয়। তাই আমদানি-পরিবর্ততা নীতিই অধিকতর শ্রেয়। তবে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশকে সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করতে হবে কোন্ কোন্ আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য আগে তৈরি করা শুরু করতে হবে।

8. ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি : নতুন শতাব্দীতে ভারত সরকার তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করেছে। সেগুলি হল— (i) 2004-09 সালের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি, (ii) 2009-14 সালের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি এবং (iii) 2015-20 সালের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি। এই বাণিজ্য নীতিগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে ক্রমাগত আরো আরো উদার করা হয়েছে। একদিকে রপ্তানি বাড়ানোর জন্য রপ্তানিকারীদর নানা রকম ছাড় দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আমদানি উদারীকরণের নীতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের এই নীতি হল এককথায় রপ্তানি প্রসার ও আমদানি উদারীকরণের নীতি। শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের এই কৌশলকে বলা হচ্ছে বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশল। মোটামুটি 1985 সাল থেকে এই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এর পূর্বের সময়কালে (1950-85) অনুসৃত হয়েছিল আমদানি-নিয়ন্ত্রণ ও আমদানি-পরিবর্ততার নীতি। শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কে ভারত সরকারের সেই কৌশলকে বলা হয় অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল।

5.12 অনুশীলনী (Exercise)

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer-type Questions)**

১. ভারতের প্রধান কয়েকটি আমদানি দ্রব্যের নাম বল।
২. ভারতের চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যগুলি কী কী?
৩. ভারতের সাম্প্রতিক রপ্তানি দ্রব্যগুলির নাম লেখো।
৪. OECD-র পুরো কথাটি কী?
৫. OPEC-র পুরো নাম বল।
৬. আমদানি পরিবর্ততা কাকে বলে?
৭. IMF ও IBRD-র পুরো নাম কী?
৮. ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য কাকে বলে?
৯. অবমূল্যায়ন কাকে বলে?
১০. শিশুশিল্পের যুক্তি বলতে কী বোঝ?
১১. 'পরিকল্পনা থেকে ছুটি' বলতে কী বোঝ?
১২. দৃশ্য বাণিজ্য ব্যালান্সের সংজ্ঞা দাও।
১৩. FERA কথাটির পূর্ণ রূপ কী?
১৪. অদৃশ্য বাণিজ্য ব্যালান্স কাকে বলে?
১৫. FEMA কথাটির পূর্ণ রূপ কী?
১৬. ISI এবং BIS-এর পুরো নাম কী?
১৭. বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনে পরিবর্তন বলতে কী বোঝ?
১৮. বৈদেকি বাণিজ্য প্রসঙ্গে POL কথাটি কী?
১৯. কোন্ পরিকল্পনাকালে ভারতে সর্বপ্রথম বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্‌বৃত্ত দেখা যায়?
২০. পুরো কথাটি লেখো : IIFT এবং TFAI

■ **মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium Answer-type Questions)**

১. ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশি বাণিজ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো।
২. ভারতের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির কয়েকটি কারণ উল্লখ করো।
৩. লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করার জন্য ভারত সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?
৪. ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানির গঠনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা উল্লেখ করো।
৫. ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের গঠনে কীরূপ পরিবর্তন ঘটেছে?
৬. ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণে কীরূপ পরিবর্তন ঘটেছে?
৭. আমদানি-পরিবর্ততা নীতির পক্ষে কয়েকটি যুক্তি দাও।

৮. আমদানি-পরিবর্ততা নীতির অসুবিধাগুলি কী কী?

৯. বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশল ও অন্তর্মুখী উন্নয় কৌশল কাকে বলে?

১০. ভারতের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশগত পরিবর্তন কীরূপ ঘটেছে?

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long Answer-type Questions)**

১. ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যর সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি উল্লেখ করো।

২. ভারতের সাম্প্রতিক লেনদেন ব্যালন্সের ঘাটতির কারণগুলি কী কী?

৩. লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করতে ভারত সরকার কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে?

৪. ভারতের রপ্তানি প্রসারের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি বর্ণনা করো।

৫. আমদানি পরিবর্ততা কাকে বলে? এই নীতির সুফল ও কুফলগুলি আলোচনা করো।

৬. রপ্তানি প্রসার অথবা আমদানি-পরিবর্ততা নীতির মধ্যে তুমি কোন্‌টিকে সমর্থন করো। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৭. ভারত সরকারের সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

একক-6 ❑ ভারতের সামাজিক অর্থনীতি-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য

6.2 প্রস্তাবনা

6.3 দরিদ্র্যসীমার ধারণা

6.4 ভারতে দারিদ্র্যের বিভিন্ন পরিমাপ

6.5 বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক

6.6 ভারতে দারিদ্র্যের কারণ

6.7 ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা ও তার মূল্যায়ন

6.8 ভারতে বেকার সমস্যা

6.9 ভারতে বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ

6.10 ভারতে বেকারত্বের কারণ

6.11 ভারতের বেকার সমস্যার সমাধানে কিছু সুপারিশ

6.12 ভারতের বেকার সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে ভগবতী কমিটির রিপোর্ট

6.13 ভারতে বেকারি দূর করতে গৃহীত কর্মসূচি

6.14 কর্মনিয়োগ বাড়াতে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি ও তাদের মূল্যায়ন

6.14.1 সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি

6.14.2 জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচি বা প্রকল্প

6.14.3 গ্রামীণ ভূমিহীনদের রাজ্য নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প

6.14.4 মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি

6.15 সারাংশ

6.16 অনুশীলনী

6.17 গ্রন্থপঞ্জি

6.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে—

- দারিদ্র্যসীমা বলতে কী বোঝায়

- ভারতে দারিদ্র্যের পরিমাণ
- দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা
- ভারতে বেকার সমস্যার গভীরতা
- বেকার সমস্যা দূর করতে গৃহীত ব্যবস্থাদি
- ভারতের কর্মসংস্থান বাড়াতে কিছু বিশেষ কর্মসূচি

6.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

ভারতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দুটি সমস্যা হল দারিদ্র্য ও বেকারেত্বের সমস্যা। এই দুটি সমস্যা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বস্তুত ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বেকার বলেই তারা দরির। আমরা বর্তমান এককে প্রথমে ভারতে দারিদ্র্যের বিভিন্ন পরিমাপ উল্লেখ করব। ভারতের ব্যাপক দারিদ্র্যকে বিপুল আয়তনের বেকারত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। তাই বর্তমান এককে ভারতের বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা হবে। ভারতে বেকার সমস্যা দূর করতে কী করা উচিত তা নির্ণয় করতে ভগবতী কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। এই ভগবতী কমিটির রিপোর্টও বর্তমান এককে বিবেচনা করা হয়েছে। ভারতে বেকার সমস্যা দূর করতে সরকার কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তাও বর্ণনা করা হবে। সম্প্রতি ভারতে কর্মনিয়োগ বাড়াতে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষত, মহাত্মা গান্ধি জাতীয় নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি। এই কর্মসূচিগুলি তাদের উদ্দেশ্য পূরণে কতটা সফল হয়েছে তাও বিবেচনা করা হবে।

6.3 দারিদ্র্যসীমার ধারণা

ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র্যের সমস্যা। এই দারিদ্র্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দারিদ্র্যসীমা বা দারিদ্র্য রেখা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই দারিদ্র্য রেখার সাহায্যেই কোনো দেশের জনসংখ্যার কত অংশ দরিদ্র, তা জানা যায়।

দারিদ্র্য পরিমাপ করতে হলে প্রথমে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দুটি স্তরে দেওয়া যেতে পারে : একটি সর্মনিম্ন স্তরে এবং অপরটি কাম্য বা কাঙ্ক্ষিত স্তরে। ভারতীয় অর্থনীতির দারিদ্র্যের আলোচনায় নিম্নতম বা সর্বনিম্ন মানের ধারণা ব্যবহার করা হয়। কেননা, নিম্নতম মানে পৌঁছানোটাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা। সর্বনিম্ন প্রয়োজন মিটলে তবেই আমরা কাঙ্ক্ষিত মানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি।

দারিদ্র্য সম্পর্কে এই নিম্নতম মান পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে নানা হিসাবের দ্বারা। এই হিসাবগুলির প্রধান বক্তব্য হল যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে হয়। ঐ সমস্ত দ্রব্যসমাগ্রী ভোগ করে ঐ ব্যক্তিকে দৈনিক 2250 ক্যালোরি পেতে হবে। ঐ পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীকেই নিম্নতম মান হিসাবে ধরা হয়। ঐ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কিনতে যা খরচ পড়ে, টাকার অঙ্কে সেটাই নিম্নতম ভোগব্যয়। এটিই হল টাকার অঙ্কে দারিদ্র্যসীমা বা দারিদ্র্যরেখা। অতএব, দারিদ্র্যসীমা বা দারিদ্র্যরেখা বলতে সেই পরিমাণ আয় বা ভোগব্যয়কে বোঝানো হয় যার দ্বারা একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে দৈনিক 2,250 ক্যালোরি পেতে পারে। যে ব্যক্তি এই পরিমাণ ব্যয় নির্বাহ

করতে পারে না, তাকে দারিদ্র্য বলা হয় বা ঐ ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমার বা দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থান করছে বলা হয়। অন্যদিকে, যেব্যক্তি এই পরিমাণ ভোগব্যয় নির্বাহ করতে পারে, তাকে আমরা দারিদ্র্যসীমার উপরে বা দারিদ্র্যরেখার ঊর্ধ্বে বলে বিবেচনা করছি। যেমন, উদারহরণস্বরূপ, ভারতে 2021 সালে ভারতে দারিদ্র্যরেখা ছিল গ্রামীণ এলাকায় মাসিক 1,059.42 টাকা এবং শহর এলাকায় মাসিক 1,286 টাকা। এর অর্থ হল, গ্রামীণ এলাকায় কোনো ব্যক্তির খেয়ে পরে বাঁচার জন্য মাসে অন্তত 1,059.42 টাকা ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করার ক্ষমতা থাকতে হবে। যে গ্রামীণ ব্যক্তির আয় বা ব্যয় করার ক্ষমতা এর চেয়ে কম, তাকে দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত বলে বিবেচনা করা হবে। শহরের ক্ষেত্রে এই সর্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ হল মাসিক 1,286 টাকা। গ্রামের লোকেরা অনেকেই নিজেরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করে। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্যের দাম শহরের তুলনায় একটু কম। তাই গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে দারিদ্র্যরেখার মান শহরের দারিদ্র্যরেখার মান অপেক্ষা কম।

6.4 ভারতে দারিদ্র্যের বিভিন্ন পরিমাপ (Different Measures of Poverty in India)

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক ভারতে দারিদ্র্যের পরিমাণ পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে। এই সব পরিমাপে দৈনিক 2,250 ক্যালোরি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খাবারকেই নিম্নতম প্রয়োজন বলে ধরা হয়েছে। আমরা ভারতের দারিদ্র্যের কয়েকটি প্রধান পরিমাপ নীচে উল্লেখ করেছি।

1. বর্ধনের সমীক্ষা : অধ্যাপক প্রণব বর্ধন (গ্রামীণ) ভারতে দারিদ্র্য পরিমাপ করার জন্য দারিদ্র্যরেখা হিসাবে ধরেছেন মাথাপিছু মাসিক ব্যয় 15 টাকা। তাঁর হিসাবে অনুসারে, 1960–61 গ্রামীণ জনসংখ্যার 38 শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত। 1967-68 সালে দারিদ্র্যের এই হার বেড়ে দাঁড়ায় 53 শতাংশ। এর অর্থ হল, প্রণব বর্ধনের পরিমাপ অনুযায়ী, 1960-68 সময়কালে গ্রামীণ ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা লোকের সংখ্যা 15 শতাংশ বেড়েছিল।

2. ডা কোস্টার পরিমাপ : ডা. কোস্টা দারিদ্র্যকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন— চরম দুঃস্থতা, দুঃস্থতা এবং দারিদ্র্য (severdeshitution, destitution and poverty)। 1963-64 সালের জন্য তিনি ভারতের দারিদ্র্যের পরিমাপ করেছেন। তাঁর পরিমাপ অনুযায়ী, 1963-64 সারলে ভারতে 62 মিলিয়ন লোক ছিল চরম দুঃস্থ, 104 মিলিয়ান লোক ছিল দুঃস্থ এবং 162 মিলিয়ন লোক ছিল দরিদ্র। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, ঐ সময়ে ভারতে মোট জনসংখ্যার 13.2 শতাংশ ছিল চরম দুঃস্থ এবং 34.9 শতাংশ ছিল দরিদ্র।

3. দান্ডেকার ও রথ কর্তৃক পরিমাপ : ভারতের পরিকল্পনা কমিশন 1960-61 সালের দামস্তরে মাথাপিছু মাসিক 20 টাকা বা বার্ষিক 240 টাকা ব্যয়কে দারিদ্র্যের সীমারেখা হিসাবে ধরেছিল। ডি.এম. দান্ডেকর এবং এন. কে. রথ পরিকল্পনা কমিশনের দেওয়া এই দারিদ্র্য সীমার সংজ্ঞার একটু পরিবর্তন করেন। তাঁদের যুক্তি হল, দারিদ্র্যসীমার মানে গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকবে। তাঁদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, 1960-61 সালের দামস্তরে গ্রামাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যরেখা ছিল মাথাপিছু মাসিক 15 টাকা বা বার্ষিক 240 টাকা। আর শহরাঞ্চলে বছরে 270 টাকা বা মাসিক 22.50 টাকা ছিল দারিদ্র্যের সীমারেখা। এই মানদণ্ড ধরে দান্ডেকার ও রথ গ্রাম ও শহরের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমার নীচের অবস্থিত ব্যক্তিদের হিসাব করেন। তাঁদের পরিমাপ

অনুযায়ী, 1960 সালে গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার 40 শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত। শহরাঞ্চলে এই হার ছিল জনসংখ্যায় 50 শতাংশ। আবার, 1967-68 সালের দামস্তরে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে বছরে মাথাপিছু 324 টাকা ব্যয়কে এবং শহরাঞ্চলে বছরে মাথাপিছু 366 টাকার ব্যয়কে দারিদ্র্যরেখা হিসাবে ধরেছিলেন। এই মনাদন্ড ধরে দান্ডেকার ও রথ হিসাব করে দেকেছিলেন যে, 1968-69 সালে গ্রামীণ জনসংখ্যায় এই 40 শতাংশই ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে। আর শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার 50 শতাংশই ছিল দারিদ্র্যরেখার নীচে। আর শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার 50 শতাংশই ছিল দারিদ্যরেখার নীচে। সুতরাং, তাঁদের পরিমাপ অনুযায়ী, 1960-61 থেকে 1968-69 সালের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তির অনুপাত একই আছে। অবশ্য অনুপাত একই থাকলেও দরিদ্র জনসংখ্যার আয়তন বেড়েছে, কেননা দেশের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, ঐ সময়কালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র্যের সংখ্যা 135 মিলিয়ন থেকে বেড়ে 166.4 মিলিয়ন হয়েছে। আর শহরের ক্ষেত্রে ঐ সময়ের মধ্যে দরিদ্র জনসংখ্যার আয়তন 42 মিলিয়ন থেকে বেড়ে 49 মিলিয়ন হয়েছে।

4. বিশ্বব্যাংকের পরিমাপ : বিশ্বব্যাক ভারতের দারিদ্র্য পরিমাপ করার জন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশন প্রদত্ত দারিদ্র্যের সীমারেখার সংজ্ঞা ব্যবহার করেছে (1960-61 সালের দামস্তরে মাথাপিছু মাসিক আয় 20 টাকা বা মাথাপিছু বার্ষিক আয় 240 টাকা)। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, 1970 সালে ভারতে গ্রামীণ জনসংখ্যার 53 শতাংশ ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে। 1988 সালে তা কমে দাঁড়ায় 41.7 শতাংশ। আর শহরের ক্ষেত্রে এই অনুপাত 1970 সালে ছিল 45.5 শতাংশ। 1988 সালে তা কমে দাঁড়ায় 48 শতাংশ। সুতরাং, বিশ্বব্যাংকের পরিমাপ অনুযায়ী, 1970 থেকে 1988 এই সময়কালে ভারতে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের অনুপাত কমেছে। অবশ্য দারিদ্র্যের হার বা অনুপাত শতকরা হিসাবে কমলেও মোট দারিদ্র্যের সংখ্যা পরম অঙ্কে (in absolute terms) বেড়েছে কেননা মোট জনসংখ্যা বেড়েছে। (1970 সালে ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা ছিল 270 মিলিয়ন। 1988 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 322 মিলিয়ন।

5. আলুওয়ালিয়ার পরিমাপ : আলুওয়ালিয়া দেখিয়েছেন যে, কৃষির অবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্যের অনুপাতের একটি সম্পর্ক আছে। যে বছর কৃষির ফলন ভালো হয়েছে, সে বছর গ্রামীণ দারিদ্র্যের অনুপাত কমেছে। আর যে বছর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য কৃষির ফলন কম হলে গ্রামীণ দারিদ্র্যের অনুপাত বেড়েছে। তিনি দেখেছেন যে, 1956-57 সাল থেকে 1973-74 সাল পর্যন্ত গ্রামীণ জনসংসংখ্যার দারিদ্র্যের অনুপাত কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। তাঁর হিসাবে, 1956-57 সালে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার ছিল গ্রামীণ জনসংখ্যার 50 শতাংশ। 1960-61 সালে তা কমে 40 শতাংশ হয়। 1967-68 সালে তা আবার বেড়ে হয় 56.5 শতাংশ। এরপর 1973-74 সালে কমে দাঁড়ায় 47.1 শতাংশ।

6. তেন্ডুলকরের পরিমাপ : অধ্যাপক সুরেশ তেন্ডুলকর 2009 সালে দারিদ্র্যে পরিমাপের নতুন পদ্ধতির সুপারিশ করেন। তিনি দরিদ্রের ভোগ্যদ্রব্যের তালিকাকে আরও বিস্তৃত করেন। দরিদ্রদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়কে এই হিসাবে ধরা হয়েছে। দারিদ্র্য পরিমাপের নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যবহার করে তিনি দেখেছেন যে, 2004-05 সালে ভারতীয় জনসংখ্যার 37.2 শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত। গ্রামীণ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই হার হল 41.8 শতাংশ। আর শহরের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই দারিদ্র্যের হার 25.7 শতাংশ।

বিভিন্ন পরিমাপের ফলাফল থেকে দুটি সিদ্ধান্ত টানা যায়।

(i) দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার অনুপাত ধীরে হলেও কমেছে।

(ii) মোট জনসংখ্যা বাড়ার ফলে মোট দরিদ্র্যের সংখ্যাও বেড়েছে।

6.5 বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multi-dimensional Poverty Index বা MPI)

কোনো দেশ বা অঞ্চলের দারিদ্র্য পরিমাপ করতে সাধারণত দারিদ্র্যসীমা বা দারিদ্র্যরেখার ধারণা ব্যবহার করা হয়। জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে যা ব্যয় পড়ে সেই পরিমাণ ব্যয় বা আয়ই হল দারিদ্র্যসীমা বা দারিদ্র্যরেখা। একে সাধারণত মাসিক বা বার্ষিক পরিমাণে প্রকাশ করা হয়। দারিদ্র্য পরিমাপের এটি হল আয়ভিত্তিক (বা ব্যয়ভিত্তিক) পরিমাপ। যে ব্যক্তি মাসে বা বছরে ঐ পরিমাণ আয় বা ব্যয় করতে পারে না তাকে দারিদ্র বলা হয় বা ঐ ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে বলা হয়। চিরাচরিত এই পরিমাপের কিছু ত্রুটি আছে এই পরিমাপে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি উপযুক্ত স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ভদ্রস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কতটা বঞ্চিত হয় বা কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা ধরা পড়ে না। সেজন্যই দারিদ্র্য পরিমাপের এই চিরাচরিত আয়ভিত্তিক পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multi-dimensional Poverty Index বা MPI)। এটি 2010 সালে যৌথভাবে প্রথম তৈরি করে Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) এবং United Nations Development Programme (UNDP)। 100টি উন্নয়নশীল দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বিবেচনা করে এই দুই সংস্থা বিশ্বজনীন বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Global Multidimensional Poverty Index) তৈরি করে। 2021 সালের গ্লোবাল MPI অনুসারে 100টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল 66-তম। সম্প্রতি NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ ভারতের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক প্রকাশ করেছে। 2020 সালে UNDP যে বিশ্বজীনন বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বে 1.3 বিলিয়ন মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। এই দারিদ্র্যের ভার বা বোঝা 18 বছরের কম বয়সি বালকবালিকার উপর বেশি পড়ে। আরও জানা যাচ্ছে যে, বহুমাত্রিক দরিদ্র মানুষের প্রায় 84.3 শতাংশ সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে। NITI আয়োগের পরিমাপ অনুযায়ী 2021 সালে ভারতে মোট জনসংখ্যার 25 শতাংশ লোক বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত।

6.6 ভারতে দারিদ্র্যের কারণ (Couses of Poverty in India)

ভারতে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র্যের সমস্যা। ভারতে দারিদ্র্য ব্যাপক এবং অত্যন্ত প্রকট। এই দারিদ্র্যের পিছনে একাধিক কারণ কাজ করেছে। সংক্ষেপে সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

(i) আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির রচনায় নানা ত্রুটি ছিল। পরিকল্পনায় ধরা হয়েছিল যে, জাতীয় উৎপাদন বাড়লেই দারিদ্র্য কমবে। তাই প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুল দারিদ্র্য দূর করার কোনো প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম দারিদ্র্য দূর করার জন্য সরাসরি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(ii) ভারতে ব্যাপক দারিদ্র্যের আর একটি প্রধান কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বাড়ার ফলে আমাদের জাতীয় আয় বাড়লেও মাথাপিছু আয় তেমন বাড়েনি। ফলে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি। তাদের মধ্যে দারিদ্র্য রয়ে গেছে।

(iii) জনসংখ্যা বাড়ার ফলে দেশে দেখা দিয়েছে ব্যাপক বেকারি। কৃষি জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে প্রচ্ছন্ন ও মরশুমি বেকারি। শিল্পের অগ্রগতির হারে মন্থরতার দরুন কৃষির উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যাকে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়নি। তাছাড়া, বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর সরাসরি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রেও ধরা হয়েছিল যে, উৎপাদন বাড়লেই কর্মসংস্থান বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করার ফলে উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু নিয়োগ বা কর্মসংস্থান বাড়েনি। ভারতের বর্তমান শতাব্দীর উৎপাদন বৃদ্ধিকে তাই অনেকে নিয়োগহীন প্রসার বা jobless growth বলে অভিহিত করেছেন। কর্মসংস্থান বা নিয়োগ না বাড়ার ফলে বেকারি বেড়েছে। আর বেকারি এবং দারিদ্র্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ভারতে ব্যাপক দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল ব্যাপক বেকারত্ব।

(iv) ভারতে ব্যাপক দারিদ্র্যের আর একটি কারণ হল মুদ্রাস্ফীতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়কাল (1956-61) থেকে ভারতে প্রায় প্রতি বছরই দমাস্তর বেড়েছে। এই দামস্তর বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। স্থির ও নিম্নআয়ের লোকেদের দুর্দশা বেড়েছে। ফলে দারিদ্রসীমার নীচে জনসংখ্যার আয়তন বেড়েছে।

(v) ভারতে সম্পদ বণ্টনে তীব্র বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আয় বৈষম্য। সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য থাকায় উন্নয়নের সুফল গ্রামের মুষ্টিমেয় ধনী এবং শহরের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ভোগ করেছে। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছায়নি। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ভারতে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বেড়েছে।

(vi) ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া, এই সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের আগ্রহ কম। তারা বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে অনেক সময়ই অনীহা দেখিয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি নিয়ে প্রচারের আগ্রহ যতটা বেশি, প্রকল্প রূপায়ণে সেই আগ্রহ নেই। অনেক দারিদ্র্যের দূরীকরণ কর্মসূচি ঠিকঠাক রূপায়তি হয় না। কখন সেগুলি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়, আবার কখনও সেগুলির রূপায়ণে ঢিলেমি দেওয়া হয়।

(vii) অধিকাংশ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে দারিদ্র্যের হাতে কিছু টাকা তুলে দেওয়া হয়। ঐ টাকা খরচ হয়ে গেলে দরিদ্র ব্যক্তিটি পুনরায় দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ দ্বারা কোনো আয় সৃষ্টিকারী পরিসম্পদ তৈরি করতে হবে। তবেই দরিদ্র ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যরেখার উপরে তোলা যাবে।

(viii) ভারতে পিছনে আরোকয়েকটি কারণ হল : জনগণেণ বড় অংশেণ নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার, তাদের মধ্যে পেশাদারি মনোভাবের অভাব, উৎপাদন কৌশল নির্বাচনে চাষিদের মধ্যে রক্ষণশীলতা, শ্রমিকদের মধ্যে চলনশীলতার অভাব, কৃষির বৈচিত্র্যহীনতা, কৃষিতে জনসেচের সুবিধার অভাব, শিল্পক্ষেত্রে মন্থর অগ্রগতি প্রভৃতি।

6.7 ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা ও তার মূল্যায়ণ (Government Efforts to Remove Poverty in India and their Evaluation)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণের কোনো প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ছিল না। 1971 সালে সংসদীয় নির্বাচনের আগে **গরিবি-হঠাও** স্লোগান দেওয়া হয়। তারপর থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সেই কর্মসূচিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে :

1. পঞ্চম পরিকল্পনায় দরিদ্র জনসাংধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন প্রকল্প (Minimum Needs Programme বা MNP) গ্রহণ করা হয়। এই প্রকেল্পর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ, পুষ্টি বৃদ্ধি, বস্তি উন্নয়ন, গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়ন প্রভৃতি।

2. গ্রামীণ দ্রারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি : গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার বেশি। তাই গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূর করার জন্য বিশেষ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কর্মসূচিগুলি হল— (i) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme বা IRDP)। এই প্রকল্প গৃহীত হয়। 1978 সালে এই প্রকল্প গৃহীত হয়। (ii) গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Rural Landless Emplayment Guarantee Programme বা RLEGP)। এই প্রকল্পটি গৃহীত 1983 সালে। (iii) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প (National Rural Employment Programme বা NREP)। এই প্রকল্প গৃহীত হয় 1980 সালে। এছাড়া আরো কতকগুলি দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি হল— কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work বা FFW), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Development Agency বা SFDA), প্রান্তিক চাষি ও খেতমজুর উন্নয়ন সংস্থা (Marginal Farmers and Agricultural Labourars (MFAL), গ্রামীণ কর্মনিয়োগের জরুরি প্রকল্প (Crash Scheme for Rural Employment বা CSRE), খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প (Drought-Prone Area Programme বা DPAP), প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (Prime Minister Rozgar Yojana বা (PMRY), সম্পুর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana বা SGRY) প্রভৃতি।

3. নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প : 2005 সালে ভারত সরকার পাশ করে জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিতকরণ আইন (National Rural Employment Guarantee Act বা NREGA)। এই আইন মোতাবেক সরকার প্রবর্তন করেছে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranteeee Scheme বা MGNREGS)। প্রতি গ্রামীণ পরিবারের অন্তত একজন সক্ষম ব্যক্তিকে বছরে অন্তত 100 দিন কাজ দেওয়া এর উদ্দেশ্য। বর্তমানে ভারতের গ্রামাঞ্চলে এটিই অন্যতম নিয়োগ কর্মসূচি।

4. গ্রামীণ কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ও তাদের স্বনিযুক্ত হবার যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচির নাম হল স্ব-নিযুক্তির উদ্দেশ্যে গ্রামীণ যুবকদের শিক্ষণ (Training for Rural Youth for Self-Employment বা TRYSEM)। 1979 সালের 15 আগস্ট এই কর্মসূচি গৃহীত হয়।

5. শহরের দারিদ্য দূর করার জন্যও কিছু কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— শহরে

দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য স্ব-নিযুক্তি কর্মসূচি (Self-Employment Programme for the Urban Poor বা SEPUP) এবং শহুরে শিক্ষিত যুবকদের স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প (Self Employment Progamme for the Educated Urban Youth বা SEEUY)।

6. অন্যান্য কর্মসূচি : গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আরো নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প (1969-70 সাল), মহৎ চাষি উন্নয়ন সংস্থা, 1977-78 সালে চালু হওয়া মরুভূমি উন্নয়ন প্রকল্প (Desert Devlopement Programme বা DPP), 1985-86 সালে চালু হওয়া ইন্দিরা আবাস যোজনা (Indira Awaas Yojana বা IAY), প্রভৃতি। পরে অবশ্য IRDP, RLEGP এবং IAY-কে 1989 সালে 1 এপ্রিল জওহর রোজগার যোজনার (Jawahar Rozgar Yojana বা JRY) সাথে যুক্ত করা হয় ফলে JRY -য় গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পায় দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে।

মূল্যায়ন : এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতের দারিদ্র্য বিশেষ কমেনি। আসলে ভারতীয় অর্থনীতিতে রয়েছে ব্যাপক বেকারত্ব। বেকারি এবং দারিদ্র্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়লে সে দারিদ্র্যে পতিত হয়। আর দারিদ্র্য দূর করতে গেলে বেকারি ছাড়াও আর একটি বিষয় দূর করতে হবে। সেটি হল মুদ্রাস্পীতি। দামস্তর বাড়লে লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমে। আরো বেশি সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যায়। তাই দারিদ্র্য দূর করতে হলে বেকারির পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতিও দূর করতে হবে। ভারতের দারিদ্র্য দূর করার জন্য আমরা কয়েকটি ববস্থার সুপারিশ করতে পারি। সংক্ষেপে সেগুলি হল : (i) ভূমি সংস্কার কর্মসূচির রূপায়ণ এবং উদ্‌বৃত্ত জমি ক্ষুত্র ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে বিতরণ, (ii) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের দ্বারা খরা অঞ্চলে জল সরবরাহ, (iii) নিম্ন আয়ের লোকেদের ঋণ সবরাহ করে স্ব-নিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা, (iv) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো, (v) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি। এছাড়া, দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য কোনো প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে সেই প্রকল্পগুলি যথাসময়ে রূপায়িত হবে এবং সেগুলির দ্বারা দরিদ্র মানুষেরা উপকৃত হবে।

6.8 ভারতে বেকার সমস্যা (Unemployment Problem in India)

তত্ত্বগতভাবে প্রচলিত মজুরির হারে যারা কাজ করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, কিন্তু কোনো কাজ পাচ্ছে না, তাদের বেকার বলা হয়। অর্থনীতিবিদ কেইনস এদের অনিচ্ছাকৃত বেকার বলেছেন। বাস্তবে অবশ্য বেকারত্ব পরিমাপ করতে বছরের মধ্যে কতদিন কোনো শ্রমিক কাজ পাচ্ছে বা পাচ্ছে না, তা বিচার করা হয়। উদারহরণস্বরূপ, প কোনো সমীক্ষায় বেকারের সংখ্যা গণনা করতে ধরা যেতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি বছরে অন্তত অর্ধেক দিন (183 দিন বা তার বেশি) কাজ পেলে তাকে নিযুক্ত (emplloyed) বলে বা বেকার নয় বলে ধরা হবে। অন্যদিকে, কোনো ব্যক্তি বছরের অর্ধেক দিন কাজ না পেলে তাকে বেকার (Unemployed) বলে গণ্য করা হবে। আবার, বেকারত্বের অন্য সংজ্ঞাও গৃহীত হতে পারে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বেকার দেখা যায়। তবে ভারতসহ কিছু উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বেকার সমস্যা বর্তমনে ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বেকার সমস্যা কোনো অর্থনীতির পক্ষে একটি সমস্যা, কেননা বেকারত্বের ফলে মানব শক্তির অপচয় ঘটে, দেশের মানব

সম্পদের সবটা ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া, বেকার সমস্যা এবং দরিদ্র্যের সমস্যা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কোনো ব্যক্তি বতোর বা কর্মহীন হয়ে পড়লে একসময় দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাই কোনো দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হলে সর্বাগ্রে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে, দেশের সক্ষম সকল ব্যক্তিকে কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এখানেই বেকার সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। ভারতের বেকার সমস্যার প্রকৃতি উন্নত ঋণতান্ত্রিক দেশের বেকার সমস্যার প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বেকারত্ব হল বাণিজ্যচক্রের ওঠানামার ফল। যখন বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দেশে মন্দবস্থা দেখা দেয়, তখন জিনিসপত্রের মোট চাহিদা কমে যায়। ফলে দেশে উৎপাদন কমে, কর্মসংস্থান কমে এবং দেশে বেকারত্বের উদ্ভব হয়। বাণিজ্যচক্রের এই নিম্নগতি একসময় শেষ হয়ে গেলে ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়। তখন মন্দা কেটে যায় এবং দেশে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ে। দেশটিতে বেকারি দূর হয়। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে বেকারত্ব কোনো বাণিজ্যচক্রজনিত সমস্যা নয়। এখানে বেকারত্ব একটি কাঠামোগত সমস্যা। এর অর্থ হল, দেশের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে বেকারত্বের সমস্যাটি জড়িত। এখানে বেকারত্বের মূল কারণ হল মূলধন এবং কিছু উৎপাদনশীল উপকরণের অভাব। ভারতের বেকার সমস্যা কোনো বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দার সময় কার্যকরী চাহিদার অভাবের ফলে সৃষ্ট নয়।

6.9 ভারতে বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Unemployment in India)

কোনো দেশে যে বেকারত্ব দেখা যোয় তা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বেকারত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী একে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল : প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, মরশুমি বেকারত্ব, প্রযুক্তিগত বেকারত্ব এবং বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব। আমরা এই বেকারত্বগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। ভারতীয় অর্থনীতিতেও এই সকল বেকারত্ব কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়।

1. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (Disguised Unemployment) : প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলতে সেই উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকদের বোঝায় যাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তুলে নিলেও মোট উৎপাদন কমে না, তাদের প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলে। জনবহুল দেশের কৃষিক্ষেত্রে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার দেখা যায়। এরূপ বেকারত্বের প্রধান কারণ হল জনসংখ্যার চাপ এবং বিকল্প নিয়োগের সুযোগের অভাব। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব এরূপ বেকারত্ব দেখা যায়। ভারতের কৃষিক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়। ভারত একটি জনবহুল দেশ এবং এর শিল্পক্ষেত্র তত উন্নত নয়। ফলে কৃষির উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যাকে শিল্প নিয়োগ দিতে পারেনি। ফলে সেই বাড়তি জনসংখ্যা কৃষিক্ষেত্রেই রয়ে গেছে এবং তাদের একটা বড় অংশই প্রচ্ছন্ন বেকার।

2. মরশুমি বেকারত্ব (Seasonal Unemployment) : মরশুমি বেকারত্ব বলতে সেই সমস্ত শ্রমিকদের বোঝায় যারা বিশেষ মরশুম বা ঋতুতে শুধু কাজ পায় এবং বাকি সময় বেকার থাকে। প্রধানত কৃষি ক্ষেত্রেই এই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। কৃষিকাজ হল ঋতুভিত্তিক বা মরশুমভিত্তিকক। সারাবছরই সাধাররত কৃষিকাজ হয় না। তা ছাড়া, জলসেচের অভাবের দরুন কৃষিকাজে বৈচিত্র্য (diversification) থাকে না। ফলে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের বছরের বেশ কয়েক মাস বসে থাকতে হয়। একেই মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব বলে।

ভারতের কৃষিতও এই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। অবশ্য শুধুমাত্র কৃষিকার্যেই মরশুমি বেকারত্ব দেখা যায়, তা নয়, শিল্পক্ষেত্রেও মরশুমি বেকারত্ব দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, কাঁচ আখ সারা বছর পাওয়া যায় না। তাই যখন আঘের ফসল পাওয়া যায়, তখনই চিনি ফলগুলি চালু থাকে। বছরের অন্যসময় চিনি ফলের কাজকর্ম অনেক কমে যায়। ফলে তখন চিনি ফলগুলির অনেক শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যায়। এই ধরনের বেকারত্ব আসলে মরশুমি বেকারত্ব। তেমনি, গরমের সময় আইনক্রিমের ফলগুলি চালু থাকে এবং অন্যসময় বন্ধ থাকে। তখন ঐ ফলগুলির শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে। এটিও মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব। তেমনি, পাটকল, সরযে পেশাই কল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এরূপ বেকারত্বের উদ্ভব হতে পারে। আবার, বছরের বিশেষ সময়ে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা বাড়ে। তখন ছাপাই শিল্পে নিযুক্ত লোকের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু বছরের অন্য সময় তাদের একাশের কোনো কাজ থাকে না। সুতরাং, কৃষিকার্য ছাড়াও শিল্পক্ষেত্র এবং অন্যান্য জীবিকা ও পেশাতেও মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব দেখা যায়। তবে কৃষিকার্য বিশেষভাবে মরশুম ভিত্তিক বা ঋতুভিত্তিক বলে মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব কৃষিক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে বেকারত্বের প্রধান কারণ হল জলসেচ এবং উপযুক্ত ধরনের বীজ ও কৃষিপদ্ধতির অভাবের দরুন কৃষির বৈচিত্র্যহীনতা (non-diversification of agriculture)। ভারতীয় কৃষিতে বৈচিত্র্য কম। তাই ভারতীয় কৃষিতে বিপুল সংখ্যক মরশুমি বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়।

3. প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব (Technological or Structural unemployment) : দেশের কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ঘটলে অথবা কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটলে কিছু শ্রমিক উদ্‌বৃত্ত হয়ে পড়তে পারে। শ্রমের এরূপ উদ্‌বৃত্ত অবস্থাকে প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব বলে। নতুন উৎপাদন কৌশলের (শ্রমসঞ্চয়ী) প্রবর্তন, নতুন দ্রব্য আবিষ্কার, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে এই ধরনের বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কৃষিতে ট্রাক্টর, হারভেস্টার, থ্রেসার প্রভৃতি শ্রমসঞ্চয়ী যন্ত্রের ব্যবহার ঘটলে অনেক শ্রমিক উদ্‌বৃত্ত হয়ে পড়তে পারে। তেমনি, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন নিবিড় (Capital intensive) উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে শ্রমিকের চাহিদা কমে যাবে। আবার, নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার ও প্রচলন হলে তার পরিবর্ত দ্রব্যের শিল্পে উৎপাদন এবং শ্রমিক নিয়োগ কমে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ প্লাস্টিক এবং নাইলন প্রবর্তনের ফলে অনেক পাটকলই রুগ্‌ণ হয়ে পড়ছে এবং সেখানের শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। কমপিউটার এবং জেরক্স মেশিন আবিষ্কারের পর পুরোনো টাইপিস্টদের কাজ হারাতে হয়েছে। এগুলি সবই প্রযুক্তিগত বেকারত্বের উদাহরণ। আবার, ভারতে যতই বৃহৎ আয়তনের কলকারখানা গড়ে উঠছে ততই অনেক মাঝারি ও ক্ষুত্রায়তনের কারখানা প্রতিযোগিতায় পিছু হঠছে। তাদের একটা বড় অংশ রুগ্‌ণ শিল্পে পরিণত হচ্ছে এবং একসময় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। এদেরই বলা হয় কাঠামোগত বেকার। এক্ষেত্রে বেকারত্ব দেশে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফল। শিল্প কাঠামোয় মূলধন প্রধান বড় শিল্পের আপেক্ষিক প্রাধান্য বাড়ছে এবং ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমছে। আবার, কৃষি ও শল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ার ফলে বেকারি বা কর্মহীনতা বাড়ছে। একেও আমরা প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব বলতে পরি। ভারতেও যেহেতু কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের নানারকম পরিবর্তনের ফলে অনেক শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। সুতরাং, ভারতেও প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

4. বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব (Cyclical Unemployment) : কোনো দেশের অর্থনীতিতে আয়, কর্মসংস্থার, দামস্তর প্রভৃতি প্রধান অর্থনৈতিক চলরাশির কালগত ওঠানামা ঘটে। একে বাণিজ্যচক্র (trade cycle বা business cycle) বলে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এই ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের এরূপ

ওঠানাম বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্যচক্রের প্রধানত দুটি অংশ : ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি। বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির অবস্থাকে মন্দাবস্থা এবং ঊর্ধ্বগতির অবস্থাকে সমৃদ্ধির অবস্থা বলা হয়। এখন, বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি বা মন্দাবস্থার সময় জিনিসপত্রের চাহিদা কমে। ফলে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান করে। দেশে বেকরত্ব দেখা দেয়। এই ধরনের বেকারত্বকে বাণিজ্যচক্রজনিত ও বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ দেশে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্তরে বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামার ফলে, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির সময়ে বা মন্দাবস্থার সময়ে যে বেকারত্বের উদ্ভব ঘটে তাকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলে। সাধারণত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরনর বেকারত্ব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। 1930 সালের মহামন্দার সময় আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা গিয়েছিল। সেটি ছিল বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব। 1930 সালের পরেও বিশ্বের নানা ধনতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন সময়ে এধরনের বেকারত্ব দেখা গিয়েছে। ভারত যেহেতু উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি নয়, তাই ভারতে এধরনের বেকারত্বের হার কিছুটা কম। তবে 1960-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে 1980 সাল পর্যন্ত ভারতে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল এবং যার প্রভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কমে যায়, তার পিছনে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাকে অনেকে দায়ী করেছেন। তাছাড়া, 1991 সালের পর ভারতে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতির ওঠানামার দ্বারা অনেকখানিই প্রভাবিত। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা এখন ভারতীয় অর্থনীতিকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। তাছাড়া, সংস্কার-পরবর্তী যুগে ভারত যত না মিশ্র অর্থনীতি, তার চেয়ে অনেকখানি ধনতান্ত্রিক।

6.10 ভারতে বেকারত্বের কারণ (Causes of Unemployment in India)

ভারতে বেকার সমস্যার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। আমরা সেই কারণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি :

1. জনসংখ্যাবৃদ্ধি : 1951 সাল থেকে 2010 সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা উচ্চহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি (2020 সালের পর) অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছে। তবে 1950-2010 সময়কালে জনসংখ্যা যেরূপ বেড়েছে, কর্মসংস্থান সেই হারে বাড়েনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে কাজের সুযোগ বাড়েনি বলে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে।

2. প্রসারের মন্থর হার : ভারতীয় অর্থনীতির প্রসারের হার (rate of growth) সব মিলিয়ে মন্থর। পরিকল্পনার প্রথম বছরগুলিতে (1951-65) বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম, যাকে অধ্যাপক রাজ কৃষ্ণ 'উন্নয়নের হিন্দু হার' (Hindu rate of growth) বলে অভিহিত করেছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময়ে বৃদ্ধির হার এমন কিছু বেশি ছিল না। সপ্তম পরিকল্পনা থেকে ভারতের বৃদ্ধির হার কিছুটা বেড়েছে। তবে সব মিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির প্রসার হার মন্থরই বলা যেতে পারে। কৃষির অগ্রগতি ও রূপান্তরও খুব ধীর গতিতে ঘটেছে। শিল্পের অগ্রগতির হারও শ্রমিকের জোগান বৃদ্ধির হারের চেয়ে ছিল কম। সব মিলিয়ে তাই বেকারত্ব বেড়েছে।

3. ভুল উৎপাদন কৌশল নির্বাচন : ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশের পক্ষে সঠিক উৎপাদন কৌশল হল শ্রম প্রধান বা শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল। কিন্তু ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রায়শই মূলধন নিবিড় বা শ্রম সঞ্চয়ী

উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো পরিকল্পনায় শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণের কথা বলা হয় বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে প্রধানত মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশলই ব্যবহার করা হয়। এর ফলে মোট শিল্পজাত উৎপাদন বেড়েছে বটে, কিন্তু শ্রমিক নিয়োগ বাড়েনি। ফলে বেকারত্ব বেড়েছে। ভুল বা অনুপযুক্ত উৎপাদন কৌশল নির্বাচন ভারতে বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

4. উপযুক্ত নিয়োগ নীতির অভাব : আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতাগণ আলাদাভাবে কোনো কর্মসংস্থান নীতির উপর গুরুত্ব দেননি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, উৎপাদন বাড়ানোর উপর জোর দিলে কর্মসংস্থান আপনা-আপনিই বাড়বে। কোনো পরিকল্পনাতেই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা অর্জনের কোনো লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়নি। পরিকল্পনায় সুপ্তভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, বিনিয়োগ বাড়লেই তার সাথে কর্মসংস্থানও বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। আসলে, বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে কিনা, তা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, বিশেষত উৎপাদন কৌশল শ্রম নিবিড় না মূলধন নিবিড়, তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

5. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের রুগ্‌ণ অবস্থা : আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। মাঝে মাঝে কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে যেগুলি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ফলে পরিকল্পনাকালে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষুদ্র শিল্পই বন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষুত্র শিল্পের প্রকৃত সংখ্যা নিবন্ধীকৃত (registered) সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। অথচ ক্ষুদ্র শিল্পগুলির নিয়োগ ক্ষমতা বৃহৎ শিল্পের তুলনায় অনেক বেশি। এগুলির উৎপাদন কৌশল খুবই শ্রম নিবিড়। কিন্তু এই শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় হারে বিকাশ ও বিস্তার ঘটেনি। ফলে কর্মসংস্থান বাড়েনি; বেকারত্ব বেড়েছে।

6. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা : ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। ফলে বহুসংখ্যক গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু স্ব-নিযুক্ত হবার ব্যক্তি তৈরি হয়নি। এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজে উপযুক্ত। বিশেষ কোনো বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত হবার উপযুক্ত শিক্ষা এরা পায়নি। ফলে ভারতে সাধারণ শ্রমিক উদ্‌বৃত্ত হলেও উপযুক্ত দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবের দারুণই ভারতে বহুসংখ্যক শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি হয়েছে।

7. শিল্পে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা : 1970-এর দশকের সময় থেকেস ভারতের অধিকাংশ শিল্পেই বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। এর পিছনে নানা কারণ রয়েছে। প্রধান কারণগুলি হল : অনিয়মিত বিদ্যুতের জোগান, কাঁচামালের অভাব, পরিবহণের অসুবিধা, শিল্প বিরোধ প্রভৃতি। এখন, এই উদ্‌বৃত্ত ক্ষমতা থাকার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে সেই চাহিদা পূরণ করতে শিল্পগুলি উদ্‌বৃত্ত উৎপাদ ক্ষমতা ব্যবহার করেই তা করতে পারছে। ফলে শ্রমিক নিয়োগ বিশেষ বাড়ছে না। তাই বেকারত্ব কমেনি।

8. অন্যান্য কারণ : ভারতের বেকারত্বের পিছনে আরো কয়েকটি কারণ আমরা উল্লেখ করতে পারি। সেগুলি হল : শ্রমিকদের মধ্যে চলনশীলতার অভাব, ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা, কোনো নতুন উদ্যোগ বা শিল্প একক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, চিরাচরিত ও বৈচিত্র্যহীন কৃষি, মূলধনের অভাব, উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে ব্যর্থতা প্রভৃতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের পিছনে নানা কারণ রয়েছে। সেই কারণগুলিকে আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করতে পারি। ভারতের বেকারত্বকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) কৃষি ও গ্রামীণ বেকারত্ব, (ii) শিল্প ও শহরাঞ্চলের বেকারত্ব এবং (iii) শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব। কৃষি ও গ্রামীণ বেকারত্বের দুটি প্রধনা রূপ বা ধরন হল প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও মরশুমি বেকারত্ব। প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের পিছনে প্রধান কারণ হল জনসংখ্যার চাপ এবং বিকল্প নিয়োগের অভাব। মরশুমি বেকারত্বের প্রধান কারণ হল কৃষিতে জলসেচের অভাব এবং কৃষির বৈচিত্র্যহীনতা। কৃষি ও গ্রামীণ বেকারত্বের অন্যান্য কারণগুলি হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবনতি, গ্রামীণ শ্রমিকের চলনশীলতার অভাব, রক্ষণশীল মনোভাব প্রভৃতি। শিল্প ও শহরাঞ্চলে বেকারত্বের পিছনে যে কারণগুলি কাজ করছে সেগুলি হল : শিল্পে অগ্রগতির মন্থরতা, শিল্পে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশলের ব্যবহার, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার না ঘটা প্রভৃতি। সবরকমের বেকারত্বের পিছেন একটি বড় কারণ হল পরিকল্পনার স্তরে কর্মসংস্থান ও নিয়োগের উপর জোর না দিয়ে মোট উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া এবং উৎপাদনের বণ্টনের দিকটি অবহেলা করা।

6.11 ভারতের বেকার সমস্যার সমাধানে কিছু সুপারিশ (Some Suggestions to Solve the Unemployment Problem of India)

ভারতের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করা যেতে পারে। ভারতের বেকারদের আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছি : গ্রামীণ ক্ষেত্রে বেকারত্ব, শিল্পাঞ্চলে বেকারত্ব এবং শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব। সেই অনুযায়ী আমরা তিন ধরনের বেকার দূর করার জন্য আলাদা আলাদাভাবে সুপারিশ করেছি।

1. গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করার জন্য সুপারিশসমূহ ঃ গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

(i) গ্রামাঞ্চলে পতিত জমি পুনরুদ্ধার, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি, পুকুর খনন ইত্যাদি কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে স্থানীয়ভাবে শুধু কর্মসংস্থানই সৃষ্টি হবে না, এতে গ্রামীণ সম্পদেরও সৃষ্টি। এতে গ্রামীণ আয়ও নানা ভাবে বাড়বে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মরশুমি বেকারত্ব কমানো যেতে পারে।

(ii) গ্রামাঞ্চলে সেচের প্রসার ঘটাতে হবে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। জলসেচের সুযোগ বাড়লে একই জমিতে একাধিক বার চাষ করা সম্ভব হবে। এটিও মরশুমি বেকারত্ব কমাতে সাহায্য করবে।

(iii) গ্রামাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক ক্ষুত্র ও কুটির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে প্রচ্ছন্ন ও মরশুমি বেকারত্ব উভয়ই কমবে।

(iv) ভূমিসংস্কার কর্মসূচিকে রূপায়িত করতে হবে। জোতের ঊর্ধ্বসীমা আইন প্রয়োগ করে সরকারকে ঊদ্‌বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং সেই জমি ভূমিহীন খেতমজুর ও প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

2. শিল্পাঞ্চলের বেকারত্ব দূর করার জন্য সুপারিশ ঃ শিল্পোঞ্চলের বেকারত্ব দূর করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে :

(i) শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। এর জন্য পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হবে।

(ii) ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের নিয়োগ ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই বড় শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।

(iii) যতদূর সম্ভব শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। যেখানে কোনো বিকল্প নেই, সেখানেই শুধু মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করতে হবে। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানির সময় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(iv) শিল্প শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে তারা এক শিল্পে কাজ হারালে সহজেই অন্য শিল্পে কাজ জোগান করতে পারবে।

(v) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু শিল্পের বিকাশ না ঘটায় সেসব অঞ্চলে ঐ সব অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত রয়ে গেছে। ঐসব অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে আঞ্চলিক স্তরে বেকারত্ব কমবে।

3. শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব দূর করতে সুপারিশ : শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব দূর করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

(i) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তাহলে শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করতে পারবে।

(ii) শিক্ষিত যুবকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা তৈরির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং দিতে হবে। তাদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে ক্ষুত্র শিল্প ইউনিট গড়তে সাহায্য করতে হবে।

(iii) বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদের প্রাথমিকভাবে নানা সুযোগসুবিধা দিতে হবে।

(iv) দ্রুতহারে শিল্পের বিকাশ ঘটলে তৃতীয় স্তরের কাজকর্ম বিস্তারলাভ করবে। বিশেষত শিল্প ও স্বাস্থক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে সুযোগ বাড়বে। তাই শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ঘটাতে গেলে দ্রুত হারে শিল্পায়ন প্রয়োজন।

6.12 ভারতে বেকার সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে ভগবতী কমিটির রিপোর্ট

1971 সালে ভারত সরকার বি. ভগবতীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এটি ভগবতী কমিটি নামে অধিক পরিচিত। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল ভারতে বেকার সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং সুপারিশ করা। এই কমিটি 1973 সালে তার রিপোর্ট পেশ করে। ভারতে বেকার সমস্যা দূর করার জন্য কমিটির প্রধান সুপারিশ গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) গ্রামাঞ্চলে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য জলসেচ, গ্রামীণ বৈদুতিকীকরণ, রাস্তা নির্মাণ এবং গ্রামীণ গৃহনির্মাণের জন্য বড় আকারের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(ii) শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমাতে হবে অর্থাৎ যথাসম্ভব মূলধন নিবিড় কৌশল পরিহার করে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

(iii) যেসব শিল্পে মূলধনের তুলনায় শ্রমিক বেশি লাগে সেই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে কর ছাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে। বড় শহরে কেন্দ্রীভূত না করে শিল্পগুলিকে গ্রামাঞ্চলে ছনিয়ে দিতে হবে।

(v) বড় শিল্পগুলির সহযোগী নানা ক্ষুত্র শিল্প যাতে গড়ে ওঠে তার দিকে নজর দিতে হবে।

(vi) শিল্পে একাধিক শিফ্‌টে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

(vii) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পৃথক সংস্থা গঠন করতে হবে। ঐ অঞ্চলগুলির উন্নতির জন্য প্রকল্প রচনা এবং তা রূপায়ণে সাহায্য করবে এই ধরনের সংস্থা।

(viii) দশম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পর উচ্চতর শ্রেণিগুলিতে চাকরিভিত্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ix) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের নিম্নতম বিবাহযোগ্য বয়স যথাক্রমে 21 বছর ও 18 বছর ধার্য করতে হবে।

(x) কর্মহানি বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(xi) কর্মসংস্থান ও মানবশক্তি সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি জাতীয় কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সামগ্রিকভাবে বিচার করবে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

ভগবতী কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন ডঃ অশোক মিত্র। তিনি ভগবতী কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল, বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান তহবিল তৈরি করা প্রয়োজন। এই তহবিল তৈরি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং শিল্প সংস্থার মালিকাদরে কাছ থেকে নেওয়া অর্থের দ্বারা। ডঃ মিত্র দাবি করেছিলেন যে, এই তহবিলটি দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হবে। তিনি আরো দাবি করেন যে, সমস্ত কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

6.13 ভারতে বেকারি দূর করতে গৃহীত কর্মসূচি (Measures to Remove Unemployment in India)

ভারতের বেকার সমস্যা 1970-এর দশক থেকেই বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে শুরু করে। এই বেকারি দূর করতে সরকার তাই ঐ দশক থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা প্রধান কয়েকটি কর্মসূচি এখানে উল্লেখ করছি।

1. গ্রামীণ কর্ম প্রকল্প (Rural Works Programme বা RWP) : এই প্রকল্পে এমন কাজকর্ম গ্রহণ করা হয় যেগুলি গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ীভাবে আয় সৃষ্টি করতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে মন্দার মরশুমে নিয়োগ প্রদান

করতে 1978 সালে এই প্রকল্প গৃহীত হয়।

2. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Develo-ment Agency বা SFDA) : ছোট ছাষিরা যাতে তাদের কাজকর্মে বৈচিত্র্য আনতে পারে তার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্য এই সংস্থা স্থাপন করা হয়। সারা ভারত ঋণ পুনঃপরীক্ষা কমিটির (1969) সুপারিশের ভিত্তিতে এই সংস্থা স্থাপিত হয়। গ্রামীণ এলাকায় মরশুমি বেকারত্ব কমানোই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।

3. প্রান্তিক চাষি ও ভূমিহীন কৃষক (Marginal Farmers and Agricultural Labourers বা MFAL) ঃ প্রান্তিক তাষি এবং ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম, যেমন ডেয়ারি, মুরগিপালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতির জন্য এই প্রকল্প থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। 1970-71 সালে এই প্রকল্প চালু হয়। SADA-এর মতোই সারা ভারত গ্রামীর ঋণ পুনঃ পরীক্ষা কমিটির (1969) সুপারিশ ক্রমে এই প্রকল্প চালু হয়।

4. সুসংহত শুষ্ক কৃষি ভূমি উন্নয়ন (Interated Dryland Agricultural Development) : চতুর্থ-পরিকল্পনার (1969-74) সময় কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকেল্পর অধীনে কৃষির উন্নতির জন্য কিছু স্থায়ী কাজকর্ম গ্রহণ করা হয়, যেমন, ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়, জলসেচের প্রসার প্রভৃতি। এধরনের কাজকর্ম খুবই শ্রম নিবিড়।

5. কৃষি-সেবা কেন্দ্র (Agro-Servioce Centre) : সবুজ বিপ্লবের পর কৃষ্টিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে। তাই কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত করার জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত করার জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কৃষি সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এই ধরনের কেন্দ্র গড়তে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েচে।

6. অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (Area Development Scheme) : পার্লামেন্টের সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 1993 সালের ডিসেম্বর মাসে এই কর্মসূচি গৃহীত। এই প্রকেল্পর মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু অঞ্চলে রাস্তাঘাট, বাজার কমপ্লেক্স ইত্যাদি পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

7. জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ প্রকল্প (National Rural Employment Programme বা NREP) : কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work) কর্মসূচির বদলে 1980 সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্প চালু হয়। গ্রামীণ জনসাধারণের একটা অংশ শুধুমাত্র মজুরির উপর নির্ভর করে। কৃষিতে মরশুমি বেকারত্বের সময় এরা খুবই দুর্দশায় পতিত হয়। মূলত এদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যই এই প্রকল্প গৃহীত হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে যৌথ পরিসম্পদ তৈরি করে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নত করা ছিল এর মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের অধীনে মুখ্য কাজগুলি হল জলসেচের জন্য কূপ খনন, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য নলকূপ নির্মাণ প্রভৃতি। 1989 সালে 1 এপ্রিল এই NREP কর্মসূচিকে জওহর রোজগার যোজনার (JRY) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

8. গ্রামীণ ভূমিহীনদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Rural handless Employment Guarnatee Programme বা RLEGP) : 1983 সালের 15 আগস্ট NREP প্রকল্পের পরিপূরক হিসাবে এই প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদ সৃষ্টি করে খেতমজুরদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। এর আর একটি প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামীণ জীবনযাত্রা মাসের সার্বিক উন্নতি ঘটানো। এই প্রকল্পেকেও 1989 সালের 1 এপ্রিল জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, RLEGP কর্মসূচি আর বিস্তৃত হয়ে 2006 সালে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচিতে (MGNREGS) পরিণত হয়েছে।

9. সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme বা IRDP) : গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরি এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। 1978 সালে ভারত সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং 1980 সালে তা রূপায়িত করে। ঐ সময়ে গ্রামীর অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চালু প্রকল্পগুলিকে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় একত্রিত করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme বা IRDP)। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, গ্রামের দরিদ্রদের উৎপাদনের উপকরণ জোগান দিয়ে তাদের স্ব-নিযুক্তিতে সাহায্য করা।

10. গ্রামীণ যুবকদের স্ব-নিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রকল্প (Training for Rural Youth for Self-emplayment বা TRYSEM) : 1979 সালের 15 আগস্ট এই প্রকল্প গৃহীত হয়। প্রকল্পটির নাম থেকেই এর উদ্দেশ্যে বোঝা যায়। গ্রামীণ যুবকেরা যাতে স্ব-নিযুক্ত হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

11. জওহর রেজাগার যোজনা (Jawahar Razgar Yojana বা JRY) : এই যোজনা চালু করা হয় 1989 সালের 1 এপ্রিল। ঐ সময়ে চালু থাকা NREP এবং RLEGP প্রকল্প দুটিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এই যোজনার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা উভয়ই বানেঃ এই যোজনার প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য লাভজনক নিয়োগের সুযোগ তৈরি করা। এর অপর প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো নির্মাণ করা এবং যৌথ সম্পদ সৃষ্টির দ্বারা গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটানো। এই যোজান থেকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি ও উপজাতি জনসমষ্টির ব্যক্তিদের অগ্রধিকার দেওয়া হয়।

12. মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme বা MGNREGS) : গ্রামীণ ক্ষেত্রে চালু থাকা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে এটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 2005 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাশ হয় জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা আইন (National Rural Employment Guarantee Act বা NREGA)। তারই ভিত্তিতে 2006 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে MGNREGS চালু হয়। গ্রামীণ পরিবারের অন্তত একজন সক্ষম ব্যক্তিকে বছরে অন্তত 100 দিন কাজ দেওয়া এই কর্মসূচির লক্ষ্য। গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটিই অন্যতম প্রধান কর্মসূচি।

13. অন্যান্য ব্যবস্থা (Other measures) : গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং তার দ্বারা জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। যেমন, 1977 সালে গৃহীত হয়েছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (Food for Work বা FFW), 1969-70 সালে প্রবর্তিত হয় ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি। আবার, 1973-74 সালে চালু হয় খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প (Drought Prone Area Programme বা DPAP), 1977-78 সালে হয় মরভূমি উন্নয়ন প্রকল্প (Desert Development Programme বা DDP) প্রভৃতি। এছাড়া, 1985-86 সালে চালু হয় মরুভূমি উন্নয়ন প্রকল্প (Desert Development Programme বা DDP প্রভৃতি। এছাড়া, 1985-86 সালে চালু হয় ইন্দিরা আবাস যোজনা (Indira Awaas Yojana বা IAY)। পরে অবশ্য এটিকেও NREP এবং RLEGP-র ন্যায় 1989 সালের 1 এপ্রিল জওহর রোজগার যোজনার (JRY) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্য আরো কয়েকটি কর্মসূচি গৃহীত হয়। সেগুলি হল : শহরের দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য স্বা-নিযুক্তি কর্মসূচি (Self-Employment Programme for the Urban Poor বা SEPUS) শহুরে শিক্ষিত যুবকদের স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প (Self-Employment for the Educated Urban Youth বা SEEUY) প্রভৃতি। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 1993-

94 সালে দুটি বিশেষ প্রকল্প ঘোষিত হয়। সেগুলি হল : নিয়োগ আশ্বাস প্রকল্প (Employment Assorance Scheme বা EAS) এবং শিক্ষিত বেকার যুবকযুবতীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (Pradhan Mantri Rozgar Yojana বা PMRY)।

মূল্যায়ন : এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতে বেকার সমস্যার ব্যাপকতা কমেনি, বরং তা বেড়েই চলেছে। ভারতে বর্তমানে জনসংখ্যা 140 কোটির বেশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1 শতাংশ ধরলে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে 1.40 কোটি। প্রতি বছর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ নতুন শ্রমিক হিসাবে প্রতি বছর শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। তাদের সকলকে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বেকারি ও দারিদ্র্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বেকারি বাড়লে দারিদ্র্য বাড়বে। সুতরাং ভারতে দারিদ্র্যের সমস্যাও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। তাই দারিদ্র্য ও বেকারি কমাতে গেলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। বেকারদের কিছু আর্থিক সাহায্য না দিয়ে সেই তহবিল দিয়ে স্থায়ী পরিসম্পদ নির্মাণ করতে হবে। তবেই সেখানে আয় ও কর্মনিয়োগ সৃষ্টি হবে। শুধু কিছু আর্থিক সাহায্য দিলে তা সাময়িক অভাব দূর করবে মাত্র। এতে কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না। এছাড়া, বর্তমানে সরকার উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে। অনেক বহুজাতিক সংস্থা এখন বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করছে। এদের উৎপাদন কৌশল মূলধন নিবিড়। এদের আগমনের ফলে ভারতে নিয়োগ বিশেষ বাড়বে না। তাছাড়া, বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। এই দেশীয় শিল্পগুলিকে ধীরে, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাস করবে। এর ফলেও ভারতে আগামী দিনে কর্মসংস্থান বিশেষ বাড়বে না বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে ভারতে বেকারসমস্যা ও দরিদ্র্যের সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যাবে বলে আশঙ্কা হয়।

6.14 কর্মনিয়োগ বাড়াতে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি ও তাদের মূল্যায়ন (Some Special Programmes to Raise Employment and their Evaluation)

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার যে সমস্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করেছে তা আমরা আগের বিগাগে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আমরা মূলত 1970 সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যবস্থাগুলির কথা উল্লেখ করেছি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির এই সমস্ত কর্মসূচিরগুলির মধ্যে চারটি প্রকল্প বা কর্মসূচি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেই কর্মসূচি বা প্রকল্প হল—

(i) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme বা IRDP),

(ii) জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচি বা প্রকল্প (National Rural Emplyment Programme বা NREP),

(iii) গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প (Rural Landless Emplyment Guarantee Programme বা RLEGP), এবং

(iv) মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কার্যসূচি (Mahatma Gandhi National Rural Emplayment Guarnatee Scheme)।

গ্রামীণ ভারতে নিয়োগ বৃদ্ধিতে বা বেকারি কমাতে এই চারটি প্রকল্প বা কর্মসূচির কীরূপ, তা এখন আমরা আলোচনা করব।

6.14.1 সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme বা IRDP)

পঞ্চম পরিকল্পনার সময় (1974-78) প্রথম ভারতের সরাসরি দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর আঘাত হানার কথা বলা হয়। স্বভাবতই, দারিদ্র্য দূর করতে হলে বেকারি দূর করার বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দিতে হবে। তাই ভারত সরকার পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে না না নিয়োগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বা প্রকল্প হল সসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme বা IRDP)। এই প্রকল্প শুরু করা হয় 1978-79 সালে এবং 1980-81 সালের মধ্যে তা সারাদেশে প্রসারিত করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার (1980-85) সময় ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য 'গরিবি হঠাও' (Remove poverty) স্লোগান তোলা হয়। আর IRDP ছিল এই দারিদ্র্য হঠানোর কর্মসূচিরই অঙ্গ। গ্রামীণ অর্থনীতিতে দারিদ্র্য দূর করতে হলে পরিসম্পদ সৃষ্টি করতে হবে কেননা পরিসম্পদ থেকেই আয় সৃষ্টি হয়। তাই IRDP-র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিসম্পদ সৃষ্টি করা। এর অর্থ হল, গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৎস্য চাষ, পশুপালন এবং কৃষিভিত্তিক নানা কাজকর্মের জন্য গ্রামের দরিদ্রদের স্ব-নিযুক্ত হতে সাহায্য করা। কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন প্রভৃতি হল প্রাথমিক ক্ষেত্রের কাজকর্ম। সুতরাং, IRDP প্রাথমিক কাজকর্মের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি, মাধ্যামিক ক্ষেত্রের কাজকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য তাঁত বোনা, হস্তশিল্প প্রভৃতি কাজে নিয়োগ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া সেবাক্ষেত্রের কাজকর্ম প্রসারের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন, ব্যবসায়িক কাজকর্মের বৃদ্ধি এবং এরূপ কাজে স্ব-নিযুক্তির জন্য বিভিন্ন সাহায্য দানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

IRDP-র প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্র ছিল দেশের সমস্ত ব্লকে মোট 1.5 কোটি পরিবারকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা। আশা করা হয়েছিল যে, প্রতি ব্লকে গড়ে 3,000 পরিবার এই প্রকল্প থেকে সাহায্য পাবে। এই পরিবারগুলিকে বিভিন্ন পরিসম্পদ দিয়ে সাহায্য করা হয়। এই পরিসম্পদগুলি সরকারি ভরতুকি ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের যৌথ ব্যবস্থায় কেনান হয়। এই ভরতুকি ও ঋণের গড় অনুপাত ছিল 1 : 2 অর্থাৎ 33:67। অবশ্য IRDP ব্যবস্থার ফলে মোট কত কর্মসংস্থা সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

IRDP কার্যসূচির প্রধান কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমত, অনেক সময় সঠিক যোগ্য পরিবারকে সাহায্যের জন্য নির্বাচন করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। ফলে প্রাপ্ত সাহায্যের সদ্ব্যবহার হয়নি।

তৃতীয়ত, প্রকল্পটি উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্থায়ী পরিসম্পদ সৃষ্টি করা যাতে সেই পরিসম্পদ থেকে আয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 22 শতাংশ ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা পরিসম্পদ থেকে কোনো আয় সৃষ্টি হয়নি।

চতুর্থত, প্রাপ্ত সাহায্যের যথাযথ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোগত সুবিধার প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময়ই সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধা যথেষ্ট ছিল না।

এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতে দারিদ্র্য সূরীকরণে এই কর্মসূচি বিশেষ সাহায্য করতে পারেনি। উন্নয়নের সুফল নীচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে (Percolation effect বা trickle down effect অর্থাৎ চুঁইয়ে পড়া প্রভাব) IRDP ততটা সফল হয়নি। তাছাড়া, সাহায্য বিতরণের ক্ষেত্রে নানা রকমের দুর্নীতি ঘটেছে। সাহায্যের একটা অংশ কমিশন হিসাবে দিতে অঙ্গীকার করলে তবেই সাহায্য মিলত। এ সমস্ত কারণে অধ্যাপক নীলকন্ট রথ একটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে, গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করতে পরিসম্পদ সৃষ্টির পরিবর্তে গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তিকে মজুরিভিত্তিক নিয়োগ (wage employment) দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে মধ্যস্বত্বভোগী ও আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি বন্ধ হবে।

6.14.2 জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচি বা প্রকল্প (National Rural Employment Programme বা NREP)

ভারতের দারিদ্র্য দূর করতে 1977 সালের April মাসে চালু হয়েছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য) (Food for Work বা FFW) প্রকল্প। 1980 সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পকে পূনর্গঠিত করা হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ প্রল্প (National Rural Empllyment Programme বা NREP)। ষষ্ঠ পরিকল্পনার (1980-85) অংশ হিসাবে এই কর্মসূচি চালু করা হয় এবং সপ্তম পরিকল্পনাতেও (1985-90) এই প্রকল্প জারি রাখা হয়। 1989 সালের 1 এপ্রিল এই NREP-কে জওহর রোজগার যোজনার (Jawahar Rozgar Yojana বা JRY) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে জনসাধারণের একটা অংশ কেবলমাত্র মজুরির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য এরা কৃষিক্ষেত্রে মরশুমি বেকারির সময় বা মন্দার ঋতুতে খুবই দুর্দশায় পতিত হয়। এই সমস্ত কৃষিশ্রমিকদের সাহায্য করাই ছিল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষেত্রে যৌথ পরিসম্পদ সৃষ্টি করা এবং এর দ্বারা গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো। যে সমস্ত কাজকর্ম এই প্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয় সেগুলি হল জলসেচের জন্য কূপ খনন, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের কূপ খনন, গ্রামীণ পুকুর খনন ও পুরোনো পুকুরের সংস্কার, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নির্মাণ স্কুল ভবন নির্মাণ, পঞ্চায়েত অফিস নির্মাণ প্রভৃতি। NREP রূপায়িত হয় কেন্দ্রীয় সরকার পোষিত কর্মসূচি হিসাবে। কিন্তু এর আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আধাআধি (1 : 1 বা 50 : 50 অনুপাতে) ভাগ করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় সার্বিক উন্নতির দিকে গুরুত্ব দিয়েছিল NREP কর্মসূচি। তবে এই কর্মসূচিরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। আমরা সংক্ষেপে সেই সীমাবদ্ধতাগুলিতে উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, NREP-র পাশাপাশি আরও একটি কর্মসূচি ছিল IRDP বা সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি। এই NREP এবং IRDP ছিল চরিত্রগতভাবে একই ধরনের কর্মসূচি। এরা যেন একে অপরের পরিপূরক। তাই IRDP সাহায্যের জন্য নির্বাচিত পরিবারগুলির প্রয়োজন বা চাহিদাকে NREP-র কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাস্তবে এইধ দুই প্রকল্পের কাজকর্মকে সমন্বিত বা সংযুক্ত করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, NREP-র উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় উপকরণ ও স্থানীয় জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ পরিসম্পদ সৃষ্টি করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়ই NREP তার কার্যক্রম রূপায়ণের জন্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করেনি।

তৃতীয়ত, বলা হয়েছিল যে, NREP রূপায়ণের সময় শ্রমিকদের মজুরি মেটাতে খাদ্যশস্যের ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। NREP রূপায়ণের সময় খাদ্যশস্যের কম ব্যবহারের

প্রবণতা দেখা যায়।

চতুর্থত, NREP কর্মসূচিতে যে পরিমাণ টাকার জোগান দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুপাতে নিয়োগ সৃষ্টি হয়নি। অথচ এই জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূসচির মূল উদ্দেশ্যই হল গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

পঞ্চমত, বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, NREP গ্রামীণ শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় ব্যাপী নিয়োগ প্রদান করতে পারেনি। NREP কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগের সময়কাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ফলে এই কর্মসূচি গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর কোনো গভীর প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে।

ষষ্ঠত, NREP প্রকল্পে যে মজুরি দেওয়া হয়েছে তা বাজারে প্রচলিত মজুরির চেয়ে কম। এতে গ্রামীণ শ্রমিকেরা কিছুটা বঞ্চিতই হয়েছে বল যায়।

সপ্তমত, NREP-র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম' পরিবারগুলিকে সাহায্য করা। কিন্তু অনেক সময়ই এই ধরনের পরিবার NREP-র বাইরে থেকে গেছে। অনেকে তাই অভিযোগ করেছেন যে, NREP প্রকল্পে সুবিধা গ্রহীতাদের (beneficiaries) নির্বাচন অনেক সময়ই সঠিক হয়নি।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা আমরা বলতে পারি যে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে বেকারত্ব কমাতে NREP ছিল সঠিক দিকে পদক্ষেপ। একে আরো শক্তিশালী করার জন্য গ্রামীণ ভূমিহীন নিয়োগ নিশ্চিতকরণ কর্মসূচির (RLEGP বা Rural Landless Emplayment Guarantee Programme) সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিয়োগ আশ্বাস কর্মসূচি (EAS বা Emplayment Assurance Scheme)। এই সমস্ত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যে বা ভাবধারাগুলি পূর্ণতা পায় যে কর্মসূচিতে, সেটি হল MGNREGS, যার পুরো নাম হল Mahatma Gandhi National Rural Emplayment Guarantee Scheme বা মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প। 2006 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই MGNREGS চালু হয় যা গ্রামীণ ভারতে বোকরদের কর্মসংস্থানে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আমরা এই এককের ৫.১১.৪ নং বিভাগে এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছি।

6.14.3 গ্রামীণ ভূমিহীনদের রাজ্য নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প (Rural Landless Employment Guarantee Programme বা RLEGP)

1983 সালের 15 আগস্ট গ্রামীণ ভূমিহীন নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প চালু করা হয়। প্রকল্পটির নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ ভূমিহীনদের মধ্যে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ প্রকল্পের (NREP) পরিপূরক হিসাবে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয় 1983 সালের এপ্রিল মাসে। অবশেষে ঐ বছরের স্বাধীনতা দিবসে (15 আগস্ট প্রকল্পটি চালু করা হয়। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদ সৃষ্টি করা এবং তার মাধ্যমে ভূমিহীন খেতমজুরদের নিয়োগ নিশ্চিত করাই ছিল এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হল ভারতের গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানে সার্বিক উন্নতি ঘটানো। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ভূমিহীন খেতমজুর পরিবারের অন্তত একজনকে বছরে 100 দিন নিয়োগ সুনিশ্চিত করা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানোর কার্যসূচি এই প্রকল্পে গ্রহণ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এই পরিকাঠামোর উন্নতির মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের নিয়োগ দান করাই ছিল এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পের রূপায়ণের ভার রাজ্য সরকারগুলির উপর অর্পণ

করা হয়। তবে রাজ্যগুলি রূপায়ণ করলেও এই প্রকেল্পর আর্থিক দায়ভার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করত।

প্রকল্পটির অগ্রগতি ঃ সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম চার বছর (1985-89) প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ঐ তথ্য থেকে জানা যচ্ছে যে, 1989 সাল পর্যন্ত মোট 2,412 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এর ফলে ঐ সময়ে মোট 1,154 মিলিয়ন শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে। প্রকল্পটির আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল সামাজিক বনসৃজন। সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে 5.2 লক্ষ হেক্টর জমিকে RLEGP কর্মসূচিতে সামাজিক বনসৃজন কার্যক্রমের অধীনে আনা হয়। RLEGP-র আর একটি সাফল্য ও উল্লেখের দাবি রাখে। 1983 সালের আগস্ট মাস থেকে 1988 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট 425.5 কোটি টাকা ব্যয়ে মোট 4.27 লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হয়। প্রতি বাড়ির গড় ব্যয় ছিল 10,000 টাকার কাছাকাছি। তবে RLEGP-র কয়েকটি সীমাবদ্ধতাও ছিল। **প্রথমত,** যত গরিব মানুষের এই প্রকল্পে কাজের প্রয়োজন ছিল, তত মানুষের কাছে এটি পৌঁছাতে পারেনি। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় এই প্রকল্পের আয়তন বা ব্যপ্তি ছিল কম। এটিই হল RLEGP-র প্রধান সীমাবদ্ধতা। তা ছাড়া RLEGP-র কাজের আর একটি সমালোচনা হল যে, শ্রমিকেরা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক সময়ে মজুরি পায়নি।

গ্রামীণ অর্থীতিতে উন্নয়নের এই ধরনের কর্মসূচির যথার্থ রূপায়ণের জন্য সরকারকে দক্ষ হতে হবে এবং কঠোর অথচ সংবেদনশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রকল্প রূপায়ণের দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি দূর করতে হবে। সরকারকে সেজন্য অনেক বেশি সজাগ ও তৎপর হতে হবে। সাহায্যের অর্থ যাতে সুবিধা প্রাপকেরই হাতে যায় এবং তা যেন যথাসম্ভব দ্রত পৌঁছায়, সে ব্যাপারে সরকারকে উপযুক্ত পদ্ধতি (Mechanism) উদ্ভাবন ও তা রূপায়ণ করতে হবে। তবেই মঞ্জুরীকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার হবে এবং সুবিধা গ্রহীতারা বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য রেখার সীমা অতিক্রম করতে সমর্থ হবে। আর কোনো কৃষিশ্রমিককে বা তার পরিবারকে কিছু আর্থিক সুবিধা না দিয়ে সেই টাকায় স্থায়ী যৌথ সম্পদ সৃষ্টির উপর জোর দিতে হবে। তবেই সেই সম্পদ থেকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আয় সৃষ্টি হবে এবং তা গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করতে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করবে। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরে কিছু আর্থিক সাহায্য দিলে সুবিধাগ্রহীতার তাৎক্ষণিক কিছু অভাবের সুরাহা হবে; কিন্তু তা স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য দূর করতে পারবে না। প্রদত্ত অর্থ শেষ হয়ে গেলেই অর্থাৎ খরচ হয়ে গেলেই ঐ শ্রমিক বা তার পরিবার পুনরায় দরিদ্র হয়ে পড়বে।

আমরা আগেই বলেছি যে, NREP, RLEGP এবং EAS (নিয়োগ আশ্বাস কর্মসূচি বা Employment Assurance Scheme) কর্মসূচির লক্ষ্য এবং রূপায়ণের ধরন একই রকমের। ফলে সরকার এই ধরনের প্রকল্পগুলিকে একটি বড় প্রকল্পের ছাতার তলায় আনার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করে। তবে নানা ছোটোখাটো সমস্যার জন্য এই একই ধরনের প্রকল্পগুলিকে মিশিয়ে দেওয়ার কাজটি অনেকদিন ধরেই অসম্পূর্ণ ছিল। অবশেষে 2005 সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের চিন্তা বাস্তব রূপ পায়। ঐবছর 23 আগস্ট ভারতের পার্লামেন্টে পাশ করে National Rural Employment Guarantee Act বা NREGA এবং 2006 সালে 2 ফেব্রুয়ারি এটি চালু হয়। এর তখন প্রাথমিক নামকরণ ছিল National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) বা জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি। প্রতিটি গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের অন্তত একজন সক্ষম ব্যক্তিকে বছরে অন্তত 100 দিন কাজ দেওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পটি নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করব।

6.14.4 মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarante Scheme বা MGNREGS)

2006 সালে ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হয় জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (NREGS)। 2009 সালে 2 অক্টোবর কর্মসূচিটির নাম দেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি। এর মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের অন্তত একজন সক্ষম ব্যক্তিকে 100 দিন কাজ দেওয়া। এর পিছনে যে আইন ছিল তার নাম হল জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা আইন (National Rural Employment Guarantee ACT বা NREGA)। এই আইনের মূল কথাগুলি নিম্নরূপ—

(i) গ্রামের ইচ্ছুক পরিবারগুলির অন্তত একজনকে বছরে অন্তত 100 দিন মজুরির বিনিময়ে কাজ দিতে হবে।

(ii) কেন্দ্রীয় সরকার মজুরির হার ধার্য না করা পর্যন্ত কৃষিশ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরির হার বলবৎ হবে।

(iii) আবেদনকারী আবেদনের 15 দিনের মধ্যে কাজ না পেলে তিনি রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত বেকার ভাতা পাবেন।

(iv) নিয়োগ সংক্রান্ত কাজর্কম পরিচালনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে নিয়োগ গ্যারান্টি পর্ষদ গঠিত হবে।

(v) NREGS-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজন (SGRY) এবং খাদ্যের বিনিময়ে কার্য (FFW) প্রকল্পটি যুক্ত করে দেওয়া হবে।

(vi) প্রকল্প রূপায়ণের তদারকির জন্য জেলাস্তরে উপযুক্ত কমিটি গঠন এবং ব্লক স্তরে আধিকারিক নিয়োগ করা হবে।

(vii) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রাম সভার সুপারিশ অনুযায়ী কার্যসূচি নির্ধারণ করবে।

(viii) প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় নিয়োগ নিশ্চয়তা তহবিল গঠন করবে। রাজ্য সরকারগুলিও অনুরূপ তহবিল গঠন করবে।

গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূর করতে এই MGNREGS হল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

MGNREGS-এর বৈশিষ্ট্যসূমহ (Fatures of MGNREGS)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, MGNREGS-এর মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ ইচ্ছুক পরিবারের অন্তত একজনকে বছরে অন্তত 100 দিন মজুরির বিনিময়ে কাজ দেওয়া। এই প্রকল্পের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. আবেদনের 15 দিনের মধ্যে কাজের নিয়োগ এবং মজুরির নিশ্চয়তা প্রদান,

2. প্রকল্পটির ব্যয়ের 90 শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বহন,

3. শ্রম নিবিড় কাজের উপর গুরুত্ব প্রদান,

4. কন্ট্রাক্টর এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা,

5. সুবিধা গ্রহীতাদের অন্তত 33 শতাংশ মহিলা,

6. ব্যাংক এবং ডাকঘরের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মজুরি প্রদান।

MGNREGS যে সমস্ত কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছে সেগুলি হল— জল সংরক্ষণ, খরা নিবারণ, ভূমি

উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন। 2019-20 সালের জন্য এই প্রকল্পে প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 71,000 কোটি টাকা।

MGNREGS-এর রূপায়ণ (Implementation of MGNREGS)

বর্তমানে (2022) গ্রামীণ ভারতে MGNREGS-ই প্রধান নিয়োগ সৃষ্টিকারী প্রকল্প বা কার্যসূচি। এটি অভূতপূর্ব মাত্রায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে নিয়োগের নিশ্চিয়তা দান করেছে। এর প্রধান সাফল্য বা কৃতিত্বগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

(i) **নিয়োগ প্রদান :** প্রথম বছরে (2006-07) প্রকল্পটি নিয়োগ প্রদান করে 90.50 কোটি মানব দিবস (Preson-days)। 2013-14 সালে এটি বেড়ে দাঁড়ায় 220.35 কোটি মানব দিবস।

(ii) **মজুরি আয় বৃদ্ধি :** MGNREGS-এর ফলে গ্রামীণ দরিদ্রদের মজুরি আয় বেড়েছে। তা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে শ্রমের চাহিদা বাড়ার ফলে মজুরির হারও বেড়েছে।

(iii) **দুর্বল গ্রুপের প্রতি সহায়তা :** এই প্রকল্পের অধীনে SC, ST এবং মহিলাদের কাজে অংশ গ্রহণে হার বেড়েছে। এদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করেছে এই কর্মসূচি বা প্রকল্প।

(iv) **আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ :** ব্যাংক এবং ডাকঘরের মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থা গ্রামীণ দরিদ্রদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে সাহায্য করেছে।

(v) **প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি দৃঢ়করণ :** এই প্রকল্পের কাজের প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল— মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়ন প্রভৃতি। এতে প্রাকৃতিক সম্বদের ভিত্তি দৃঢ় হচ্ছে।

MGNREGS-এর সীমাবদ্ধতা (Limitations of MGNREGS)

MGNREGS রূপায়ণে কয়েকটি সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ—

1. **গতিবেগ হ্রাস :** 2015 সালের পর MGNREGS-এর কাজের গতিবেগ কমেছে। নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হ্রাস মান প্রবণতা দেখা গেছে।

2. **রূপায়ণে অনিয়ম :** প্রকল্পটির রূপায়ণে ঘুষ, কাটমানি প্রদান প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে।

3. **শ্রমিকদের নামের তালিকায় কারচুপি :** এর ফলে অনেক সময় ঠিক ব্যক্তি কাজ পায়নি।

4. **ব্যাপক দুর্নীতি :** নকল এবং হাতে লেখা বিনল, কমমানের দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার, প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানো, ভুয়ো প্রকল্প রূপায়ণ, পঞ্চায়েত ও সরকারি আধিকারিকদের তহবিল আত্মসাৎ প্রভৃতি দুর্নীতি বিভিন্ন সমীক্ষায় ধরা পড়েছে।

5. **বিলম্বে মজুরি প্রদান :** শ্রমিকের মজুরি দিতে অনেক সময় অযথা বিলম্ব হয়েছে।

6. **কর্মীর অভাব :** সরকারি কর্মীর এবং আধিকারিকের অভাবে প্রকল্পটি অনেকক্ষেত্রে ঠিকভাবে রূপায়তি হচ্ছে না।

7. **বেকার ভাতা না দেওয়া :** অনেক রাজ্য শ্রমিকদের বেকার ভাতা দেয়নি বা কম অথবা অনিয়মিতভাবে দিয়েছে।

এই প্রকল্পের এই বড় ত্রুটি হল যে, প্রতিটি 'ইচ্ছুক' পরিবারের অন্তত একজনকে বছরে অন্তত 100 দিন কাজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়নি। ফলে সচ্ছল পরিবারের

সদস্যরাও প্রকল্পের Job Card করাচ্ছে। এতে অনেক প্রকৃত দরিদ্র পরিবার কাজ পাচ্ছে না। তা ছাড়া, সচ্ছল পরিবারের সদস্যরা কায়িক শ্রম দিতে দক্ষ নয়। এতে কাজের মান ও পরিমাণ উভয়ই কমছে। দক্ষ শ্রমিকেরাও অসন্তুষ্ট হচ্ছে। তারাও কম কাজ করতে চাইছে কেননা সকলের মজুরি সমান। সরকারকে এই সমস্ত বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। শুধু রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার লোভে অর্থনীতিকে অবহেলা করলে তার পরিণাম ভালো হবে না।

6.15 সারাংশ (Summary)

1. দারিদ্র্যসীমার ধারণা : দারিদ্রসীমা বা দারিদ্র্যরেখা বলতে সেই পরিমাণ ভোগ ব্যয় বা আয়কে বোঝানো হয় যার দ্বারা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে দৈনিক 2,250 ক্যালরি পেতে পারে।

2. ভারতে দারিদ্র্যের বিভিন্ন পরিমাপ : বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং সংগঠন ভারতে দারিদ্র্যের পরিমাণ পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। সব পরিমাপেই দৈনিক 2,250 ক্যালরিযুক্ত খাবরকেই নিম্নতম প্রয়োজনীয় মান হিসাবে ধরা হয়েছে। ভারতের দারিদ্র্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিমাপ হল ঃ বর্ধনের সমীক্ষা, ডা. কোস্টার পরিমাপ, দান্ডেকার ও রথ কর্তৃক পরিমাপ, বিশ্বব্যাংকের পরিমাপ, আলুওয়ালির পরিমাপ, তেন্ডুলকরের পরিমাপ প্রভৃতি। বিভিন্ন পরিমাপে অনুসৃত পদ্ধতি এবং সংজ্ঞা বিভিন্ন। সুতরাং, তাদের ফলাফল সরাসরি তুলনীয় নয়। তবে বিভিন্ন পরিমাপের ফলাফল থেকে বলা যেতে পারে যে, ভারতে 2020 সালে প্রায় 30 শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত।

3. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক : শুধুমাত্র আয়কে মাপকাঠি হিসাবে না ধরে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বিবেচনা করে দারিদ্য পরিমাপের যে সূচক তৈরি করা হয় তাকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক বলে। এই সূচক 2010 সালে যৌথভাবে প্রথম তৈরি করে Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) এবং United Nations Development Programme (UNDP)।

4. ভারতে দারিদ্র্যের কারণ : ভারতে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলি হল— জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারত্ব, পরিকল্পনার ত্রুটি, মুদ্রাস্ফীতি, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য, জনগণের নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার ত্রুটিপূর্ণ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি প্রভৃতি।

5. ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা : ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি হল—(i) ন্যূনতম প্রয়োজন প্রকল্প গ্রহণ, (ii) গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ যেমন, সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা, প্রান্তিক চাষি ও খেতমজুর উন্নয়ন সংস্থা, খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা এবং সর্বোপরি, মহাত্মাগান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি।

6. ভারতে বেকার সমস্যা : বেকার সমস্যা ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। ভারতের মোট কর্মক্ষম শ্রমিকের একটা বড় অংশ বেকার। এতে মানব সম্পদের অপচয় ঘটে। তা ছাড়া, এই বেকারিই ভারতে দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

7. বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ : ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল— মরশুমি বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, শিল্পক্ষেত্রে বেকারত্ব এবং শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্ব। এছাড়া, প্রযুক্তিগত বেকারত্ব এবং বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্বও দেখা যায়। মরশুমি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দেখা যায় মূলত কৃষিক্ষেত্রে। তবে শিল্পক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন জীবিকাতেও এই ধরনের বেকারি দেখা যায়। শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্ব মূলত শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে দেখা যায়। তবে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার বিস্তারের ফলে সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলেও এধরনের বেকারত্ব বাড়ছে।

8. ভারতে বেকারত্বের কারণ : ভারতে বিপুল বেকার সমস্যার পিছনে অনেক কারণ আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নয়নের নিম্নহার, মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল নির্বাচন, উপযুক্ত নিয়োগ নীতির অভাব, ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের রুগ্‌ণ অবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্পে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা, সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা প্রভৃতি।

9. বেকার সমস্যার সমাধানে কিছু সুপারিশ : গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করতে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল— পতিত জমি উদ্ধার, বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলসেচের প্রসার, কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা প্রভৃতি। শহর ও শিল্পাঞ্চলের বেকারি দূর করতে হলে যে ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে সেগুলি হল— শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটানো, শ্রমিকদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল নির্বাচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কারগিরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন।

10. ভারতে বেকারি দূর করতে গৃহীত কর্মসূচি : ভারতে বেকারি দূর করতে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলি হল— গ্রামীণ কর্ম প্রকল্প গ্রহণ, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন, প্রান্তিক চাষি ও ভূমিহীন কৃষক সংস্থা স্থাপন, কৃষি-সেবা কেন্দ্র স্থাপন, অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ, গ্রামীণ ভূমিহীনদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীণ যুবকদের স্ব-নিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রকল্প, জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্প, খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প ইন্দিরা আবাস যোজনা, ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সর্বোপরি, মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি প্রবর্তন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেকার সমস্যার তীব্রতা কমাতে গেলে প্রথমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো দরকার। এছাড়া, সরকারি প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার এবং শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশলের প্রসার প্রয়োজন।

11. কর্মনিয়োগ বাড়াতে কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি : কর্মনিয়োগ বাড়াতে ভারত সরকার গৃহীত চারটি প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হল— (i) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP), (ii) জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচি বা প্রকল্প (NREP), (iii) গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প (RELEGP) এবং (iv) মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্প বা কর্মসূচি (MGNREGS)।

6.16 অনুশীলনী (Exercise)

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer-type Questions)**

১. দারিদ্র্যরেখা কাকে বলে?
২. দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা দাও।
৩. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক কাকে বলে?
৪. ভারতে দারিদ্র্যের পরিমাপ করেছেন এমন কয়েকজন সমীক্ষেকের নাম বল।
৫. মরশুমি বেকারত্ব কাকে বলে?
৬. শিল্পক্ষেত্রে কি মরশুমি বেকারত্ব থাকতে পারে?
৭. প্রচ্ছন্ন বেকারি কাকে বলে?
৮. কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও কি প্রচ্ছন্ন বেকারি থাকতে পারে?
৯. কৃষিতে মরশুমি বেকারত্বের প্রধান কারণ কী?
১০. ভারতের কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের প্রধান কারণ কী?
১১. SFDA ও MFAL-এর পুরো কথাগুলি কী কী?
১২. NREP-এর পুরো নাম কী?
১৩. RLEGP-র পুরো নাম বল?
১৪. IRDP-র পুরো কথাটি কী?
১৫. TRYSEM প্রকল্পটি কী?
১৬. TRYSEM-এর পুরো নাম বল।
১৭. PMRY-এর পুরো কথাটি কী?
১৮. ভারতে দারিদ্র্যের দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করো।
১৯. ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণের দুটি কর্মসূচি উল্লেখ করো।
২০. MGNREGS-এর পুরো নাম বল।

■ **মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium Answer Type Questions)**

১. ভারতে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করো।
২. বহুমাত্রিক দারিদ্র্যসূচক সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।
৩. ভারতে প্রধানত কি কি ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়?
৪. ভারতে বেকারত্বের প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।
৫. সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP) সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।
৬. ভারতে বেকার সমস্যা সমাধানের তোমার কিছু সুপারিশ দাও।
৭. জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচি বা প্রকল্প (NREP) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

৮. বেকার সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে ভগবতী কমিটির রিপোর্ট সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৯. গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্পটি (RLEGP) সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

১০. মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচিটির (MGNREGS) রূপরেখা দাও।

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long Answer Type Questions)**

১. ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণের সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

২. ভারতে যে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা যায় তাদের পরিচয় দাও।

৩. ভারতে বেকারি দূর করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করো।

৪. মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা প্রকল্পটির বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো।

৫. সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP) এবং জাতীয় গ্রামীণ বিনিয়োগ কর্মসূচি (NREP) দুটির বর্ণনা দাও।

৬. ভারতে প্রধান কয়েকটি দারিদ্র্য পরিমাপের ফলাফল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করো।

৬.১৭ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. সেখ সেলিম (2011) ঃ ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

২. রায়, স্বপন কুমার ও জয়দেব সরখেল (2018) ঃ ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2019) : ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৪. Datt, Gaurav & Ashwariv Mahajan (2020) : Indian Econocy, S. Chand and Company Limited, New Delhi.

৫. Puri, V. K. and S. K. Misra (2020) : INdian Economy, Himalaya Publishing House, Mumbai.

একক-7 ❑ ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

গঠন

7.1 উদ্দেশ্য

7.2 প্রস্তাবনা

7.3 ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

7.4 ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

7.5 ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্টসমূহ

7.6 ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

7.7 ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা

7.8 পরিকল্পনার সমাপ্তি ও NITI আয়োগ স্থাপন

7.9 সারাংশ

7.10 অনুশীলনী

7.11 গ্রন্থপঞ্জি

7.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে—

- ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পনার কেন প্রয়োজন হয়
- ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী
- ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা
- কোন্ পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা কমিশনের বদলে NITI আয়োগ স্থাপন

7.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

1947 সালে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করে তখন ভারত ছিল এক সমস্যাসংকুল দেশ। দীর্ঘ 190 বছর দেশটি বিদেশি শাসনের অধীনে (1757-1947) ছিল। সেই পরাধীনতার যুগে দেশটি নানাভাবে বিদেশি শাসকের দ্বারা শোষিত হয়েছে। স্বাধীনতার সাথে এল দেশবিভাগ। অখণ্ড ভারতবর্ষ ভেঙে তৈরি হল ভারত ও পাকিস্তান। দেশবিভাগ নিয়ে এল শরণার্থী সমস্যা, খাদ্যসমস্যা, কৃষিজাত কাঁচামালের সমস্যা ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক সমস্যা। দেশটির অর্থনৈতিক ভিত আদৌ মজবুত ছিল না। এরূপ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় দেশটির পুনর্গঠন

ও উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। বর্তমান এককে ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ এবং ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় 1951 সালে এবং পরিকল্পনার যুগ শেষ হয়ে 2017 সালে। এই দীর্ঘ 66 বছরে ভারতে 12 টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বেশ কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করা হয়। এই পরিকল্পনাগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়েও বর্তমান এককে আলোচনা করা হয়েছে। বহু সাফল্য সত্ত্বেও ভারতের পরিকল্পনাগুলি আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। এজন্য পরিকল্পনা কমিান ভেঙে দিয়ে তার পরিবর্তে এসেছে NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কী উদ্দেশ্যে এই আয়োগ স্থাপিত হয়েছে তাও বর্তমান এককে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

7.3 ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Need for Planning in India)

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে নানা কারণে পরিকল্পনা প্রয়োজন। **প্রথমত,** এরূপ দেশে বাজারি শক্তি তেমন জোরদার নয়। ফলে দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থার দ্বারা সম্পদের কাম্য বণ্টন ঘটেনা। বাজার ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা দূর করতে পরিকল্পনার প্রয়োজন। **দ্বিতীয়ত,** ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যদি অবাধে কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে তা নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এতে সামাজিক সম্পদের অপচয় হয়, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য তৈরি হয় প্রভৃতি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই এই অকাম্য বিষয়গুলি দূর করা যায় বা তাদের তীব্রতা কমানো যায়। **তৃতীয়ত,** অনুন্নত দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। অর্থনীতিবিদ নার্কস্-এর মতে, এই দুষ্টচক্রের পিছনে প্রধান কারণ হল মূলধনের স্বল্পতা। পরিকল্পনার মাধ্যমেই মূলধন সংগ্রহ করা এবং সেই মূলধন উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয়। **চতুর্থত,** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের পরিকাঠামো শিল্প উন্নত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যুৎ, জলসেচ, পরিবহণ, যোগাযোগ ইত্যাদি হ'ল পরিকাঠামোর উদাহরণ। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা সাধারণত পরিকাঠামো শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না, কেননা এতে বড় আকারের মূলধন লাগে এবং প্রতিদান পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। দেশের সরকারকেই তাই পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হয়। পরিকাঠামো উন্নত হলে তখন ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা শিল্পের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়।

এ সমস্ত কারণে উন্নত এবং অনুনন্নত উভয় প্রকার দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। তবে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পনার প্রয়োজনও আরও বেশি। 1950 সাল নাগাদ ভারতের প্রধান সমস্যাগুলি ছিল ঃ জনসাধারণের দারিদ্র্য, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনীতির বিশৃঙ্খলা, দেশবিভাগের ফলে শরণার্থীর চাপ, বেকারি, আয় বৈষম্য, শিল্পের অনগ্রসরতা প্রভৃতি। এসমস্ত সমস্যা দূর করতে ভারতেও তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 1951 সাল থেকে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় এবং 2017 সালের 31 মার্চ তা শেষ হয়। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতাকে নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

প্রথমত, 1950 সালে ভারতে সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানে ভারতকে একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (welfare state) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ দেশের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা। আর সেটি করতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার

প্রয়োজন। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে (unplanned economy) সম্পদের কাম্য বণ্টন হয় না। সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা নিজেদের মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন করে। ফলে অনেক সময় দেশে অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন ঘটে। এতে জনগণের কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই স্বাধীনতার পর পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুরু হয়। তাছাড়া, দারিদ্র্য দূর করে জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র উন্নয়ন ঘটালেই চলবে না, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তবে উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের ব্যবধান কমবে। নতুবা, অনুন্নত দেশটি চিরকাল আপেক্ষিকভাবে অনুন্নতই থেকে যাবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই সরকার দেশের দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে পারে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যেই ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

তৃতীয়ত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনে তীব্র বৈষম্য বর্তমান। তা দূর করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। অরিকল্পিত অর্থনীতিতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত উদোক্তাদের হাতে মুনাফা জমতে থাকে। অন্যদিকে, দেশের ব্যাপক জনসাধারণ নিম্ন আয় ও দারিদ্র্যের আবর্তে নিমজ্জিত থাকে। তাছাড়া, এখানে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদেরও কাম্য বণ্টন ঘটেনা। এসব অবস্থা দূর করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমেই দেশের অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কাম্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

চতুর্থত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে মূল ও ভারী শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। এগুলো সাধারণ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে এধরনের মূলধনী দ্রব্য শিল্পের অভাব। ফলে এখানে মূলধন গঠনের হার খুব কম হয়। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধির জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা যেমন দেশের পরিকাঠামোর উন্নতিতে বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না। তেমনি একই কারণে তারা মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহী হয় না। তাই মূল ও ভারী শিল্প বা মূলধনি দ্রব্যের শিল্প গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ভারতে অথনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য বা কারণ ছিল দেশে মূলধনী শিল্প গড়ে তোলা।

পঞ্চমত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য বর্তমান। এই বৈষম্য হ্রাস করার জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি যে, অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সাধারণ জনগণের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন। দরিদ্র ব্যক্তিরা যাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমাগ্রী পায় তার ব্যবস্থা করাও পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠত, স্বাধীনতার আগে থেকেই ভারতে বেকারি এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত কর্মসূচির দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। কেননা এই শিল্পগুলিই শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে। পাশাপশি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও নানা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার, কৃষিতে রয়েছে বিপুল আয়তনের প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। শিল্পের প্রসারের দ্বারা এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কৃষি থেকে শিল্পে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া, ভারতে রয়েছে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কর্মহীনতা। উপযুক্ত নিয়োগনীতি প্রবর্তন করে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার

ঘটিয়ে এই সমস্যা দূর করা যেতে পারে। আর এই সমস্ত কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ এবং তা রূপায়ণের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

সপ্তমত, 1950 সালের পূর্বে ভারতে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। ফলে দেশের কিছু অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং বাকি অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত রয়ে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, দেশে শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারে। ঐসব অঞ্চলে শিল্পের বিকাশের জন্য নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা ঐ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবে। করের সুবিধা, সস্তায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

অষ্টগত, পূর্বে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল উপনিবেশিক ধরনের অর্থাৎ ভারত মূলত কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি। এক্ষেত্রে বাণিজ্য হার সাধারণত রপ্তানি দ্রব্যের প্রতিকূলে থাকে। এই ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য কাঠামো পরিবর্তনের জন্যও ভারতের ন্যায় দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর জন্য দেশটির রপ্তানির বৈচিত্র্য সাধন করতে হবে এবং রপ্তানি প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, অনাবশ্যক আমদানি নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। এই রপ্তানি প্রসার ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

সবশেষে, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আরও নানা কারণে প্রয়োজন। সংক্ষেপে সেগুলি হল : অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো, সমাজের দুর্বল শ্রেণির জন্য কিছু বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ, দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (stability) বজায় রাখা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, এবং সর্বোপরি, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা (economic self-sufficiency) অর্জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে একাধিক কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনাই দেশটিকে দ্রুত অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করতে পারে। এজন্যই স্বাধীনতা লাভের পর 1951 সালে ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ঐ বছর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে।

7.4 ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Indian Plans)

বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ভারতে 1951 সাল থেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। 2017 সাল পর্যন্ত ভারতে 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। প্রতিটি পরিকল্পনাতেই কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। বিভিন্ন পরিকল্পনার সেই উদ্দেশ্যগুলি সব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক নয়, তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তবে ভারতের এই 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্যসমূহকে বিশ্লেষর করলে আমরা এদের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে পারি। অধ্যাপক প্রমিত চৌধুরি বলেছেন যে, ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগে রয়েছে সমগ্র অর্থনীতির দিক থেকে অর্থাৎ সর্বভারতীয় স্তরে কাম্য উদ্দেশ্যসমূহ। এদের মধ্যে রয়েছে : (i) জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। (ii) পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, (iii) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি,

(iv) দামস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় এবং (v) বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের সুবিধার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (i) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, (ii) উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, (iii) কৃষির উন্নয়ন এবং (iv) শিল্পের উন্নয়।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্য সমূহ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (i) কৃষি উপকরণের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি-বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রের উপকরণগুলির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা। এই উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কিছু উদ্দেশ্য আবার একে অপরের অন্তর্ভুক্ত (mutually inclusive)। যেমন, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দূর করতে হলে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উপকরণের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবার, কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, দামস্তরে স্থিতিশীলতা প্রভৃতি উদ্দেশ্যগুলিকে 'অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা' এই উদ্দেশ্যের অধীনে আনা যায়। আমরা ভারতীয় পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি এখন সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

1. জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঃ ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি। আসলে, যেকোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্য হল, দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন ঘটানো। এর জন্য জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি প্রয়োজন।। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটে। আর মাথাপিছু আয় বাড়তে গেলে জনসংখ্যা অপেক্ষা জাতীয় আয়কে বেশি হারে বাড়তে হবে। তবেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটবে। স্বভাবতই, ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি।

2. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : আমরা জানি, ভারতে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি। এই জনবহুল দেশে শিল্পের উন্নতি না ঘটায় তীব্র বেকার সমস্যা রয়েছে। অথচ দেশে বেকার সমস্যা থাকলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ না বাড়লে বেকারত্ব কমবে না এবং জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। তাই বেকারত্ব কমাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। অবশ্য ভারতের প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি অবহেলিত হয়েছে। পরিকল্পনা রচয়িতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, জাতীয় আয় বা উৎপাদন বাড়লেই কর্মসংস্থানও বাড়বে। কর্ম সংস্থানকে তাঁরা আয়বৃদ্ধির উপজাত বিষয় (by-product) বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সর্বদা ঠিক নয়। উৎপাদন বাড়লে শ্রম নিয়োগ বাড়বে কিনা, তা উৎপাদন কৌশলের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন কৌশল যদি মূলধন নিবিড় হয়, তাহলে শ্রমিক নিয়োগ না বেড়েও উৎপাদন বাড়তে পারে। ভারতের প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলির এই ভ্রান্তি পঞ্চম পরিকল্পনা পর্যন্ত চলেছিল। ঐ পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর সরাসরি জোর দেওয়া হয়নি। অবশেষে ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-85) পরিকল্পনা থেকে সরাসরি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা বলা হয়। ষষ্ঠ থেকে শেষ দ্বাদশ পরিকল্পনা (2012-17) পর্যন্ত শ্রমনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের উপর কিছু না কিছু কর্মসূচি রাখা হয়। পাশাপাশি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

3. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি : Harrod-Donar মডেলের মতে, কোনো দেশের আয়বৃদ্ধির হার হল সঞ্চয়ের হার ও মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত। মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চয়ের হার

যত বেশি হবে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার তত বেশি হবে। (সঞ্চয়ের হার হল দেশের মোট সঞ্চয় (S) ও জাতীয় আয়ের (Y) অনুপাত অর্থাৎ সঞ্চয়ের হার = S ÷ Y)। তাহলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে বাড়াতে হলে সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হবে এবং সেই সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োজিত করতে হবে। এজন্যই ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি অন্যতম উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। আর বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মূল ও ভারী শিল্পের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়।

4. আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য হ্রাস করা : ব্রিটিশ শাসনের আমল থেকেই ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে তীব্র বৈষম্য রয়েছে। দেশের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়; আর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জাতীয় উৎপন্নের সামান্য অংশই ভোগ করে। দেশের সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এককথায়, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ও শিল্পপতি বা শিল্পগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। এজন্যই ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা। কেননা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য শুধু জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করাই নয়, সেই বর্ধিত উৎপাদন দেশের জনগণের মধ্যে সুষম বণ্টন করাও পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সরকার তথা পরিকল্পনা রচয়িতাদের লক্ষ্য রাখতে হয়, উন্নয়নের সুফল থেকে সাধারণ দরিদ্র মানুষ যেন বঞ্চিত না হয়। এজন উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং শিল্প ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা দরকার। তা না হলে উন্নয়নের সুফল দেশের অল্পসংখ্যক কিছু লোক ভোগ করবে। তাতে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। ভারতের পরিকল্পনাগুলির তাই একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। শেষের পরিকল্পনাগুলিতে বিশেষভাবে সমভাগী উন্নয়নের (Inclusive growth) লক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

5. বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা : প্রথম পরিকল্পনা কাল (1951-56) বাদ দিলে সমগ্র পরিকল্পনাকালেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা গেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ভারসাম্যহীনতা দূর করা প্রয়োজন। এজন্য ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। এজন্য একদিকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা বা কমানো প্রয়োজন এবং অন্যদিকে রপ্তানি বাড়ানো প্রয়োজন। তাহলে বিদেশি মুদ্রার তহবিল তৈরি হবে। এই তহবিল ব্যবহার করে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও কলাকৌশল আমদানি করা সম্ভব হবে। এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়বে।

6. অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা : যে-কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও মুখ্য উদ্দেশ্য হল স্বয়ম্ভরতা অর্জন। এখানে স্বয়ম্ভরতা বলতে অর্থনীতির বিভিন্নক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা বা আত্মনির্ভরশীলতা বোঝানো হচ্ছে। যেমন, একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন। এর জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। সেজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবার, স্বয়ম্ভরতা বলতে বিদেশের উপর নির্ভরতা দূর করাও বোঝায়। এক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হলে আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে, বিদেশি কলাকৌশলের বদলে দেশীয় কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে, শিল্পের উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এই স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাই ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবার,

অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হলে মুদ্রাস্ফীতিনিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। নতুবা অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনার হিসাব বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং অর্থনীতিতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাছাড়া, দামস্তর নিয়ন্ত্রণে না রাখা গেলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেবে। দামস্তর বাড়লে আমদানি বাড়বে এবং রপ্তানি কমবে। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বাড়বে। ঘাটতি মেটাতে সরকারকে বিদেশি সূত্র থেকে ঋণ নিতে হবে। সুতরাং দেশটিকে তখন স্বনির্ভর বলা যাবে না। তাই ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

তবে এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলির পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূর করা। জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষির উন্নতি, শিল্পের অগ্রগতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন ইত্যাদি সমস্ত উদ্দেশ্যের মূলে ছিল দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্য। অবশ্য পঞ্চম পরিকল্পনার পূর্বে উদ্দেশ্য হিসাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল, ভারতের জাতীয় আয় বেশ কিছুটা বেড়েছে কিন্তু দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়নি। লক্ষ্য করা গেল যে, দারিদ্র্য সীমার নীচে জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাবা হয়েছিল যে, দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্যের প্রকোপ কমবে এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাস পাবে। কিন্তু চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় তা ভুল প্রমাণিত হল। তাই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (1974-79) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি : (i) দারিদ্র্য দূর করা এবং (ii) স্বনির্ভরতা অর্জন করা। এই প্রথম দারিদ্র্য দূরীকরণকে উদ্দেশ্য হিসাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হল। এরপর অবশ্য ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে দারিদ্র্য হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হয়।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির সম্পর্কে কিছু সমালোচনার সুরও শোনা গেছে। **প্রথমত,** অনেকে এই উদ্দেশ্যগুলিকে উচ্চাশাপূর্ণ বলে মনে করেছেন। উদ্দেশ্যগুলি পূরণ হতে গেলে দেশের প্রকৃত অবস্থা যেমন হওয়া প্রয়োজন; বাস্তবে তা ছিল না। অর্থাৎ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় পরিকল্পনা রচয়িতারা কিছু বিষয় অনুমান করে নিয়েছিলেন। সেই অনুমানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল বাস্তবতাবর্জিত আশাবাদী অনুমান। **দ্বিতীয়ত,** অধ্যাপক প্রমিত চৌধুরি এবং আরও অনেকে মনে করেন যে, বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যেমন, আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমালে দেশে ভোগ ব্যয় বাড়বে এবং সঞ্চয়ের হার কমবে। আবার, সঞ্চয়ের হার কমলে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার কমবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়ানো এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য কমানো এই দুটি লক্ষ্য পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংগতিপূর্ণ নয়। এটি অবশ্য সর্বত্রই প্রযোজ্য। বাস্তবে সামাজিক ন্যায় এবং প্রসারের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যজনক বিরোধ বা টানাপোড়েন (unfortunate conflict or trade off between growth and justice) থাকে। একটি লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে অপর লক্ষ্যটি দূরে সরে যায়। **তৃতীয়ত,** অনেকে মনে করেন যে, ভারতের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি ছিল অতিমাত্রায় কল্যাণমুখী। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দক্ষতার উপর বেশি জোর না দিয়ে জনগণের কল্যাণের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। **চতুর্থত,** অনেকের মতে, ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে সঠিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি। এগুলিকে কেবল সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, এগুলিকে বস্তুগতভাবে (objectively) বা পরিমাণগত ভাবে (quantitatively) প্রকাশ করা হয়নি। ফলে উদ্দেশ্যগুলি কতটা সফল হল বা কতটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হল, তা পরিমাপ করা যায়নি।

পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্যও যথাযথভাবে পূরণ হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পরিকল্পনাগুলি উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। **প্রথমত,** পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বেড়েছে বটে, তবে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে মাথাপিছু আয় খুব কম হারে বেড়েছে। **দ্বিতীয়ত,** 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পরও ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তি দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করে। **তৃতীয়ত,** পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান সামান্যই বেড়েছে। ফলে ভারতে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। **চতুর্থত,** পরিকল্পনাকালে ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমেনি বরং তা আরও বেড়েছে। **পঞ্চমত,** অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যও বাস্তবে পূরণ হয়নি। উন্নত কলাকৌশলের জন্য ভারত আজও বিদেশের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। **ষষ্ঠত,** বৈদেশিক বানিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যও বাস্তবে পূরণ হয়নি। প্রথম পরিকল্পনার পার প্রায় সমগ্র পরিকল্পনাকালে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বেড়েছে। আমরা ভারতের পরিকল্পনাগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে এই এককের শেষের দিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। পরিকল্পনাগুলির যেমন অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে, তেমনি কিছুক্ষেত্রে ব্যর্থতার আয়তনও কম নয়। ভারতের পরিকল্পনাগুলির সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হল দারিদ্র্য ও বেকারি দূরীকরণে ব্যর্থতা। পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয়ের যে প্রসার ঘটেছে। তাঅনেকটাই কর্মসংস্থানহীন প্রসার (jobless growth)। জনসংখ্যার এক বিশাল অংশের কর্মসংস্থান হয়নি। আর কর্মসংস্থান হয়নি বলেই তারা দরিদ্র। দারিদ্র্য ও বেকারি হল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই দুই যৌথ সমস্যার সমাধান করা যায়নি। বলেই ভারতীয় জনসংখ্যার এক বিশাল অংশের কাছে পরিকল্পনা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারেরও মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। তাই পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দিয়ে 2015 সালের 1 জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করে NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। এই NITI আয়োগই বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের বদলে ভারত সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1012-17) ছিল ভারতের পরিকল্পনার ইতিহাসে শেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

7.5 ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Indian Plans)

ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির সময়কাল, লক্ষ্যমাত্রা, রূপায়ণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে এগুলির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, ভারতীয় পরিকল্পনাগুলি সামগ্রিক পরিকল্পনা (total planning), এগুলি আংশিক (partial) পরিকল্পনা নয়। যখন কোনো পরিকল্পনা অর্থনীতির প্রধান সমস্ত কাজকর্মের জন্য বা অর্থনীতির সমস্ত অংশের জন্য গ্রহণ করা হয় তখন তাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা বলে। অন্যদিকে, যদি কোনো পরিকল্পনা অর্থনীতির কিছু অংশের জন্য অথবা অর্থনীতির নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমের জন্য গৃহীত হয়, তাহলে সেই পরিকল্পনাকে আংশিক (বা খণ্ডিত বা বিভাগীয়) পরিকল্পনা বলে। সামগ্রিক পরিকল্পনা সমগ্র অর্থনীতির সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রের বিষয় নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে দেশটির সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, সেবাক্ষেত্র, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি। অন্যদিকে, আংশিক পরিকল্পনা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর মনোযোগ দেয় এবং অন্য বিষয়গুলি চাহিদা ও জোগানের শক্তির উপর ছেড়ে দেয়। অর্থনীতিবিদ লুইস একে piecemeal planning বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল সামগ্রিক পরিকল্পনা, আংশিক পরিকল্পনা নয়। এর অর্থ হল, সমগ্র অর্থনীতির জন্য এই পরিকল্পনাগুলি রচনা করা হত। দেশের কোনো অংশবিশেষের জন্য পরিকল্পনাগুলি

রচনা করা হত না। ভারতীয় অর্থনীতিতে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হত, যেমন, কৃষি, শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, জনস্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি। প্রতিটি ক্ষেত্রের অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হত। এভাবে সমগ্র অর্থনীতির দিকে লক্ষ রেখে পরিকল্পনা রচনা করা হত। তাই ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল সামগ্রিক পরিকল্পনা, আংশিক পরিকল্পনা নয়। অবশ্য পুরোপুরি সামগ্রিক পরিকল্পনা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই গ্রহণ করা সম্ভব। সেখানে সমগ্র অর্থনীতির সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থাকে। চিন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে এরূপ যথার্থ সামগ্রিক পরিকল্পনা বিদ্যমান। তবে ভারতের ন্যায় মিশ্র অর্থনীতিতেও পরিকল্পনাগুলি চরিত্রগতভাবে ছিল 'সামগ্রিক' (total) পরিকল্পনা অর্থাৎ সমগ্র অর্থনীতির জন্য এই পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হত।

দ্বিতীয়ত, ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল **উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা** (development planning), সেগুলির **সংশোধনমূলক পরিকল্পনা** (corrective planning) নয়। পরিকল্পনার গভীরতা অনুসারে পরিকল্পনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : সংশোধনমূলক পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা। সংশোধনমূলক পরিকল্পনায় দেশের আর্থিক কাঠামোটি বজায় রাখা হয়। ঐ কাঠামোর মধ্যে থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বা বাজারি ব্যবস্থার কিছু দোষ ত্রুটি থাকে, যেমন, আয় বৈষম্য, বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠানামা প্রভৃতি। বাজারি ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য সংশোধনমূলক (corrective) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা এবং জাতীয় ও মাথাপিছু আয় যাতে বৃদ্ধি পায়। তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। সংশোধনমূলক পরিকল্পনায় কিন্তু দেশের কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় না। ভারতের পরিকল্পনাগুলি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করাই ছিল এই পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য।

তৃতীয়ত, ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি ছিল নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা (indicative planning), আদেশাত্মক পরিকল্পনা (imperative planning) নয়। আদেশাত্মক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয়, সেগুলি পূরণ করার জন্য অধস্তন কর্তৃপক্ষ আইনত বাধ্য থাকে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেগুলি আদেশাত্মক পরিকল্পনা। যেমন, উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায় আদেশাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত। অন্যদিকে, নির্দেশাত্মক পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা দেয়, সেগুলি পূরণ করার জন্য অধস্তন কর্তৃপক্ষ আইনত বাধ্য থাকে না। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন যে সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে, সেগুলি সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হত না। ঐ সমস্ত পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলে সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রকে শাস্তি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ভারতে অনুসৃত হয়নি। সুতরাং ভারতের পরিকল্পনাগুলি আদেশাত্মক পরিকল্পনা ছিল না, সেগুলি ছিল নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা।

চতুর্থ, ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা, একনায়কতান্ত্রিক পরিকল্পনা নয় (democratic plannin, not totalitarian planning)। একনায়কতান্ত্রিক পরিকল্পনায় একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সারা দেশের জন্য একটি বড় আকারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা। এই সংস্থাই সবকিছু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদন, বণ্টন, বিনিয়োগ, ভোগ সব কিছুই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পরিকল্পনার

কোনোরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। দেশের জনগণ এবং অধস্তন কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে করতে বাধ্য থাকে। পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের একনায়কতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চিন, কিউবা, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের পরিকল্পনা হল একনায়কতান্ত্রিক পরিকল্পনার উদাহরণ। অন্যদিকে, যে পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় তাকে বলে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা। ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রধান গণতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এরূপ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অর্থনীতির নীচের স্তরে রচিত পরিকল্পনাগুলিকে একত্রিত করে সমগ্র অর্থনীতির জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ভারতেও পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এজন্য প্রতিটি রাজ্যেই ছিল একটি করে রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড। এই বোর্ড রাজ্য স্তরের পরিকল্পনা রচনা করত এবং তা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে জমা পড়ত। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন এরপর ঐ সমস্ত রাজ্যস্তরের পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় সাধন করে সারা দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচনা করত। আবার, রাজ্য বোর্ডগুলি রাজ্যস্তরের পরিকল্পনা রচনার জন্য জেলাস্তরের এবং মহকুমা বা ব্লকস্তরের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সংগ্রহ করত। এভাবে ব্লক স্তর থেকে জেলা স্তরে, জলাস্তর থেকে রাজ্য স্তরে এবং সব শেষে রাজ্য স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনা রচিত হত। এভাবে নীচের স্তরে রচিত পরিকল্পনাগুলিকে সংগ্রহ করে সমগ্র অর্থনীতির জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি হত। এটি ছিল এককথায় Planning from below অর্থাৎ পরিকল্পনা রচনার পদ্ধতি ছিল বিকেন্দ্রীভূত। ভারতের পরিকল্পাগুলি ছিল তাই গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একনায়কতন্ত্রী পরিকল্পনা নয়।

পঞ্চমত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাল বা মেয়াদ অনুসারে পরিকল্পনাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : দীর্ঘমেয়াদি, মাঝারি মেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা। ভারতে এই তিন ধরনের পরিকল্পনাই একযোগে গৃহীত হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতি ছিল পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা। আর এই সমস্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতি বছরের জন্য একটি করে বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হত। সুতরাং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আসলে পাঁচটি বার্ষিক পরিকল্পনার সমষ্টিমাত্র। আবার কোনো অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকে। সেই সুদূরপ্রসারী (perspective) পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয় 15, 20, 25 কিংবা তারও বেশি সময়ের জন্য। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি এই দীর্ঘকালীন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে রচনা করা হত। আসলে, এই তিন ধরনের পরিকল্পনাই একটি পরিকল্পনা শৃঙ্খলের অংশ। পরিকল্পনা একটি বিরামহীন পদ্ধতি—কয়েকটি কাম্য লক্ষ্যের দিকে অবিরাম অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা। এই তিনটি পরিকল্পনা সেই সমস্ত লক্ষ্যের দিকে যাওয়ার চেষ্টার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার তুলনায় মাঝারি মেয়াদি পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রাগুলি এবং কর্মসূচিত আরো খুঁটিয়ে বা বিশদে উল্লেখ করা থাকে। আর পরিকল্পনায় অগ্রগতি বিচার করে বার্ষিক পরিকল্পনায় কিছু সংযোজন বা পরিমার্জন করা হয়। সুতরাং তিনটি বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা হল সামাগ্রিকভাবে একই পরিকল্পনার অংশ।

ষষ্ঠত, ভারতে প্রতিটি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কৌশল স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা থাকত। পরিকল্পনার দলিলে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য কী কৌশল গ্রহণ করা হবে, তা স্পষ্টভাবে বলা থাকত। যেমন, কৌশলের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ধরন কেমন হবে, অর্থনীতির কোন্ ক্ষেত্রে কতটা বিনিয়োগ করা হবে, শ্রম নিবিড় না মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা হবে, কৃষি অথবা শিল্প কোন্ ক্ষেত্রের উপর বেশি জোর দেওয়া হবে, শিল্পের মধ্যে আবার ভারী শিল্প না ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া

হবে সেগুলি উল্লেখ করা থাকত। পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের ধরন থেকেও সেটা অনুধাবন করা যেত। তেমনি, দেশের কোন্ ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কী হবে, তার লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করে দেওয়া হত। সাধারণত, এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি কতটা অর্জিত হল বা কতটা পূরিত হল, তার উপরেই কোনো পরিকল্পনার সাফল্য বিচার করা হয়।

সপ্তমত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণকারী প্রতিটি দেশেই এই কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা কমিশন থাকে। যেমন, চিনের পরিকল্পনা কমিশনের নাম The National Development and Reform Commission (NDRC) of the People's Republic of China, বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের নাম Bangladesh Planning Commission, পাকিস্তানের Planning Commission (Pakistan), নেপালের National Planning Commission of Nepal প্রভৃতি। ভারতেও পরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এর নাম ছিল Planning Commission of India যা 2013 সালের 14 আগস্ট ভেঙে দেওয়া হয়। এই কমিশনের মুখ্য কাজ ছিল সমগ্র দেশের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করা। এছাড়া, বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ হিসাব করা এবং সেই তহবিল বা সম্পদ সংগ্রহের উপায় বের করাও ছিল এই পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম কাজ। এই পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা তৈরি করত, পরিকল্পনার অগ্রগতির মূল্যায়ন কত এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার সংশোধন ও পরিমার্জন করত। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ছিল একটি উপদেষ্টা সংস্থা মাত্র। এই সংস্থা শুধুমাত্র পরিকল্পনা রচনা করত। পরিকল্পনা রূপায়ণের কোনো ক্ষমতা ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের ছিল না। পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষমতা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির। পরিকল্পনা কমিশন একটি খসড়া পরিকল্পনা রচনা করে সেটি জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে পেশ করত। এই খসড়া পরিকল্পনাটি অনুমোদন পেলে সেটি রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হল।

অষ্টমত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যের পাশাপাশি ভারতের পরিকল্পনাগুলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। ভারত একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare state)। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপশি সামাজিক ন্যায়বিচারও যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেদিকে ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করার এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অগ্রগতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ভূমি সংস্কার, কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, সর্বনিম্ন মজুরি আইন, বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি, যেমন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প, ক্ষুদ্র চাষি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষিদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প, বছরে অন্তত 100 দিনের নিয়োগ প্রকল্প, শহুরে দরিদ্রদের জন্য স্ব-নিয়োগ প্রকল্প প্রভৃতি।

নবমত, ভারতের পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন পড়ত, তা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় উৎস থেকেই সংগ্রহ করা হত। অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি হল কর, জনগণের সঞ্চয়, অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং ঘাটতি ব্যয় সংস্থান। অর্থ সংগ্রহের বাহ্যিক উৎসগুলি হল বৈদেশিক সাহায্য, বিদেশি ঋণ ও অনুদান প্রভৃতি।

সবশেষে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি ছিল মিশ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এগুলি পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ছিল না, আবার এগুলি ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনাও ছিল না। আসলে ভারত একটি মিশ্র অর্থনীতি। 1948 সালের শিল্পনীতিতে ভারতে একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। মিশ্র অর্থনীতি আসলে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিশ্ররূপ। এখানে ব্যক্তিক্ষেত্র এবং সরকারিক্ষেত্র পাশাপাশি বিরাজ করে। স্বভাবতই, এরূপ অর্থনীতিতে পরিকল্পনাও হবে মিশ্র চরিত্রের। মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পনা হয় নির্দেশাত্মক, আদেশাত্মক

নয়। এরূপ অর্থনীতিতে পরিকল্পনা হয় গণতান্ত্রিক—একনায়কতন্ত্রী নয়। ভারতের পরিকল্পনাগুলিও ছিল নির্দেশাত্মক এবং গণতান্ত্রিক। এখানে পরিকল্পনা কমিশন বেসরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারকে অনুরোধ জানাত। এভাবে পরিকল্পনা কমিশন পরোক্ষভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রের এবং প্রত্যক্ষভাবে সরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়নের চেষ্টা করত। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি ছিল মিশ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

7.6 ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য (Success of Indian Plans)

ভারতে পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় 1950-51 সালে এবং তা শেষ হয় 2017 সালের মার্চ মাসে। এই দীর্ঘ 66 বছরে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (12টি) এবং কিছু বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের এবং রূপায়ণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-65 সময় কালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 3.57 শতাংশ। অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ একে উন্নয়নের হিন্দু হার (Hindu rate of growth) বলে অভিহিত করেছিলেন। ভারত বর্তমানে সেই হিন্দু হারের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনীতিতে প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমেছে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রের গুরুত্ব বেড়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানি দ্রব্যে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য কমেছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের গুরুত্ব বেড়েছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির নিম্নলিখিত সাফল্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(ক) জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি : পরিকল্পনা কালে (1951-2017) ভারতের জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। পরিকল্পনার যুগ শুরু হবার আগের দশ বছরে (1940-50) ভারতীয় অর্থনীতি ছিল এক অনড় অর্থনীতি। ডঃ করণ সিং গিল-এর মতে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল একটি অনুন্নত, নিশ্চল এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। তাঁর ভাষায়, ভারত তখন ছিল একটি underdeveloped, stagnant, semi feudal economy। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতকে একটি অবচিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত অর্থনীতিতে পর্যবসিত করে এবং দেশবিভাগ একে একটি বিচ্ছিন্ন বা অসংবদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত করে। তিনি বলেছিলেন, ''World War II rendered it a depreciated economy and the partition of the country reduced it to a dis-integrated economy''. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর ভারত ধীরে ধীরে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলি জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই নিম্নহারের বৃদ্ধিকে (growth) অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ উন্নয়নের হিন্দু হার (Hindu rate of growth) বলে অভিহিত করেছেন। একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তবে শেষের দিকে পরিকল্পনাগুলিতে, বিশেষত অষ্টম পরিকল্পনা থেকে দ্বাদশ পরিকল্পনা পর্যন্ত এই পাঁচটি পরিকল্পনা কালে অর্থাৎ 1992 এপ্রিল থেকে 2017 মার্চ পর্যন্ত এই 25 বছরে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় যথেষ্ট সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাকালে ভারতের কৃষিরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। পরিকল্পনার পূর্বে কৃষির উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। কৃষি ছিল একেবারেই অনুন্নত। পরিকল্পনার দ্বারা কৃষির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অনেক বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প, হীরাকুদ প্রকল্প, চম্বল প্রকল্প, ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, কংসাবতী প্রকল্প, কোশি প্রকল্প, গন্ডক প্রকল্প ইত্যাদি। এসব প্রকল্পের ফলে কৃষিতে জলসেচের প্রসার ঘটেছে। তা ছাড়া, 1960-এর দশকের

শেষদিকে কৃষিতে নয়া কৌশল প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে উৎসাহভরে এই সাফল্যকে সবুজ বিপ্লব (green revolution) বলে অভিহিত করেছে। এই সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারত খাদ্যশস্যে প্রায় স্বয়ম্ভর।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা ভারতে এক উন্নত পরিকাঠামো (infrastructure) বা সামাজিক মূলধন (social overhead capital) গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এগুলিই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। রেল ও রাস্তা পরিবহণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তি প্রভৃতি শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। পাশাপাশি, মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও ভারী যন্ত্রপাতি, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়। এসবের ফলে ভারতে এক সুদৃঢ় ও বিস্তৃত পরিকাঠামো শিল্প গড়ে উঠেছে। এগুলি আবার বেসরকারি ক্ষেত্রকে বিনিয়োগে উৎসাহ জোগাচ্ছে।

চতুর্থত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে (1951-2017) ভারতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সালে অর্থাৎ পরিকল্পনা শুরুর সময়ে সঞ্চয়ের হার ছিল স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের (gross domestic product বা GDP) মাত্র 5 শতাংশ। কিন্তু 2014-17 সময়কালে ভারতে সঞ্চয়ের হার ছিল 31 শতাংশ এবং বিনিয়োগের হার ছিল 31.5 শতাংশের মতো (2011-12 সালের দামস্তরে)। পরিকল্পনাকালে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসারের ফলে গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ অনেকখানি বেড়েছে। পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যে বিনিয়োগও বেড়েছে। পরিকল্পনার ফলেই এই সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

পঞ্চমত, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত মূলত কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করত এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করত। আমরা জানি, একে বলা হয় ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য। বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ভারত ধীরে ধীরে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমদিকে পরিকল্পনাগুলিতে আমদানি পরিবর্ততার নীতি (policy of import substitution) গ্রহণ করা হয়। আমদানি দ্রব্যের পরিবর্তদ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করাই হল এর মূল কথা। এর ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। আগে যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য অমাদানি করা হত, তার অনেকগুলি এখন দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। 1991 সালে উদারীকরণের নীতি গ্রহণের পর ভারত অবশ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করেছে এবং পাশাপাশি রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিকল্পনার মাধ্যমেই আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি প্রসারের নীতির উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

ষষ্ঠত, পরিকল্পনাকালে, বিশেষত দশম পরিকল্পনা পর্যন্ত (2002-07) ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। টেলিযোগাযোগ, পারমাণবিক গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবহণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রসারের পিছনে ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্য। সরকারি ক্ষেত্র এভাবে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণে সাহায্য করেছে।

সপ্তমত, পরিকল্পনাকালে উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ট্রেনিং, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রভৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। যেমন, 2011-12 সালে ভারতে কলেজের সংখ্যা ছিল 34,852টি। 2018-19 সালে কলেজের সংখ্যা বেড়ে 39,931-এ পৌঁছায়। আবার, 2011-12 সালে ভারতে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 642টি। 2018-19 সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় 993টি (সূত্রঃ Education statistics at a glance, 2018, Government of

India)। তেমনি কারিগরি ট্রেনিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রভৃতিরও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। এসবের ফলে ভারতে মানবিক মূলধনের মান উন্নত হয়েছে। আর আমরা জানি, যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবিক মূলধনের (humam capital) গুরুত্ব অপরিসীম।

এভাবে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ভারতের উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পরিকল্পনার ফলে কৃষি উৎপাদনে স্থায়িত্ব এসেছে, মূল ও ভারী শিল্প উন্নত হয়েছে, পরিকাঠামো শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসার লাভ করেছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতির ফলে মানবিক মূলধনের মান বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি।

7.7 ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা (Failure of Indian Plans)

পরিকল্পনাকালে (1951-2017) ভারতীয় অর্থনীতির যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করেছে। তবে সাফল্যের পাশাপাশি পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতাও কম নয়। আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতাগুলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, ভারতের পরিকল্পনাগুলির প্রধান ব্যর্থতা হ'ল দরিদ্র দূরীকরণে ব্যর্থতা। বারোটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পরও ভারত থেকে দারিদ্র্য দূর হয়নি। আজও ভারতের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ (25 শতাংশ) ব্যক্তি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। ভারতে 2022 সালের 1 জানুয়ারি মোট জনসংখ্যা 140 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ভারতে প্রায় 35 কোটি ব্যক্তি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। অর্থাৎ এরা জীবনধারণের জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে বা ক্রয় করতে পারে না। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়কে মানদণ্ড না ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়কেও বিবেচনা করা হচ্ছে। এই মানদণ্ডটিকে বলা হয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multi-dimensional Poverty Index বা MPI)। এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক অনুযায়ী ভারতে 2011 সালে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করত মোট জনসংখ্যার 53.7 শতাংশ। 2018 সালে ,এর পরিমাণ ছিল 27.9 শতাংশ (তথ্যসূত্র : Times of India, 25 নভেম্বর, 2021)। এটি ভারতের পরিকল্পনাগুলির নিদারুণ ব্যর্থতা।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির আর একটি ব্যর্থতা হল বেকার সমস্যা দূরীকরণে ব্যর্থতা। পরিকল্পনা। কালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে কিন্তু কর্মসংস্থান তেমন বাড়েনি। ফলে প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে মোট বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে কর্মসংস্থানের বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়নি। পরিকল্পনা রচয়িতারা ভেবেছিলেন যে, উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে কর্মসংস্থানও বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আসলে মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহৃত হলে মোট উৎপাদন বাড়ে বটে, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ে না। ভারতে তাই কর্মহীন প্রসার (jobless growth) ঘটেছে। মূলধন নিবিড় কৌশল গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও শিল্পের মন্দা। ফলে ভারতে আজ বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দারিদ্র্য ও বেকারি একই সমস্যার এপিঠ-ওপিঠ। দেশের জনগণের একটা

বড় অংশ কর্মহীন বলেই তারা দরিদ্র। 2009-10 সালে ভারতে মোট শ্রমিকের 28.1 শতাংশ ছিল কর্মহীন বা বেকার।

তৃতীয়ত, ভারতের পরিকল্পনাগুলির আর একটি ব্যর্থতা হল সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা বা অদক্ষতা। অনেক সরকারি সংস্থাই রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তাদের লোকসান বা ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে সরকারের পক্ষে আর সেগুলি চালানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ছে, সরকারের আর্থিক চাপ বাড়ছে। ভারত সরকার তাই বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের বেসরকারিগণ ও বিলাগ্নিকরণ শুরু করেছে। উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত সরকারি সংস্থায় এরূপ পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে সেগুলি হ'ল : Hindustan Acronautics Ltd. (HAL), National Thermal Power Corporation (NTPC), Steel Authority of India Limited (SAIL), Gas Authority of India Ltd. (GAIL), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), National Aluminium Corporation Ltd. (NALCO) প্রভৃতি (সূত্র : 2016 সালের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)।

চতুর্থত, ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল দামস্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই লক্ষ্য পূরণ করতেও পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র প্রথম পরিকল্পনার সময় দামস্তর বাড়েনি। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে শেষ দ্বাদশ পরিকল্পনা পর্যন্ত সব পরিক্লপনাতেই দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

পঞ্চমত, পরিকল্পনাকালে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে স্থির আয়বর্গের ব্যক্তিদের প্রকৃত আয় কমেছে। তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। তাছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে আয় বৈষম্য ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বেড়েছে। ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আয় বৈষম্য দূর করা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পরিকল্পনাগুলি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি। পরিকল্পনাকালে দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য বেড়েছে। 2022 সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে ধনীতম 10 শতাংশ ব্যক্তি দেশের জাতীয় আয়ের 50 শতাংশ ভোগ করে। আর এই ধনীদের মধ্যে উপরের 1 শতাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ সবচেয়ে ধনী 1 শতাংশ ব্যক্তি জাতীয় আয়ের 13 শতাংশ ভোগ করে। এই তথ্য থেকে ভারতের প্রকট আয় বৈষম্যের কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

ষষ্ঠত, পরিকল্পনাকালে দেশে কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পের অগ্রগতি বেশি হারে হয়েছে। অর্থাৎ কৃষি ও অ-কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েছে। এভাবে দেশে ক্ষেত্রগত বৈষম্য (sectoral inequality) বেড়েছে।

সপ্তমত, পরিকল্পনাকালে শিল্পের উন্নতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে। দেশের কয়েকটি অঞ্চল শিল্পে উন্নত, আর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিল্পের আদৌ উন্নতি ঘটেনি। এই সমস্ত অনগ্রসর অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটালে এই আঞ্চলিক বৈষম্য কিছুটা কমত। কিন্তু তা রূপায়ণের চেষ্টা বিশেষ হয়নি। ফলে দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিল্পের সুষম বিকাশ ঘটেনি।

সুতরাং ভারতের পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের পাশাপাশি কিছু চরম ব্যর্থতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হল দারিদ্র্য ও বেকারি দূরীকরণে ব্যর্থতা। আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধিও ভারতীয় পরিকল্পনাগুলি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা। এই ব্যথর্তাগুলি পিছনে প্রধান কয়েকটি কারণ হল : রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি, পরিকল্পনা রচনা ও তা রূপায়ণে ত্রুটি প্রভৃতি। ফলে ভারতে রয়ে গেছে দারিদ্র্য, বেকারি, আয়-বৈষম্য প্রভৃতি। দীর্ঘ 65

বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে ভারতে পরিকল্পনার যুগ চলেছে। অথচ বৃহত্তর জনগণের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি দূর করতে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। অনেকেরই তাই ভারতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে শুরু কর 2010-এর দশকের শুরুর দিক থেকে। অনেক অর্থনীতিবিদ তখন থেকেই পরিকল্পনা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। ভারত সরকার এই সমস্ত অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে 2015 সালের 1 জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেয়। এর পরিবর্তে তৈরি করা হয় NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। বলা হয় যে, এই NITI আয়োগ সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক (Policy think-tank) হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ ভারত সরকারকে বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দান করবে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণেও সাহায্য করবে। এছাড়া, সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যগুলিকে সামিল করারও চেষ্টা করা হবে। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির প্রাদেশিক সরকার মিলে এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন নীতি ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তবেই ভারতে যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগড়ে উঠবে বলে সরকার দাবি করেছে। এই NITI আয়োগ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করব।

7.8 পরিকল্পনার সমাপ্তি ও NITI আয়োগ স্থাপন (End of Planning and Establishment of NITI Aayog)

ভারতের পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের পাশাপাশি নানা ব্যর্থতাও রয়েছে। পরিকল্পনাগুলির অন্যতম লক্ষ্যমাত্রাগুলি ছিল : দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারিহ্রাস, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দামস্তরে স্থায়িত্ব, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতি। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে ভারতীয় পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ 65 বছরের (1951-2017) পরিকল্পনার পর ভারতে এখনও জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে, অর্থনীতিতে ব্যাপক বেকারি ও কর্মহীনতা, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় (1960) থেকে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, আয় ও সম্পদ বণ্টনে রয়েছে তীব্র বৈষম্য, সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি প্রভৃতি। পরিকল্পনার অনেক প্রকল্পই যথাসময়ে সমাপ্ত হয়নি। প্রকল্প রূপায়ণের এই ব্যর্থতার জন্য অর্থনীতিবিদেরা প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, প্রকল্পের আয়তন, প্রকল্পের ধরন বা প্রকার প্রভৃতিকে দায়ী করেছেন। অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তীর মতে, তিনটে ব্যবস্থা বা বিষয় ভারতের পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণগত ব্যর্থতার জন দায়ী। সেই তিনটি অবস্থা বা বিষয় হল :

(i) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সঠিক ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে আদৌ দক্ষতা দেখাতে পারেনি।

(ii) অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অনেক দীর্ঘ সময় নিয়েছে।

(iii) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত এজেন্সির মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছে, সেই এজেন্সিগুলির এই সমস্ত কাজে সক্ষমতা এবং অনুপ্রেরণা কোনোটাই ছিল না অথবা থাকলেও তা ছিল অতি সামান্য।

এই সমস্ত অবস্থার ফলে ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির যথাযথ রূপায়ণ হয়নি, সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে। আর এই ব্যর্থতার দরুন ভারতে পরিকল্পনা সম্পর্কে আশাভঙ্গ হয়েছে। বর্তমান শতকের শুরু থেকেই অনেক অর্থনীতিবিদ ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেওয়ার বা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করতে থাকেন। ভারত সরকারেরও

পরিকল্পনা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরিকল্পনার প্রকল্প রূপায়ণের ব্যর্থতা সম্পর্কে সরকারও অনেক অর্থনীতিবিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে থাকে। অবশেষে 2015 সালের। জানুয়ারি ভারত সরকার ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের বদলি বা পরিবর্ত হিসাবে গঠন করে NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। পদাধিকারবলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীই হলেন এর সভাপতি (Chairman)। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনেরও সভাপতি বা চেয়ারম্যান হতেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী 1 জানুয়ারি 2015 থেকে আগস্ট 2017 পর্যন্ত NITI আয়োগের প্রথম সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) ছিলেন অরবিন্দ পানাগনিয়া। 2021 সালের 1 জুন NITI আয়োগের সহ-সভপতি নিযুক্ত হন ড. রাজীব কুমার। এই সহ-সভাপতিই হলেন NITI আয়োগের সর্বপ্রধান কার্যনির্বাহক। ভারতের দ্বাদশ পরিকল্পনা (2012-17) শেষ হয় 2017 সালের 31 মার্চ। এরপর ভারতে আর কোনো পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়নি। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই ছিল ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক রচিত ও রূপায়িত সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

ভারত সরকারের দ্বারা প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, NITI আয়োগ সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক (Policy think-tank) হিসাবে কাজ করবে। সেই অনুযায়ী এই আয়োগ ভারত সরকারকে নানা গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে আসছে। পাশাপাশি, এই NITI আয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যগুলিকে সামিল করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এভাবে নীচের থেকে উপরে সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি শুরু হল। পরিকল্পনা কমিশনের সময় যে পদ্ধতি চালু ছিল তাকে বলা যেতে পারে উপর থেকে নীচে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই পদ্ধতি ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী। এই পদ্ধতিতে রাজ্যগুলি নিজেদের অবহেলিত ভাবতো। বাস্তবিকই, তখন কেন্দ্রীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রাজ্য এবং স্থানীয় স্তরের প্রশাসনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। NITI আয়োগ ব্যবস্থায় সেই পদ্ধতির অবসান ঘটলো। এক্ষেত্রে বলা হল যে, রাজ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, কর্মসূচি ও প্রকল্প শোনার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবে। এটিই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (federal system)।

ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (2014-19) শ্রী অরুণ জেটলি পরিকল্পনা কমিশনের বদলে NITI আয়োগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, 66 বছরের পুরনো পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে এর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। এটি একটি বাড়তি অকেজো (redundant) সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। এধরনের পরিকল্পনা কমিশন পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও আদেশভিত্তিক অর্থনীতি (command economy)। সেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (central planning authority) অর্থনীতির ছোটো বড় সবি বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ভারতের ন্যায় গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই কেন্দ্রীয় স্তরের পরিকল্পনা ব্যবস্থা আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। মি. জেটলি-র মতে, ভারত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এর অঙ্গরাজ্যগুলি উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যগুলির উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। স্বভাবতই তাদের শক্তি ও দুর্বলতাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সুতরাং, তাদের প্রত্যেকের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে হবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে "সবার জন্য একনীতি" (On size fits all) এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। ভারতের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অপ্রযোজ্য। তিনি দাবি করেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে এবং ভারতকে বর্তমানের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে উপযুক্ত প্রতিযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে না। ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় মার খাবে। তাই পুরনো কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা পদ্ধতি তুলে দিয়ে তার বদলে এল NITI আয়োগ, যা অনেকখানি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা।

2015 সালে ভারতসরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনগত ও কৌশলগত উপকরণ (input) প্রদান করবে NITI আয়োগ। আরও বলা হয় যে, পরিকল্পনার যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির দিকে একমুখী প্রবাহ (one way flow)। সেখানে রাজ্যগুলির মতামতের বিশেষ সুযোগ ছিল না। NITI আয়োগ এই ব্যবস্থার বদল ঘটাবে। নতুন ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির প্রকৃত ও নিরন্তর অংশগ্রহণ থাকবে। এভাবে NITI আয়োগ একটি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (co-operative federalism) গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। নতুন এই ব্যবস্থায় স্বীকার করা হয়েছে যে, শক্তিশালী অঙ্গরাজ্যগুলিই শক্তিশালী জাতি গঠন করে (strong states make a strong nation)। তাই অঙ্গরাজ্যগুলিকে সাথে নিয়েই সারা দেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

এছাড়া বলা হয়েছে যে, NITI আয়োগ গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করবে। তারপর এই পরিকল্পনাগুলির সমষ্টিগত (macroeconomic) রূপ নির্ণয় করা হবে সরকারের ধাপে ধাপে উচ্চস্তরে। যারা এযাবৎ সমাজে বঞ্চিত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা যে স্তরের ব্যক্তিরা পায়নি, NITI আয়োগ তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ দেবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের দক্ষ ও কলাকুশলীদের সাহায্য করবে NITI আয়োগ। প্রেস বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান, উদ্ভাবনশক্তি এবং উদ্যোগশক্তির সাহায্য কেন্দ্র হিসাবে NITI আয়োগ কাজ করবে। এই আয়োগ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণের ব্যবস্থা করবে, এদের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রদান করবে। পাশাপাশি, এই উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নও করবে এই NITI আয়োগ।

ভারত এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এর সমস্যাগুলিও বিচিত্র এবং জটিল। ভারতীয় অর্থনীতি যাতে এই সমস্যাগুলির যথাযথ মোকাবিলা করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে NITI আয়োগ। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে NITI আয়োগ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে :

(i) দেশের সমস্ত কর্মক্ষম ব্যক্তির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার। এর জন্য শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ এবং নিয়োগ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(ii) দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রতিটি ভারতবাসীর মর্যাদা ও আত্মসম্মানের সহিত জীবনযাপন।

(iii) লিঙ্গগত, জাতিগত এবং ধনসম্পদভিত্তিক বৈষম্যের প্রতিবিধান।

(iv) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামগুলির সংযুক্তিকরণ।

(v) কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 50 মিলিয়নের বেশি ক্ষুদ্র ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

(vi) দেশের পরিবেশগত সম্পদগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ।

এভাবে গ্রাম ও ব্লকস্তরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে NITI আয়োগ একটি যথার্থ সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। NITI আয়োগকে দক্ষ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় Think-tank হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা জারি রয়েছে। এই আয়োগ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপযুক্ত নীতি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবে। আগে পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় স্তরে এই কাজ করত। সেটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পক্ষেই উপযুক্ত ছিল। ঐরূপ অর্থনীতিতে সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয়ই পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত। সেখানে বাজারি শক্তির কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত। উদারীকরণের নীতি গ্রহণের (1991)

পর ভারতীয় অর্থনীতি এখন অনেকটাই বাজারের শক্তির দ্বারা চালিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই প্রতিটি রাজ্যেরই নিজস্ব এবং ভিন্ন ভিন্ন নীতি-কাঠামো প্রয়োজন। এই নতুন NITI আয়োগ ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির পরিকল্পনা নির্মাণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার অনেক সুযোগ রয়েছে। এভাবে পূর্বের "কেন্দ্র থেকে রাজ্যে" নীতির প্রবাহের পরিবর্তে এসেছে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এখন বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে সুপারিশ করে NITI আয়োগ। অবশ্য তা রূপায়ণের এক্তিয়ার সরকারের। প্রকল্প বা নীতি রূপায়ণের ক্ষমতা NITI আয়োগের নেই। পূর্বের ব্যবস্থার সঙ্গে আরও একটি বড় পার্থক্য আছে। পূর্বের ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় তহবিলের রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের ক্ষমতা পরিকল্পনা কমিশনের ছিল। NITI আয়োগের সেই ক্ষমতা নেই। নতুন ব্যবস্থায় সেই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে ভারতের অর্থ মন্ত্রকের উপর।

NITI আয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। Anand Kalyanaraman এই ব্যবস্থার সম্ভাব্য ভালো ও খারাপ দিক দুটিই উল্লেখ করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, নতুন এই ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির হাতে বেশি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে। ফলে গজদন্ত মিনারে (ivory tower) বসে নীতি নির্ধারিত না হয়ে তা অনেকটা তৃণমূল স্তরেও নির্ধারিত হবে। ফলে নীতিগুলি আরও বাস্তবসম্মত হবে। তবে একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন যে, পরিকল্পনা কমিশন বা নীতি আয়োগ যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আসল কাজ হল নীতি রূপায়ণের। ভারতে উন্নত ও বিশদে বিস্তারিত নীতির অভাব নেই; সমস্যা হল সেগুলির গুরুত্ব দিয়ে রূপায়ণ। তাছাড়া, কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রকের দ্বারা একতরফা কেন্দ্রীয় তহবিল বণ্টনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে পারে; বিশেষত যদি কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে। সেজন্যই অনেক রাজ্য (বিশেষত অ-বিজেপি দল দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলি) এরূপ একতরফা তহবিল বণ্টনের নীতির বিরোধিতা করেছে। তাদের আশঙ্কা, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তহবিল বণ্টনে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক (discriminatory) আচরণ করবে। তাই এই রাজ্যগুলি NITI আয়োগের মাধ্যমে তহবিল বণ্টনের দাবি তুলেছে। সেক্ষেত্রে তারা নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবে। আবার, পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক রাজ্য অভিযোগ করেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথা ও রীতিনীতি মানছে না। রাজ্যের মতামত না নিয়েই কেন্দ্র একতরফাভাবে অনেক কিছু নির্ধারণ ও ঘোষণা করছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, অনেক কেন্দ্রপোষিত স্কিমের (Centrally sponsored scheme) বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার এক তরফাভাবে ছাঁটাই করেছে অথবা বরাদ্দ অর্থ প্রদান করতে অনেক দেরি করছে। অনেক রাজ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অধিক অর্থ দাবি করে আসছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যাপারে আরও স্বচ্ছতা দাবি করছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার বাজার অর্থনীতির উপর বড় বেশি জোর দিয়েছে। এর ফলে গুজরাতের ন্যায় বড় ও শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি অধিক আর্থিক সুবিধা পাবে এবং আসামের ন্যায় ছোটো ও পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আসামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগই অনুরূপ আশঙ্কা ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমরা বলতে পারি যে, সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাস্তবে কতখানি রূপায়িত হবে তা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। ভারতীয় সংবিধান রাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দান করেছে। আমাদের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও তাতে এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক বেশি। তাই ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কতখানি গড়ে উঠবে তা অনেকখানি নির্ভর করছে কেন্দ্রীয়

সরকার এবিষয়ে কতটা আন্তরিক (serious) তার উপর। পরবর্তী এককে (একক ৮) NITI আয়োগের উদ্দেশ্য, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্ক কিছুটা বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

7.9 সারাংশ (Summary)

১. ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে। 1951 সাল থেকে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় এবং 2017 সালের 31 মার্চ তা শেষ হয়। এই সময়কালে ভারত সরকার 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত করে। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের মূলযুক্তি হল : (i) সাধারণ জনগণের দারিদ্র্য দূর করে দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি করা (ii) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন, (iii) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা, (iv) মূল ও ভারী শিল্পের প্রসার, (v) সাধারণ জনগণের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, (vi) বেকার সমস্যা দূর করা, (vii) শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, (vii) বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোয় কাম্য— পরিবর্তন আনা এবং (viii) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

২. ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমভাগে রয়েছে সর্বভারতীয় স্তরে কাম্য উদ্দেশ্যসমূহ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, দামস্তরে স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের সুবিধার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, কৃষির উন্নয়ন এবং শিল্পের উন্নয়ন। তৃতীয় ভাগে রয়েছে সর্বভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— কৃষি উপকরণের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রের উপকরণগুলির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ ও হ্রাস করা। অবশ্য এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলির পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূর করা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

৩. ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— (i) এগুলি সামগ্রিক পরিকল্পনা, আংশিক পরিকল্পনা নয়। (ii) পরিকল্পনাগুলি ছিল মিশ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, (iii) ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি ছিল নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা; সেগুলি আদেশাত্মক পরিকল্পনা নয়। (iv) ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা—সংশোধনমূলক পরিকল্পনা নয়। (v) ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা— একনায়কতান্ত্রিক পরিকল্পনা নয়।

৪. ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান সাফল্যগুলি হল : (i) পরিকল্পনাকালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি, (ii) খাদ্যে প্রায়-স্বয়ম্ভরতা, (iii) মূল ও ভারী শিল্পের উন্নতি, (iv) পরিকাঠামোর উন্নতি, (v) সঞ্চয় ও

বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, (vi) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বৈচিত্র্য, (vii) সরকারি ক্ষেত্রের প্রসার প্রভৃতি।

৫. ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা

ভারতীয় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতাগুলি হল— (i) ব্যাপক দারিদ্র্যের উপস্থিতি, (ii) ক্রমবর্ধমান বেকারি, (iii) দামস্তরে বৃদ্ধি, (iv) সরকারি ক্ষেত্রের অদক্ষতা, (v) নিম্ন উন্নয়নের হার, (vi) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি, (vii) শিল্পের অসম বিকাশ প্রভৃতি।

৬. পরিকল্পনার সমাপ্তি ও NITI আয়োগ স্থাপন

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি অনেক সময়ই তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। অনেক প্রকল্পই নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়নি। অনেকে তাই ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে বা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেন। অনুরূপ চিন্তা করে ভারত সরকার 2015 সালে 1 জানুয়ারি ভারতে পরিকল্পনা কমিশনের বদলে NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ স্থাপন করে। এই আয়োগ বর্তমানে ভারত সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে। এর লক্ষ্য হল সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যগুলিকে সামিল করা। উন্নয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আয়োগ নীচের স্তর থেকে কাজ শুরু করে উপরের স্তরে আসবে। এর পূর্বে চালু ছিল উপরের স্তর থেকে নীচে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি। এতে রাজ্য বা তার নীচের স্তরের সংস্থাগুলির মতামত গুরুত্ব পেত না। কেন্দ্রীয় স্তরে নেওয়া সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। ফলে ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গুরুত্ব পেত না। সরকারের দাবি যে, এই নতুন NITI আয়োগ ব্যবস্থা সেই ত্রুটি দূর করবে। এভাবে আগের 'কেন্দ্র থেকে রাজ্যে' নীতির বদলে এল 'রাজ্য থেকে কেন্দ্রে' নীতি প্রণয়ন। এটিকে বলা যেতে পারে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অবশ্য NITI আয়োগ শুধু বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে সুপারিশ করবে। সেগুলি রূপায়ণের এক্তিয়ার সরকারের।

7.10 অনুশীলনী (Exercise)

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer-type Questions)**

১. ভারতে পরিকল্পনার যুগ কোন্ সালে শুরু হয়?
২. ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি সাফল্য উল্লেখ করো।
৩. ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি প্রধান ব্যর্থতা কী কী?
৪. NITI আয়োগের পুরো নাম কী?
৫. ভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
৬. ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।

■ **মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium Answer-type Questions)**

১. ভারতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।
২. ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি সামগ্রিক না আংশিক পরিকল্পনা?
৩. ভারতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি সাফল্য উল্লেখ করো।

৪. ভারতীয় পরিকল্পনাগুলি কি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, নাকি সংশোধনমূলক পরিকল্পনা?

৫. ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতাগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

৬. ভারতে পরিকল্পনা কমিশনের বদলে NITI আয়োগ স্থাপন করা হয় কেন?

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long Answer-type Questions)**

১. ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

২. ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করো।

৩. ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৪. ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের দিকগুলি উল্লেখ করো।

৫. ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতাগুলি পরিস্ফুট করো।

৬. ভারতে NITI আয়োগ স্থাপনের যৌক্তিকতা বিচার করো।

7.11 গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : ভারতীয় অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

২. Kapila, Uma (2017-18) : Indian Economy, Academic Foundation, New Delhi.

৩. Puri, V. K. and S. K. Misra (2020) : Indian Economy, Himalaya Publishing House, Mumbai.

৪. Datt, Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : Indian Economy, S. Chand and Company Limited, New Delhi.

৫. সেখ সেলিম (2011) : ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

৬. রায়, স্বপন কুমার ও জয়দেব সরখেল (2018) : ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

একক-8 ❑ 'নীতি' আয়োগ

গঠন

8.1 উদ্দেশ্য

8.2 প্রস্তাবনা

8.3 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

8.4 নীতি আয়োগ সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি

8.5 নীতি আয়োগের উদ্যোগসমূহ

8.6 নীতি আয়োগের সদস্যবৃন্দ

8.7 নীতি আয়োগের বৈশিষ্ট্যসমূহ

8.8 নীতি আয়োগের কার্যাবলি

8.9 কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন

8.10 নীতি আয়োগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে পার্থক্য

8.11 নীতি আয়োগের দায়িত্ব

8.12 নীতি আয়োগের দায়িত্ব সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ

8.13 নীতি আয়োগের লক্ষ্য

8.14 সারাংশ

8.15 অনুশীলনী

8.16 গ্রন্থপঞ্জি

8.1 উদ্দেশ্য (Objectives)

NITI AAYOG হচ্ছে একটি নীতি নির্ধারক কমিশন যার প্রকৃত নাম হচ্ছে National Institution for Transforming India. এটি ভারত সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে একটি সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এবং নোডাল এজেন্সী যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কো-অপারেটিভ ফেডারিলিজম-এর অনুঘটকের কাজ করে যেখানে রাজ্য সরকারগুলির অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ভূমিকা থাকবে। এই নীতি আয়োগের উদ্যোগের মধ্যে পড়ে "15 বছরে রোড ম্যাপ", 7 বছরের লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল এবং এ্যাক্শান প্ল্যান।" .AMRUT, ডিজিটাল ভারত, অটল উদ্ভাবন মিশন, চিকিৎসা শিক্ষায় সংস্কার, কৃষি সংস্কার (মডেল ল্যান্ড লিজিং আইন, কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনে বিপণন কমিটি আইন, কৃষিজ বিপণন এবং কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সংস্কার সূচক যা রাজ্যগুলির র‍্যাঙ্ক নির্দেশ করে)। এছাড়াও রাজগুলির স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের কার্যকলাপে সূচক শিক্ষা এবং জল প্রকল্প নীতি

আয়োগের নীতি নির্ধারণের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির যৌক্তিকতা নির্ণয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের উপগোষ্ঠী, স্বচ্ছভারত অভিযানে মুখ্যমন্ত্রীদের উপগোষ্ঠী, উৎকর্ষতার উন্নয়নে মুখমন্ত্রীদের উপগোষ্ঠী এবং কৃষি ও দরিদ্রর ব্যাপারে টাস্ক-ফোর্স গঠন এবং পরিশেষে ভারতের রূপান্তর করণের ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণামূলক আলোচনা।

8.2 প্রস্তাবনা (Introduction)

১৯৫০ সালে গঠিত ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের মূল উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

১। আর্থিক প্রগতির হার দ্রুততর করতে সমাজতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়া।

২। নিয়োগের প্রসার,

৩। আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা। এবং

৪। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রতিহত করা।

এখন আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলির কোনোটিই সফল হতে পারে নি। তা প্রকাশ পায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলির ভিত্তিতে।

পরিকল্পিত উন্নয়নের হারে পৌঁছান বা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে যে হারে উন্নতি হওয়া উচিত ছিল সেই তুলনায় উন্নত, এমনকি অনেক স্বল্পোন্নত দেশে বর্তমান উন্নয়নের হারের তুলনায় বিগত ছয় দশকের উন্নয়নের হার যথেষ্ট হয় নি।

অতি সাধারণ এক ব্যক্তির কাছে পরিকল্পনা সার্থক মনে হবে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পরিকল্পনাকালে মজুরি দ্রব্যের মাথাপিছু জোগান আদৌ বাড়ে নি। আবার শিল্পের অগ্রগতি এবং শিল্প কাঠামোয় বৈচিত্র্য, সমাজসেবা ও সাক্ষরতার উন্নতি ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় অর্থনীতির মূল কাঠামোতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। তাছাড়া সরকার ক্ষেত্রে বহুমুখী সম্প্রসারণ ঘটলে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় নি। ভূমিসংস্কার কার্যক্রম রূপায়িত হয়েছে ঠিকই কিন্তু কৃষকদের সত্ত্বে স্থায়িত্ব অসে নি এবং প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি আসে নি। আর একট পরিতাপের বিষয় হচ্ছে 2009 সালে জাতিপুঞ্জের Human Development Report অনুযায়ী পৃথিবীর 135টি দেশে দারিদ্র্যসূচক বিন্যাসে ভারতের র‍্যাঙ্ক বা মানক্রম হল 88 আবার ভারতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত ব্যর্থতা নিহিত হয়েছে বেকার সমস্যা সমাধানের শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে। পরিকল্পনাকালে অনুন্নত ও উন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে অসমতার মাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে। পরিশেষে বলা যায় যে, পরিকল্পনাকালে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় অর্থনীতি অনেকাংশেই ব্যর্থ।

পরিকল্পনা কমিশনগুলি উপরিউক্ত ব্যর্থতার কারণেহ 2015 সালে ক্ষমতাসীন, NDA সরকার পরিকল্পনা কমিশনকে বাতিল করে নীতি আয়োগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নীতি আয়োগ হচ্ছে ভারতকে রূপান্তরিত করার জন্যে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, National Institution for Transforming India বা সংক্ষেপে NITI আয়োগ।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিশনগুলির ব্যর্থতার কথা মাথায় রেখে এই নীতি আয়োগ গঠিত হয়। ভারত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ এবং এর রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব শক্তি এবং দুর্বলতা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নত হয়েছে

তাই ''One size fits all'' ধারণাটি এখন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অপ্রয়োজনীয়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই ধারণাটি ভারতকে কখনোই প্রতিযোগীতা মুখী করবে না। তাই নীতি আয়োগের মূল ভূমিকাই হচ্ছে ভারতকে সামাজিক—অর্থনৈতিক দিক থেকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যাতে পূর্ববর্ণিত পরিকল্পনা কমিশনের ব্যর্থতাগুলি থেকে বেরিয়ে এসে ভারত একটি প্রতিযোগীতামুখী উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

8.3 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Bockground)

২০১৪ সালের ২৯ মে স্বাধীন মূল্যায়ণ অফিস (Independent Evaluation Office) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট জমা দেন যাতে পূর্বতন পরিকল্পনা কমিশনকে বাতিল করে একটি ''নিয়ন্ত্রণ কমিশন'' গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

২০১৪ সালের ১৩ই আগস্ট কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন উচ্ছেদ করেন, যার পরিবর্তে একটি জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল (National Advisory Council of India) গঠিত হয়। ২০১৫ সালে ১ জানুয়ারি এই ব্যাপারে একটি ক্যাবিনেট প্রস্তাবনা পাশ করা হয় যাতে পরিকল্পনা কমিশন বাতিল হয়ে একটি নতুন সংস্থা NITI Aayog (National Institution for Transforming India) গঠিত হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১ জানুয়ারি ২০১৫ সালে নীতি আয়োগ গঠনে ঘোষণা করেন। এই নীতি আয়োগের প্রথম মিটিংটি ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে সংঘটিত হয়।

তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলী নীতি আয়োগের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বক্তব্যটি রাখেন, ''৬৫ বছরের পরিকল্পনা কমিশন একটি অপ্রয়োজনীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এটি একটি এককেন্দ্রীক কমান্ড অর্থনীতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত। যার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নেই। ভারত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ এবং এর রাজ্যগুলি তাদের শক্তি এবং দুর্বলতার নিরিখে বিভিন্ন মাত্রায় অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত। এই প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি 'one size fits all' ধারণাটি সম্পূর্ণ অকেজো। এটি ভারতকে কখনোই বিশ্বায়ণের অর্থনীতিতে প্রতিযোগীতামুখী করতে পারবে না। ''The 65 year old Planning Commission had become a redundant organization. It was relevant in a command economy structure, but not any longer. India is a diversified country and its states are in various phases of economic development along with their own strengths and weak nesses. In this contest, a 'one size fits all' approach to economic planning is obsolete. It cannot make India competitive in today's global economy.''

8.4 নীতি আয়োগ সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি (Goverment Approach Towards NITI Aayog)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় নীতি আয়োগ একটি নতুন উদ্যোগ নেয় কাকে বলা হয় NITI Lectures : Transforming India এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বখ্যাত নীতি নির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, প্রশাসকদের ভারতে আমন্ত্রিত করে তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞতা ইত্যাদিকে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কাজে লাগানো এবং এই ব্যাপারে ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ঘটনো। এই উদ্যোগটি হবে বিভিন্ন বক্তৃতার

সমন্বয়ে যার প্রথম বক্তৃতা পরিবেশন করবেন সিঙ্গাপুরের উপপ্রধানমন্ত্রী Tharman Shanmugaratman। তিনি যে বিষয়টির ওপরে বক্তব্য রাখেন সেটি হচ্ছে ''India and the global economy'' যা উপস্থাপিত হয় নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে। প্রধানমন্ত্রী এই বক্তৃতাগুলির পশ্চাতে যে বক্তব্য রাখেন তার মূল বিষয়টি ছিল ভারতের দ্রুত রূপান্তরে ক্রমিক বিবর্তন নয়।

2017 সালের 31 শে আগস্ট নীতি আয়োগ একটি State Statistics Hand Book প্রকাশিত করে যাতে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলির পরিসংখ্যা তথ্য উপস্থাপিত করা হয়। পরবর্তীকালে রাজ্যগুলির পরিসংখ্যান তথ্যগুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় বিভাজিত করে এই Hand Book টিকে রাজ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান তথ্যের একটি ওয়ান স্টপ ডেটাবেস তৈরি করা হয়।

8.5 নীতি আয়োগের উদ্যোগসমূহ (Various steps of NITI Aayog)

নীতি আয়োগ যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে e-governance-এর ক্ষেত্রে ব্লক চেন ব্যবহার করা এবং প্রযুক্তি স্ট্যাককে India চেনে রূপান্তরিত করা। ইন্ডিয়া চেন হচ্ছে নীতি আয়োগের উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট একটি প্রকল্পযাতে দেশব্যাপী ব্লক চেন নেটওয়ার্ক প্রসারিত করা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 2016 সালে World Economic Forum-এর দেওয়া বক্তব্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে— Artificial Intelligence machine learning, internet of things, block chain and big deta hold potential to late India to new heights.

উদ্দেশ্য হচ্ছে India Chain-কে India Stack-এর সঙ্গে সংযোজিত করা বা ডিজিটাল পরিকাঠামোকে নির্দেশ করে, যে পরিকাঠামো আধার প্রকল্পটির ভিত্তি। নীতি আয়োগের উদ্যোগের ফলে Block Chain systemটি দ্রুততর চুক্তি, বে-আইনি লেনদেনকে বাধাপ্রাপ্ত করা এবং কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়ার ব্যাপারে উৎকর্ষতর সাহায্য করা। এছাড়া নীতি আয়োগ একটি Job portal-এর উদ্ভাবন করছে যাতে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ আরও বেশি করে হয়, যে শ্রমিকগণ দেশব্যাপী লক ডাউনের সময় ঘরে ফিরে গেছে।

এছাড়া অন্যান্য উদ্যোগগুলি হল নিম্নরূপ—

Student Entrepreneurship Programme (SEP) 2019 সালে ছাত্রদের উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রোগ্রাম (SEP) 1.0 চালু করা হয় আবার 2020 সালে (SEP) 2.0 চালু করা হয়। এই SEP 2.0 2020 সালে চালু হওয়ার ফলে Atal Tinkering Lab (ATL)-এর ছাত্রদের উদ্ভাবনগুলিকে শেষ উৎপাদনে রূপান্তরিত করা।

Free tech driven learning programmes : 2021 সালের সেপ্টেম্বর মাসে নীতি আয়োগ Byju-র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ভারতের ১১২টি জেলার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চাকাঙ্খী ছাত্রদের বিনাব্যয়ে প্রযুক্তি নির্ভর পঠনপাঠনে ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

8.6 নীতি আয়োগের সদস্যবৃন্দ (Members of NITI Aayog)

নীতি আয়োগ নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির মারফত গঠিত হয়েছে—

(ক) সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপালের সমন্বয়ে গঠিত একটি Governing Council.

(খ) বিভিন্ন রাজ্যের মুখমন্ত্রী এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উপরাজ্যপালদের নিয়ে একটি আঞ্চলিক কাউন্সিল (Regional Council) গঠিত হয়েছে যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক রাজ্যে সমস্যাগুলি দেখে।

(গ) পূর্ণসময়ের একটি সাংগঠনিক ফ্রেম ওয়ার্ক গঠিত হয়েছে যাতে একজন ভাইস চেয়ারপার্সন, চারজন পূর্ণসময়ের সদস্য, প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে দুজন আংশিক সময়ের সদস্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণ্ডল থেকে চারজন এক্স অফিসীয় সদস্য, ভারত সরকারের সচিব র‍্যাঙ্কের একজন চীফ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার থাকবেন যার কাজ হচ্ছে প্রশাসন এবং সচিবালয়ের প্রতি দেখভাল করা।

(ঘ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিয়েও একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগের চেয়ার পার্সন এবং তাছাড়া যেসমস্ত পদগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে ভাইস চেয়ারপার্সন, এক্স-অফিসীয় মেব্বারস, বিশিষ্ট আমন্ত্রিত ব্যক্তিগত (special invitees), পূর্ণ সময়ের সদস্যগণ, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (CEO), এবং উল্লিখিত গভর্নিং কাউন্সিল।

8.7 নীতি আয়োগের বৈশিষ্ট সমূহ (Features of NITI Aayog)

নীতি আয়োগ বর্তমানে একটি State of the art সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে, এর ফলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং নৈপুণ্য সহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা, উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করছে। এছাড়া সরকারকে strategic নীতি নির্ধারণে সহায়তা করছে এবং আপদকালে সমস্যগুলির দেখভাল করছে। এই নীতি আয়োগের সঙ্গে একটি সংশ্লিষ্ট অফিস কাজ করছে যার নাম Development Monitoring and Evaluation Organisation (DMEO) একটি flagship উদ্যোগ, Atal Innovation Mission (AIM) এবং একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা সেটি হচ্ছে National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) যা নীতি আয়োগকে সহায়তা করে।

8.8 নীতি আয়োগের মূল কার্যাবলি (Funtions of NITI Aayog)

নীতি আয়োগের মূল কার্যাবলিকে আমরা মূলত চারভাগে ভাগ করতে পারি—

(ক) পলিশি এবং প্রোগ্রাম ফ্রেমওয়ার্ক

(খ) কো অপারেটিভ ফেডারেলিজম

(গ) মনিটরিং এবং মূল্যায়ন

(ঘ) থিংক ট্যাংক এবং নলেজ ও ইনোভেশন হবে।

নীতি আয়োগের বিভিন্ন কার্যাবলি এবং তার রূপায়ণের জন্যে নিম্নলিখিত ভার্টিকাল এবং সেল (Vertical and Cells) আছে।

Vertical / Cells

প্রশাসন কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এ্যাসপিরেশনাল জেলা ভিত্তিক প্রোগ্রাম সেলে কমিউনিকেশন এবং সোসাল মিডিয়া সেল,

ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং এ্যানালাইসিস অগ্রাধিকারযুক্ত প্রযুক্তি

অর্থনীতি এবং আর্থিক সেল (Economics and Finance cell)

শিক্ষা (Education)

গভার্নেন্স এবং গবেষণা,

গভর্নিং কাউন্সল সেক্রেটারিয়েট এবং কো-অর্ডিনেশন

শিল্প—(1) Industry—(1)

Industry—(2)

পরিকাঠামোগত সংযোগ (Infrastructure connectivity)

পরিকাঠামো শক্তি (Infrastructure energy)

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ দীপ উন্নয়ন (Natural Resources and Environment and Island Development)

প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন এবং ম্যানেজমেন্ট ডিভিসান (Project Appraisat and Management Division)

সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশীদার (Publi & Private Partnership)

গ্রামোন্নয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি

সোসাল জাস্টিস এবং এমপাওয়ারমেন্ট এবং ভল্যানটারী এ্যাকশন সেল।

সামাজিক ক্ষেত্র— (1) Social Sector-1

উৎকর্ষতা উন্নয়ন, শ্রম এবং কর্মসংস্থান, নগরোন্নয়ন,

সামাজিক ক্ষেত্র—(2) Social Sector–2 (স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, নারী ও শিশু কল্যাণ)

রাজ্য অর্থনীতি এবং সমন্বয় (State finances and Co-ordination)

স্থায়ী উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্য (substainable Development goals)

জলসম্পদ/প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চয়ী যোজনা/ভূমিসম্পদ

8.9 কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন (Distribution of Power betwen the Centre and the States)

ব্যারি স্টয়াইন গাস্ট এবং তার সহলেখক (ক্যারিগা ও ওয়াইন গাস্ট 2001) উন্নয়নশীল দেশের জন্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন রাজস্ব ক্ষমতা ও ভাগাভাগি পদ্ধতি পরিচালনা সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ জনিত প্রভাব। কিছুটা অতি সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে আমরা বিষয়গুলিকে

দুইপ্রান্তে ভাগ করতে পারি। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিক ফিনান্সে রাজ্যগুলির এক্তিয়ারভুক্ত আয় জানা, এটা ধরে নিয়ে ট্যাক্স এ্যাসাইনমেন্ট এবং হস্তান্তরের ইনসেন্টিভের দিক দেখা হয়। আর বিকাশ প্রেক্ষিতটি বা গ্রোথ পার্সপেক্টিভ আয় বাড়ানোর জন্যে (যেমন সরকারি বা বেসরকারি লগ্নি মারফত) ইনসেন্টিভ কর ও হস্তান্তর ব্যবস্থা প্রভাব খতিয়ে দেখে।

ক্যারিগা ও ওয়াইন গাস্ট একটি মডেল ব্যবহার করেছেন যাতে সরকারের নীতি নির্ধারকরা করভিত্তিক চৌহদ্দি বাড়াতে পারেন। বিকাশ বৃদ্ধিকারী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের প্রান্তিক রিটেনশনের হার বেশি। ভারতের ক্ষেত্রে এই যুক্তি ফিনান্স কমিশনের হস্তান্তর সূত্র সংশোধনে সমর্থন করতে পারে। এমনকি বিভিন্ন স্তরের সরকারের কর বসানোর এক্তিয়ার হেরফেরের মাধ্যমে উঁচু থেকে নীচে সম্পদ হস্তান্তরের মাত্রা কমানো যায়। ভারতের হস্তান্তরের অন্যান্য মাধ্যমের ভূমিকা ও বিধিব্যবস্থা নিয়ে নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করার খোরাক মেলে এতে।

ফিনান্স কমিশন নীতি, আয়োগ এবং মন্ত্রকগুলির মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্য হস্তান্তরের দিকটি এক সংযুক্ত কাঠামোর মধ্যে দেখার দিকে জোড় দিয়েছেন সিং ও শ্রীনিবাসন (2013)। ভারতের রাজস্ব যুক্তরাষ্টীকতা নিয়ে আলোচনায় বারংবার উঠে আসছে। বেশী জটিলতার মধ্যে না ঢুকে সরলভাবে বলা যায় যে হস্তান্তর তিন ধরনের—ফিনান্স কমিশনের দ্বারা নির্ধারিত চলতি রাজস্ব, লগ্নির জন্য মূলধন হস্তান্তর কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে চলা বা স্পনসরড প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলি চালানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সংঘাত বাধার উপক্রম হত। বরাদ্দ আর খরচের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ঘটত মতপার্থক্য।

8.10 নীতি আয়োগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between NITI Aayog and Planning Commission)

(ক) সংগঠন : পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারপার্সন, সদস্য সচীব এবং পূর্ণ কালীন সদস্য ছিলেন। সচীব বা সদস্যসচীব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হতেন।

নীতি আয়োগের সচীব পদমর্যাদা সিইও এবং ভাইস-চেয়ারপার্সনের নতুন পদ হয়েছে। এছাড়াও পূর্ণকালীন সদস্য এবং দুইজন আংশিক সময়ের সদস্য থাকবেন। চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। সিইও সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(খ) পরিকল্পনা : পরিকল্পনা কমিশন পাবলিক সেক্টরের সম্পদের সাথে সরকারের জন্য 'স্টপ-ডাউন' পরিকল্পনার জন্যে যায়।

বিশ্বায়িত বিশ্বের সাথে একীভূত বাজার অর্থনীতিতে নীতি আয়োগ জাতীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করে।

(গ) রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক : পরিকল্পনা কমিশন ছিল একটি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এতে রাজ্য সরকারের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। রাজ্যগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কোনো কাঠামোগত ব্যবস্থা ছিল না।

নীতি আয়োগ রাজ্য সরকার গুলির সাথে অংশীদারি প্রদান করে যাতে সময়ভিত্তিক যেড্রেবলিজম উন্নত হয়। উন্নীত হয়। এটা রাজ্যগুলির সাথে কাঠামোগত এবং নিয়মিত সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি প্লাটফর্ম সরবরাহ করে।

(ঘ) অর্থায়ন : পরিকল্পনা কমিশন গঠনের ফলে ফিনান্স কমিশনের ভূমিকা ব্যাপকহারে হ্রাস পায়। তহবিল বরদ্দ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হত।

কিন্তু তহবিল বরাদ্দে নীতি আয়োগের কোনো ভূমিকা নেই। রাজ্যগুলিকে করের ভাগ, সিএসএসে তহবিল বরাদ্দ এবং রাজ্য পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সহায়তায় সিদ্ধান্ত নেবে অর্থমন্ত্রক।

(ঙ) সংবিধান এবং প্রতিবেদন : পরিকল্পনা কমিশনটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপরাজ্যপালদের জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার কাছে রিপোর্ট করত।

কিন্তু নীতি আয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপরাজ্যপাল রয়েছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বক্তব্য রাখা যায়— (১) পরিকল্পনা কমিশনের মতো এটিও একটি অসাংবিধানিক সংস্থা যা সংসদের কাজে দায়ী নয়।

২। রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ না করে পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেওয়া হয়েছে যা যথেষ্ট প্রশ্নসাপেক্ষ।

৩। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন উপরাজ্যপালগণ, মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা নয়। এটা সেফেরলিজমের নীতির পরিপন্থী।

৪। কল্যাণমূলক প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দ প্রভাবিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, লিঙ্গবাজেটে ২০ শতাংশ হ্রাস হয়েছে।

8.11 নীতি আয়োগ দায়িত্ব : (Responsibilities of NITI Aayog)

১. কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে চলা প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ ও পরিচালনা ব্যয়ে সম্পূর্ণ ভার কেন্দ্রের নেওয়া উচিত। এইসব প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব কেন্দ্র বা রাজ্য যার হাতেই থাক না কেন, এখন এইসব প্রকল্পের বিনিয়োগ খাতে খরচের আংশিক জোগান দেয়। কেন্দ্র কেন এতে পরিচালনা ব্যয় বহন করে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। এরফলে প্রকল্প শুরু হয় এবং সম্পন্ন হয়। কিন্তু একসময়ে পরিচালন ব্যয় রাজ্যের কাঁধে চাপলে প্রকল্পের সদ্ব্যবহার পুরোপুরি হয় না কারণ টাকা জোগাতে রাজ্যের ব্যর্থতা। কেন্দ্র টাকাকড়ির সব দায়িত্ব নিলে এই অপচয় রোখা যাবে।

২. কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের জন্য সরকারি বিনিয়োগ তহবিলের কাজ করতে নীতি আয়োগ। এর শেয়ার গ্রহীতা হবে কেন্দ্র ও রাজ্য। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক লাভালাভ এবং অর্থসংস্থানের সম্ভাব্যতা তহবিল খতিয়ে দেখবে।

৩. নিজের ভূমিকা প্রসারিত করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীকতার অন্যান্য বহু বিন্যাস বা কাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে নীতি আয়োগকে।

ওয়াইগাস্ট (1993) মার্কেট প্রিজার ভিং ফেডেরালিজম (বাজারে একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতখানি হস্তক্ষেপ করতে পারে তার সীমা) এর ধারণা প্রবর্তন করেন। এই ধারণাটি পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেন।

(ক) নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের সরকার (যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি)।

(খ) স্থানীয় অর্থনীতির মূল কর্তৃত্ব আঞ্চলিক সরকারের।

(গ) জাতীয় সরকারের এক্তিয়ারে থাকবে এক সাধারণ জাতীয় বাজার।

(ঘ) আঞ্চলিক সরকারের বাজেটে কঠোর নিয়মাবিধি।

(ঙ) **রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বণ্টন :** আগে সহযোগীতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের ধারণায় জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের একসঙ্গে কাজ করা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্তৃত্ব থেকে পারস্পরিক মঙ্গলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে রাইকার (1964) এর চিন্তাভাবনায় যুক্ত রাষ্ট্র হচ্ছে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার বৃদ্ধির পক্ষে সাংবিধানিক আদান প্রদান বা দর কষাকষি। এক বিকল্প ধারণায় জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাজনিত সুফলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

8.12 নীতি আয়োগের দায়িত্ব সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ (Some Recommendations the Responsibilities of NITI Aayog)

বাজারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার সঠিক গণ্ডী বেঁধে দেওয়ার দিকে এমপিএফ জের দিয়েছে। দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ কিন্তু উচ্চস্তরের যাবতীয় সরকারি তত্ত্বাধান হঠানোর কথা বলে না। জাতীয় পর্যায়ে মঙ্গলজনক কিছু অধিকারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ এড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক স্তরে সেই সংক্রান্ত ব্যবস্থার দিকে নজর দিতেই পারে। কিন্তু সরকারি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ মানে এই নয় যে তা স্থানীয় প্রভাবশালীরা কুক্ষিগত করে ফেলবে এবং অন্যরা বঞ্চিত হবে। স্বাধীনতার পর এমনটাই আশংকা ছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে নতুন নীতি আয়োগকে সর্তকতার সঙ্গে নিজের ভূমিকা ঠিক করতে হবে। দেখতে হবে যে নেহাৎ দরকার ছাড়া ভারতের অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ যেন না করা হয়। আয়োগ আঞ্চলিক সরকারের ক্রয়ক্ষমতা সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ এবং কেন্দ্র থেকে আঞ্চলিক সরকারের কাছে হস্তান্তরের বিষয় সংহত ও সুষ্ঠু করতে পুনরায় চিন্তাভাবনা করার গোড়াপত্তন করতে পারে। এই ধারণামূলক সংস্কার কর্মসূচি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও তা অর্থনৈতিক বিকাশবৃদ্ধি ও শাসনের মানোন্নয়নে খুবই কাজে লাগবে।

যুক্তরাষ্ট্রীকতাকে সফল করতে শুধুমাত্র কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যে শাসনক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যথেষ্ট নয়। ভারতের মতো গণতন্ত্রে রাজনীতি ও অর্থনীতির মিশেল থাকবেই। স্থায়ী আর্থিক বিকাশের জন্যে দেশে যে সত্যিকারের রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রীকতার প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইকাজে অধুনালুপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের সাফল্য, ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে, অর্থনৈতিক বিকাশের মানোন্নয়নে নীতি আয়োগ যে কি ভূমিকা নেবে তার পুরোটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। তবে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকাকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং বাজার ব্যবস্থাকে সুস্থিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সর্বজনগ্রাহ্য।

এতক্ষণ আমরা নীতি আয়োগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা নীতি আয়োগের মূল লক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

8.13 নীতি আয়োগের লক্ষ্য (Goals of NITI Aayog)

(ক) বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটা জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা।

(খ) কোঅপারেটিভ ফেডেলিজমের আলোকে নিয়মিতভাবে রাজ্যগুলিকে নিয়ে কাজ করা যাতে শক্তিশালী রাজ্যের দ্বারাই একটি শক্তিশালী জাতি বা রাষ্ট্র গঠিত হয়।

(গ) গ্রামীণ স্তরে সঠিক পরিকল্পনা করে তার সামগ্রিক রূপটিকে বৃহত্তর সরকারি স্তরে রূপায়িত করা।

(ঘ) সমস্ত নীতিগুলি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রূপায়িত করতে হবে।

(ঙ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সমাজে যে সমস্ত শ্রেণী বা গোষ্ঠী সেরকমভাবে সুবিধা পাবে না তাদের দিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নজর দিতে হবে।

(চ) কৌশলগতভাবে দীর্ঘকালীন পোগ্রাম এবং উদ্যোগ নেওয়া এবং সেগুলির সঠিক মূল্যায়ন করা। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে উদ্ভাবনমুখী উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তা সঠিক সংশোধন করা হবে।

(ছ) আসল স্টেক হোল্ডার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমভাবাপন্ন থিংক ট্যাঙ্ক এবং শিক্ষামূলক ও নীতিনির্ধারণকারী গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠাণগুলিকে উপদেশ দেওয়া এবং এদের মধ্যে আদান প্রদানকে উৎসাহিত করা।

(জ) শিক্ষা, দক্ষতা, উন্নয়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ভারতের জনসংখ্যা তাত্ত্বিক ল্যভ্যাংশ লাভ এবং যুব, পুরুষ ও মহিলাদের সম্ভাবনা উপলব্ধি।

(ঝ) দারিদ্র দূরীকরণ এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্যে মর্যাদা ও আত্মসম্মান নিয়ে জীবন যাপনের সুযোগ করে দেওয়া।

(ঞ) লিঙ্গ পক্ষপাত, বর্ণ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে যে অসমতা প্রচলিত আছে তার প্রতিকার করা।

(ট) ভারতের বিভিন্ন গ্রামগুলিকে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়ে এসে তাদের একীভূত করা।

(ঠ) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত 50 মিলিয়ন এরও বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্যে নীতি সহায়তা যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটা প্রধান উৎস।

(ড) ভারতের পরিবেশ বান্ধব সম্পদের সুরক্ষা করা।

(ঢ) জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পে আরও কার্যকলাপ নিয়ে আসা যাতে উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলি সঠিকভাবে রূপায়িত হয়।

8.14 সারাংশ (Summary)

নীতি আয়োগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মন্ত্রকগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগীতা, পরামর্শ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে। যদিও নীতি আয়োগ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলির কাছে বিভিন্ন ব্যাপারে সুপারিশ করবে, তবুও সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব নীতি আয়োগের ওপরেই থাকবে।

নীতি আয়োগ সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাকে সহজতর এবং ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা করবে— যা জনগণ কেন্দ্রীক, অংশগ্রহণ মূলক, সহযোগীতা মূলক, স্বচ্ছ এবং নীতিচালিত। এটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমালোচনামূলক দিক নির্দেশক এবং কৌশলগত ইনপুট প্রদান করবে, তাছাড়াও এটা বিতরণ যোগ্যতা এবং ফলাফলের দিকে মনোনিবেশ করবে। তাছাড়া নীতি আয়োগের মূল লক্ষ্য হবে ইনকিউবেটর হিসাবে এবং উন্নয়নের জন্যে নতুন চিন্তাধারণা প্রচারক হওয়া।

নীতি আয়োগ ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বৃহৎভাবে যোজনা আয়োগে পরিবর্তে গঠন করা ভারতের অর্থনৈতিক সংস্থা। ভারতবর্ষে আর্থিক যোজনাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং রাজ্যগুলির আয়ের জন্যে চিন্তাভাবনার জন্যে এই আয়োগের গঠন করা হয়েছে।

নীতি আয়োগ 1 জানুয়ারী 2015 সালে গঠিত হয়।

নীতি আয়োগ বর্তমানে একটি state of the arts সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এরফলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও নৈপুণ্যসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণা, উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করছে। এছাড়া সরকারকে কৌশলগত নীতি নির্ধারণে সহায়তা করছে এবং আপদকালে সমস্যাগুলির দেখভাল করছে।

নীতি আয়োগের মূল কার্যাবলিকে আমরা মূলত চারভাগে ভাগ করতে পারি—

(ক) পলিসি এবং প্রোগ্রাম ফ্রেমওয়ার্ক

(খ) কোঅপারেটিভ ফেডেরালিজম

(গ) মনিটরিং এবং মূল্যায়ন

(ঘ) থিংক ট্যাঙ্ক এবং নলেজ ও ইনোভেশন হবে।

নীতি আয়োগের সাংগঠনিক কাঠামোতে চেয়ার পার্সন হিসাবে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত ভাইস চেয়ার পার্সন, আন্তর্জাতিক এক্সপোজার সহ বিশেষজ্ঞ। শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংস্থা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান থেকে সর্ব্বোচ্চ দুজন একটি পদাধিকার বলে। তাছাড়া আংশিক সময়ের সদস্যরা আবর্তিত ভাবে থাকবেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের সর্বোচ্চ চারজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হবেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একটি নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ভারত সরকারের সচীব পদে নিযুক্ত হবেন।

নীতি আয়োগ সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাকে সহজতর এবং ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা করবে বা জনগণকেন্দ্রীক অংশগ্রহণ মূলক, সহযোগীতামূলক, স্বচ্ছ এবং নীতিচালিত।

8.15 অনুশীলনী (Exercise)

■ **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি (Short Answer-type Questions)**

১. (ক) নীতি আয়োগ কাকে বলে?

(খ) নীতি আয়োগের পুরো নাম কি?

(গ) নীতি আয়োগ কবে গঠিত হয়?

(ঘ) নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান কে?

(ঙ) নীতি আয়োগের মূল কার্যাবলির দুটির উল্লেখ কর।

(চ) নীতি আয়োগের সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের দুটি পার্থক্য লেখ।

■ **মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি (Medium-answer type questions)**

২. (ক) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে নীতি আয়োগের ভূমিকা কি?

(খ) নীতি আয়োগ কোন্ কোন্ সংস্থার মারফত গঠিত হয়েছে তার আলোচনা করো।

(গ) পরিকল্পনা কমিশন এবং নীতি আয়োগের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

■ **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি (Long-answer type questions)**

৩. (ক) নীতি আয়োগের মূলকার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

(খ) উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের আলোকে নীতি আয়োগের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

(গ) ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নীতি আয়োগের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করো এবং এই প্রসঙ্গে আলোচনা করো যে নীতি আয়োগকে ঠিক কি করতে হবে?

8.16 গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. নীতি আয়োগ সম্পর্কে ভারত সরকারের বিভিন্ন তথ্য।

২. www.niti.gov.in